অর্থনৈতিক ভূগোল

(কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্সের পাঠ্যক্রম অনুসারে লিখিত।)

সুধাংশু শেখর ভট্টাচার্য, এম্. কম্., সি. এ. আই. আই. বি.

সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যাপক ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ; বাণিজ্যিক ও শিল্প-আইন, আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল, উচ্চতর মাধ্যমিক অর্থনৈতিক ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা।

ও

কুমারেশ বসু, এম্. কম্.

সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক।
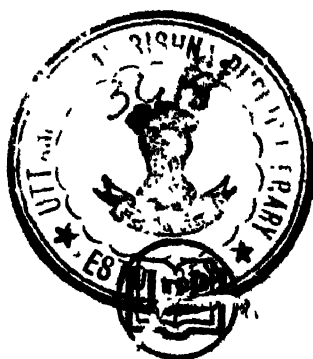
ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
সি. ভট্টাচার্য, বি. এ., বি. টি.
সম্পাদক : ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ…জুলাই, ১৯৬০

মূল্য : ১৪·০০

মুদ্রাকর :
শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১ কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণও অধ্যাপকগণ ও ছাত্রগণ কর্তৃক ... তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সুযোগ পাইয়া পুস্তকখানির উৎকর্ষ ... চেষ্টা করিয়াছি। এই সংস্করণে অধিকাংশ স্থানে ১৯৬৪ সালের ... পরিসংখ্যান দেওয়া হইয়াছে এবং ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালের বিশ্ব- ... প্রশ্নপত্র সংযোজিত হইয়াছে।

... পুস্তকখানি ... উৎকর্ষ সাধনে বহু অধ্যাপকের সহায়তা লাভ করিয়াছি। ... নিকট আমরা ঋণী।

... কলেজ — বিনীত

... — সুধাংশু শেখর ভট্টাচার্য

কুমারেশ বসু

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

... ভাষার মাধ্যমে বর্তমানে কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করিবার ... জন্য কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ... মাধ্যমে কঠিন বিষয়বস্তুও হৃদয়ঙ্গম করা অনেক সহজ। ... সমূহ তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্সের জন্য নূতন পাঠ্যক্রম ... করিয়াছেন। অর্থনৈতিক ভূগোলের নূতন পাঠ্যক্রমে ... (Resources) সম্বন্ধে যে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ দেওয়া ... হয়েছে, অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্র সম্বন্ধে ছাত্রগণের মৌলিক ... হইবে সন্দেহ নাই। অন্যান্য বিষয়েও পাঠ্যক্রমে যে নূতন ... পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। এইজন্য কলিকাতা ... কে আমরা বিশেষভাবে ... জানাইতেছি।

... পুস্তকখানি সম্পূর্ণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বৎসরের নূতন পাঠ্যক্রম ... হইয়াছে। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি যাহাতে ... রাখিয়া সহজবোধ্য ভাষায় বিষয়টিকে বুঝানো যায়। ... আমরা পুস্তকখানি লিখিয়াছি যে, ইহা দ্বারা ছাত্রগণ

অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু মৌলিক জ্ঞানলাভ করিবে, এবং এই শাস্ত্রের বিষয়বস্তু ছাত্রগণের নিকট রসহীন মনে হইবে না। জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলাইয়া এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই ছাত্রগণ ইহার উপলব্ধি করিতে পারিবে।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক পরিলক্ষিত হইতেছে। সুতরাং আধুনিক তথ্যাদি না জানিলে বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৯৬১ সালের পরিসংখ্যান দেওয়ার চেষ্টা করি। কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ডিগ্রী কোর্সের প্রশ্নপত্র অধ্যায়ে সংযোজিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার উৎপাদন লক্ষ্য ও সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

বর্তমান জগতের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্যক্ অনুধাবন করিতে হইলে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ, ইহাদের বাণ্টন, অর্থ নৈতিক জীবনে ইহাদের পরিবর্তনশীল ভূমিকা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। আশা করি, এই পুস্তকখানি কৌতুহলী পাঠককে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিতে সাহায্য করিবে।

প্রথমাবস্থায় পুস্তকখানিতে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিয়া যাইতে পারে। এই বিষয়ে অধ্যাপকগণের মন্তব্য সাদরে গৃহীত হইবে। ভবিষ্যতে পুস্তকের সংশোধনে অনেক সাহায্য হইবে।

এই পুস্তকখানি লিখিবার সময় সুরেন্দ্রনাথ কলেজের (সান্ধ্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সুধাংশু কুমার রায় ও উপাধ্যক্ষ ... পুরিয়া কলেজের অধ্যাপক বিলাস বিশ্বাস, মৈত্রাচি ... কলেজের অধ্যাপক সুনীল দত্ত এবং আনন্দবাজার পত্রিকার ... বাগচীর নিকট হইতে অনেক উপদেশ ও সাহায্য পাইয়াছি। নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। কলিকাতার বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য মানচিত্র অঙ্কন করিয়া আমাদের প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন।

পুস্তকখানি অধ্যাপক ও ছাত্রগণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইলে সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় খণ্ড

* সিলেবাস্ বহির্ভূত।

প্রথম খণ্ড

অর্থনৈতিক ভূগোলের সাধারণ সূত্রাবলী

অর্থনৈতিক ভূগোল

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনাক্ষেত্র ও কার্যাবলী
(The Field and Function of Economic Geography)

গতিশীল জগতে সকল বিজ্ঞানেরই পরিবর্তন হইতেছে। ভূগোলশাস্ত্র সম্বন্ধেও মানুষের ধারণা ক্রমশঃই পরিবর্তিত হইতেছে। পূর্বে ভূগোলশাস্ত্র বলিতে মানুষ বুঝিত পর্বত, মালভূমি, মহাসাগর, সাগর, নদী, অন্তরীপ, বন্দর, শহর প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা। কিন্তু বর্তমানে ভূগোলশাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় 'মানুষ'। কিভাবে প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে মানুষ তাহার জীবনকে খাপ খাওয়াইয়া লইতেছে, কিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের উন্নতিতে সাহায্য করিতেছে বা ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতেছে, কিরূপে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের আহার, পরিচ্ছদ, বাসস্থান, ধর্ম, দর্শন, সমাজ-সংগঠন ও রাজনীতি উহার দ্বারা প্রভাবিত হইতেছে, কিভাবে প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষ নিজের কল্যাণে ব্যবহার করিতেছে, ইহাই বর্তমান যুগের ভৌগোলিকগণের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এইভাবে দেখা যায় ভূগোলশাস্ত্রের আলোচনাক্ষেত্র যুগে যুগে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। সেইজন্য এই শাস্ত্রকে **গতিশীল বিজ্ঞান (Dynamic Science)** বলা হয়।

অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা (Definition of Economic Geography)—পরিবেশ ও মানুষের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করিবার জন্য ভূগোলশাস্ত্র বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

এইভাবে প্রাকৃতিক ভূগোল (Physical Geography), রাজনৈতিক ভূগোল (Political Geography) প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। অনুরূপভাবে ভূগোলশাস্ত্রের যে শাখায় মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের সহিত তাহার পরিবেশের সম্পর্ক লইয়া আলোচনা করা হয় তাহা অর্থনৈতিক ভূগোল

(Economic Geography) নামে পরিচিত। মানুষের জীবনধারণের জন্য খনিজ পদার্থ উত্তোলিত হয়, মৎস্য শিকার করা হয়, অরণ্যসম্পদ সংগৃহীত হয়, কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, শিল্প-কলকারখানা গড়িয়া উঠে ও পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান হয়। মানুষের এই সকল অর্থনৈতিক কাজকর্ম তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর কতটা নির্ভরশীল, ইহাই অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রধান আলোচ্য বিষয়। যুগে যুগে মানুষের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ (উৎপাদন, পরিবহণ-ব্যবস্থা, বাণিজ্য, বসতিস্থাপন প্রভৃতি) কিভাবে পরিবেশ (Environment) দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে কিভাবে প্রভাবিত হইতে পারে, তাহাও অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্রকে আলোচনা করিতে হইবে। আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্রের জনক চিশল্‌ম্ (Chisholm) মানুষের ভবিষ্যৎ বাণিজ্যিক কার্যকলাপ কিভাবে ভৌগোলিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে, ইহার আলোচনার উপর অধিকতর জোর দিয়াছেন।

যে পরিবেশের উপর মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতি নির্ভরশীল, তাহাকে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রাকৃতিক **পরিবেশ** গঠিত হয় অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি (পর্বত, সমভূমি, মালভূমি, নদী, সৈকতরেখা ইত্যাদি), ভূমির গঠন, জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তু এই উপাদানগুলি লইয়া। যে দেশে এই প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুকূল, সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সহজসাধ্য হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপর্যাপ্ত খনিজ সম্পদ, জাপান ও বৃটেনের ভগ্ন সৈকতরেখা ও অবস্থান, জার্মানীর কয়লা-সম্পদ এই সকল দেশের উন্নতির সহায়ক হইয়াছে। অবশ্য প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকিলেও কোন দেশ সমৃদ্ধিশালী নাও হইতে পারে। অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থা বিদ্যমান থাকিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপীয়গণ না আসা পর্যন্ত এবং রাশিয়ায় বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ঐ সকল দেশ মোটেই উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। কারণ মানুষের উন্নতির পক্ষে সাংস্কৃতিক পরিবেশও অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক পরিবেশ বলিতে সাধারণতঃ ধর্ম, ভাষা, আচার-ব্যবহার, প্রথা, সামাজিক সংগঠন, জাতীয় চরিত্র, শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা, লোকবসতির ঘনত্ব ইত্যাদি বুঝায়। এইভাবে দেখা যায়, মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ উভয়ের প্রভাব বিদ্যমান।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। মানুষ তাহার বুদ্ধিবলে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশকে আয়ত্তে আনিয়া নিজের উন্নতির কাজে লাগাইতেছে। নদীর উপর বাঁধ দিয়া বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ-উৎপাদন ও জলসেচের ব্যবস্থা হইতেছে, সার প্রয়োগ করিয়া অনুর্বর জমিকে কৃষির উপযোগী করা হইতেছে। ক্রমেই অধিকতর দ্রুতগামী যানবাহন আবিষ্কার করিয়া দূরত্বের উৎসাদন করা হইতেছে। অবশ্য সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিকে বশ করা হয়তো কখনই সম্ভব হইবে না। তুন্দ্রা অঞ্চলে হয়তো কোনদিনই শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে না, সাহারা মরুভূমিতে হয়তো কখনই ঘন লোকবসতি হইবে না, বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রাকে হয়তো কখনই সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে আনা যাইবে না। তবুও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে বশ করা সম্ভব। সুতরাং একদিকে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল, অন্যদিকে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিজের কল্যাণে নিয়োজিত করিবার শক্তি মানুষের প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার পারস্পরিক সম্পর্ক কিভাবে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে, ইহাই অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রধান আলোচ্য বিষয়। সুতরাং, যে শাস্ত্র প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সহিত মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতির পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝাইয়া দেয়, তাহাকেই অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্র (Economic Geography) বলে।

বিভিন্ন ভৌগোলিক অর্থনৈতিক ভূগোলের বিভিন্ন দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ম্যাক্‌ফারলেন (J. McFarlane) প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর গুরুত্ব দিয়া বলিয়াছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠের গঠন, জলবায়ু, অবস্থান ইত্যাদি মানুষের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তাহার তত্ত্ব-বিচারকেই অর্থনৈতিক ভূগোল বলা হয়। হান্টিংটনের (Ellsworth Huntington) মতে মানুষের জীবনধারণের জন্য যাহা-কিছু প্রয়োজন তাহাই অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়।

মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়া অর্থনৈতিক ভূগোল আলোচনা করে। সুতরাং ইহা একটি সামাজিক বিজ্ঞান (Social Science)। **অর্থনীতি (Economics)** মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা অর্থাৎ অর্থনৈতিক

কার্যাবলী, দ্রব্যের উৎপাদন ও বিতরণ, অভাব ও ইহার পরিপূরণ সম্বন্ধে আলোচনা করে। অর্থনৈতিক ভূগোল মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝাইয়া দেয়। অর্থনীতি বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের নীতি নির্ধারণ করে; অর্থনৈতিক ভূগোল কোন্ অঞ্চলে কি প্রকারের দ্রব্য উৎপন্ন হওয়া সম্ভব এবং ইহার বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করে। এইভাবে দেখা যাইবে যে, অর্থনীতির সহিত অর্থনৈতিক ভূগোলের নিকট-সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থনীতির জ্ঞান না থাকিলে অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্র অধ্যয়ন করা সম্ভব নহে। অনেকে মনে করেন যে, অর্থনৈতিক ভূগোল ভূগোলশাস্ত্রের শাখা নহে, ইহা অর্থনীতি-শাস্ত্রের অঙ্গীভূত। এইজন্য কোন কোন দেশে অর্থনৈতিক ভূগোলকে ভৌগোলিক অর্থনীতি (Geonomics বা Geo-Economics) বলা হয়।

অর্থনৈতিক ভূগোলের গতিশীল চরিত্র (Dynamic nature of Economic Geography)—ভূগোলশাস্ত্রের মতো অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্রও একটি গতিশীল বিজ্ঞান। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদার পরিমাণ ও বৈচিত্র্য ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। অথচ এই চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পরিমাণ সীমাবদ্ধ। সেইজন্য মানুষকে অভাব মোচনের জন্য বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের দিকে নিয়ত প্রচেষ্টা চালাইতে হয়। সমাজ-বিবর্তনের প্রথম দিকে মানুষ **পশু-শিকার**, মৎস্য আহরণ করিয়া এবং বন্য ফলমূল সংগ্রহ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। ক্রমে ক্রমে কৃষিকার্যের সৃষ্টি হইল। মানুষের অভাব মোচনের জন্য আরম্ভ হইল বিনিময়-প্রথা। প্রথমে বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনের জন্য মানুষ নিজের পেশী-শক্তির উপর নির্ভর করিত। ক্রমে ক্রমে পশুকে বশে আনিয়া পশু-শক্তিকে বিভিন্ন দ্রব্য-উৎপাদনে নিয়োজিত করা হইল। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পূর্বপর্যন্ত সকল দেশেই মানুষের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল অনেক কম। সেইজন্য হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া মানুষ কায়ক্লেশে জীবনধারণ করিয়াছে। উদ্বৃত্ত সম্পদ না থাকায় মানুষের জীবনে বিশ্রামের কোন অবকাশ ছিল না। সেই যুগে শিল্পোৎপাদনের পদ্ধতি ছিল সরল ও কষ্টসাধ্য এবং পরিমাণ ছিল খুব কম। উদ্বৃত্ত সম্পদের পরিমাণ কম থাকায় এবং মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অভাবে বিনিময়ের পরিমাণ ছিল যৎসামান্য। সমগ্র পৃথিবী কয়েকটি প্রায় **স্বয়ং-সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক সমাজের সমবায়ে** গঠিত ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাষ্পশক্তি ও বৃহৎ যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে ইউরোপে **শিল্পবিপ্লব (Industrial Revolution)** শুরু হইল; ইহার ফলে মানুষের পেশী-শক্তি ও পশু-শক্তির সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে উদ্ভূত জড়শক্তি যুক্ত হইল সম্পদ-সৃষ্টির কাজে। ক্রমশঃ মানুষ কয়লা, খনিজ তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও জলপ্রবাহ হইতে শক্তি উৎপন্ন করিয়া উৎপাদনের কাজে লাগাইল। উন্নততর যন্ত্রপাতি কৃষি, শিল্প ও পরিবহণ-ব্যবস্থায় নিয়োজিত হইতে লাগিল।

এইভাবে সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটিল। একদিকে যেমন উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িল অন্যদিকে অনেক কম পরিশ্রমে ও সুলভে যন্ত্রপাতির সাহায্যে দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতে লাগিল। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইল। ক্রমশঃ রেলগাড়ী, মোটর-গাড়ী, বিমানপোত, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও প্রভৃতি আবিষ্কৃত হওয়ায় যাতায়াত ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হইল। ইহার ফলে ও উৎপাদনের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি হওয়ায় বাণিজ্যের অভূতপূর্ব প্রসার ঘটিল। পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি-সাধন এবং স্থানগত বিশেষীকরণের (Regional specialisation) ফলে বর্তমান যুগে মানুষ আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও সংঘাত সত্ত্বেও বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের দ্বারা এক নূতন **আন্তর্জাতিক সহযোগিতার যুগের** সূচনা করিয়াছে।

গতিশীল জগতের বিভিন্ন যুগে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে এইভাবে পরিবর্তন আসিলেও সকল স্থানে একই রকম উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। হিমমণ্ডলের এস্কিমোদের অর্থনৈতিক অবস্থা এখনও সেই প্রাচীন যুগের অবস্থার মতোই আছে; ইহারা এখনও প্রধানতঃ পশুশিকার ও মৎস্যশিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। মধ্য আফ্রিকার পিগ্‌মি এবং দক্ষিণ আমেরিকার সর্বদক্ষিণপ্রান্তের অধিবাসী ইয়াগান ইণ্ডিয়ান এখনও যন্ত্র-সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হয় নাই। কিন্তু রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন প্রভৃতি দেশ অর্থনৈতিক উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার এই বৈষম্যের প্রধান কারণ স্থানীয় পরিবেশ। কয়েকটি দেশ **প্রাকৃতিক পরিবেশ (Physical Environment)** অনুকূলে থাকায় সহজে উন্নতি লাভ করিয়াছে। সম্পদ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কোন্ দেশে কতটা পাওয়া যায়, ইহা নির্ভর করে প্রধানতঃ

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে রহিয়াছে সেই দেশের অপর্যাপ্ত খনিজ সম্পদ এবং কৃষিকার্যের উপযোগী জলবায়ু ও মৃত্তিকা। যে সকল দেশে প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রতিকূল, সেখানে অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন সহজসাধ্য নহে। আফ্রিকার সাহারা অঞ্চল এবং এশিয়ার তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া কোনদিনই অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে না। ইহা সত্ত্বেও মানুষ তাহার অস্তিত্বের প্রথম দিন হইতেই প্রাকৃতিক বাধা অপসারণের এবং প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের নিরলস সাধনায় ব্যাপৃত। বিশেষতঃ গত দুইশত বৎসরের বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার বিস্ময়কর উন্নতির ফলে মানুষ প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশকে বহুল পরিমাণে নিজের ভোগ-সুখবৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। কাঠের চাকা আবিষ্কার হইতে মহাকাশ-বিজয় অভিযানের জন্য স্পুটনিক প্রেরণ প্রাকৃতিক পরিবেশের অসুবিধা অতিক্রমেরই সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, কলিকাতা, লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক বা মস্কোর মতো অতি আধুনিক কৃত্রিম পরিবেশের মানুষও সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবমুক্ত। একদিকে যেমন রেলগাড়ী, বিমানপোত, রেডিও, টেলিভিসনের ন্যায় বিভিন্ন যোগাযোগ-ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, জলস্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন হইতেছে, জলসেচের সাহায্যে বন্ধ্যা মরুভূমি শস্যশ্যামলা হইয়াছে, অন্যদিকে একটা সমগ্র দেশের জলবায়ু-নিয়ন্ত্রণ এখনও মানুষের সাধ্যের অতীত, নদীর বন্যা পুরাপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় নাই, কৃষিকার্য এখনও বহুলাংশে প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত। সভ্যতার সকল স্তরেই মানুষের জীবন বহুলাংশে প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি সত্ত্বেও, কি আমাজন নদীর অববাহিকায় গভীর অরণ্যের অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ান, কি নিউগিনি দ্বীপের পাপুয়ান, কি কৃষিসমৃদ্ধ গাঙ্গেয় উপত্যকার ভারতীয়, কি নিউ ইয়র্ক শহরের আমেরিকান—প্রত্যেক মানুষের জীবন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত।

প্রাকৃতিক পরিবেশ **সর্বত্র সমান নহে**; নিরক্ষরেখা হইতে বিভিন্ন দেশের দূরত্ব সমান নহে; কোথাও সুউচ্চ পর্বতমালা, কোথাও বন্ধুর মালভূমি, কোথাও বা বিস্তীর্ণ সমতলভূমি বিদ্যমান। ভূমির গঠনও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জলবায়ুর তারতম্যও খুব স্পষ্ট।

বিষুবরেখার নিকটবর্তী অঞ্চলের উষ্ণ ও আর্দ্র একঘেয়ে জলবায়ুর সহিত উষ্ণ সাহারা মরুভূমির শুষ্ক ও চরম জলবায়ুর কোনও সম্পর্ক নাই। গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাতযুক্ত ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু শীতকালীন বৃষ্টিপাতযুক্ত ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বিপরীত। জলবায়ুর তারতম্য অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ্ ও প্রাণী দেখা যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশের এই বিভিন্নতার জন্যই পৃথিবীতে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বিভিন্নতা ও উৎপাদনে বৈচিত্র্য দেখা যায়। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন অববাহিকায় ও বদ্বীপ অঞ্চলে ধান ও পাটচাষের কেন্দ্রীভবন ও কিউবায় ইক্ষুচাষের প্রাধান্য প্রাকৃতিক পরিবেশের ফলেই সম্ভব হইয়াছে। অরণ্যসম্পদের উপর ফিনল্যাণ্ডের অর্থনীতি, মৎস্য-শিকারের উপর আইসল্যাণ্ডের অর্থনীতি, খনিজ তৈলের উপর কুওয়েত (Kuwait) বা ভেনেজুয়েলার অর্থনীতি এবং কফিচাষের উপর ব্রেজিলের অর্থনীতির নির্ভরশীলতা প্রাকৃতিক পরিবেশেরই ফল। জাপান ও নরওয়ের মৎস্যশিল্পের সমৃদ্ধি এবং বৃটেনের বাণিজ্যিক উন্নতিও প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্যই সম্ভব হইয়াছে।

পৃথিবীর কয়েকটি অঞ্চল একই প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত হইলেও মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার তারতম্যের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে জীবনযাত্রার মানের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। উত্তর আমেরিকার মেরু অঞ্চলের এস্কিমোগণ এখনও পশুশিকার ও মৎস্য আহরণ করিয়া প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর একান্ত নির্ভরশীল অবস্থায় জীবন যাপন করে। কিন্তু ইউরোপের ল্যাপ্‌গণ একই পরিবেশে বাস করিয়াও বন্য হরিণকে পোষ মানাইয়া, শৈবালজাতীয় পশুখাদ্যের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিয়া উত্তর আমেরিকার এস্কিমোগণের তুলনায় জীবনধারণের অনিশ্চয়তা কিছুটা কমাইতে সক্ষম হইয়াছে। প্রায় একই রকম প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত ভারত ও চীন কৃষিকার্যে যতটা উন্নতি লাভ করিয়াছে ক্রান্তীয় আফ্রিকার দেশসমূহ এখনও ততটা করিতে পারে নাই। ইহার কারণ মানুষের **সাংস্কৃতিক পরিবেশের (Cultural Environment)** পার্থক্য। একই প্রাকৃতিক পরিবেশে, শিক্ষা-বিজ্ঞানে উন্নত, বুদ্ধিমান্, পরিশ্রমী ও উদ্ভাবনী-ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ যতটা উন্নতি লাভ করিয়াছে, অলস, শ্রমবিমুখ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে পশ্চাদ্‌পদ মানুষ ততটা উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন সম্পদ আবিষ্কার ও প্রাকৃতিক সম্পদের নূতন ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন স্থানের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের

বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশও স্থাণু নহে। আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে; বৃষ্টিপাত কোন বৎসরে বেশী, কোন বৎসরে কম হয়। শীত ও গ্রীষ্মের তারতম্য প্রায়ই অনুভব করা যায়; নদীর গতিপথেরও পরিবর্তন ঘটে। নদীর পলিমাটির দ্বারা নূতন ভূভাগের সৃষ্টি হয়। প্রবল ভূমিকম্পে পুরাতন ভূভাগ ধ্বংস হয়, ভূ-প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। যুগে যুগে প্রকৃতি এইভাবে পরিবর্তিত হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনে মানুষও তাহার হস্ত প্রসারিত করিয়াছে। রাশিয়ার স্টেপ্‌স্‌ তৃণভূমি ও উত্তর আমেরিকার প্রেইরী তৃণভূমি কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে; মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার অরণ্য পরিষ্কার করিয়া রবারের বাগিচা তৈয়ারী হইয়াছে। সুয়েজ যোজকের উপর খাল কাটিয়া ভূমধ্যসাগরের সহিত লোহিত সাগরের সংযোগ সাধন করা হইয়াছে; হল্যাণ্ডের উপকূলবর্তী সমুদ্রে স্থলভাগ সৃষ্টি করা হইয়াছে।

এইভাবে দেখিতে পাই একদিকে যেমন স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিতেছে, অন্যদিকে তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষের প্রকৃতির সহিত খাপ খাওয়াইবার ক্ষমতা, প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রমের ক্ষমতা, প্রকৃতিকে অধিকতর সার্থকভাবে ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে; অর্থাৎ মানুষের সহিত প্রকৃতির সম্পর্ক সতত পরিবর্তনশীল। ফলে এই সম্পর্ক লইয়া যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হইয়াছে, সেই **অর্থনৈতিক ভূগোলও গতিশীল বিজ্ঞান** (Dynamic Science)।

সমশ্রেণীভুক্ত অন্যান্য বিজ্ঞানের সহিত অর্থনৈতিক ভূগোলের সম্বন্ধ (Relation of Economic Geography to other allied Sciences)—আধুনিক ভূগোলশাস্ত্র অংশতঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Physical Science)। আবার ইহা প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত সামাজিক পরিবেশের সম্পর্ক নির্ণয় করে বলিয়া, ইহা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের মধ্যে সেতু রচনা করিয়াছে। আবহবিদ্যা (Climatology), ভূ-তত্ত্ব (Geclogy), উদ্ভিদ্‌-বিদ্যা (Botany), প্রাণিবিদ্যা (Zoology) প্রাকৃতিক ভূগোলের (Physical Geography) অন্তর্গত। অর্থনৈতিক ভূগোল প্রধানতঃ একটি সমাজ-বিজ্ঞান; রাজনৈতিক ভূগোল (Political Geography), ঐতিহাসিক ভূগোল (Historical Geography) ইত্যাদি সমাজ-বিজ্ঞানের মতো ইহাও মানুষের কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মৌলিক উপাদানসমূহের তারতম্য অর্থনৈতিক ভূগোলের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু।

কিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহার প্রভাবিত হয় তাহার মূল্যায়ন, বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির তারতম্য, পরিবহণ-ব্যবস্থা, বাণিজ্য-পথ ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ইহার আলোচনার বিষয়বস্তু।

অর্থনৈতিক ভূগোলের সঙ্গে অন্যান্য শাস্ত্রের নিকট-সম্পর্ক বিদ্যমান। এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্তর্গত বিভিন্ন শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য উদ্ভিদ্-বিদ্যা, জলবায়ু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আবহবিদ্যা, প্রাণিজ সম্পদ সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য প্রাণিবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে হয়। সেইরূপ ভূ-পৃষ্ঠের রাজনৈতিক বিভাগ, শাসনপদ্ধতি, মানুষের সাংস্কৃতিক মান ও উপজীবিকা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য রাজনৈতিক ভূগোল অধ্যয়ন করা আবশ্যক। ইহা ছাড়া অর্থনীতি (Economics), রসায়নবিদ্যা (Chemistry), পদার্থবিদ্যা (Physics), নৃ-তত্ত্ব (Anthropology), সমাজতত্ত্ব (Sociology), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Politics), ইতিহাস (History), জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিলে অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্র অধ্যয়নের সুবিধা হয়। এইভাবে দেখা যায় যে, বিভিন্ন শাস্ত্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক ভূগোলের যোগসূত্র বিদ্যমান।

প্রশ্নাবলী

1. "Economic Geography is a Dynamic Science"—Elucidate.

উঃ—'অর্থনৈতিক ভূগোলের গতিশীল চরিত্র' (৬ পৃঃ—১০ পৃঃ) লিখ।

2. Define Economic Geography and discuss its field and function.

উঃ—'অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা' (৩ পৃঃ—৬ পৃঃ) এবং 'অর্থনৈতিক ভূগোলের গতিশীল চরিত্র' (৬ পৃঃ—১০ পৃঃ) লিখ।

3. Discuss the relation of Economic Geography with other allied subjects.

উঃ—'সমশ্রেণীভুক্ত অন্যান্য বিজ্ঞানের সহিত অর্থনৈতিক ভূগোলের সম্বন্ধ' (১০ পৃঃ—১১ পৃঃ) লিখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সম্পদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

(Meaning and Nature of Resources)

সম্পদ (Resources) মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান অবলম্বন। সম্পদহীন দেশের পক্ষে উন্নতি লাভ করা যেমন কঠিন, আবার সম্পদশালী দেশের পক্ষে উন্নতি লাভ করা তেমনি সহজ। সম্পদশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সম্পদহীন নেপালের অর্থনৈতিক উন্নতির আলোচনা হইতেই ইহা সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে।

সম্পদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতগণ বিভিন্নভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এক একজন তাঁহাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ হইতে বিষয়টিকে বিচার করিয়াছেন। পূর্বে সম্পদ সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল অত্যন্ত স্থূল এবং তাহারা শুধুমাত্র প্রকৃতি-প্রদত্ত সম্পদ ভিন্ন আর কোনও কিছুকেই সম্পদের সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিত না। তা ছাড়া সম্পদের কার্যকারিতা, সম্পদের সংরক্ষণ সম্বন্ধেও তাহাদের ধারণা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

বর্তমান যুগে সম্পদ সম্পর্কে মানুষের ধারণা ক্রমশঃই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতেছে। সম্পদের সংজ্ঞার পরিধি অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমান যুগের মানুষ সম্পদ সম্বন্ধে আরও সচেতন হইয়াছে। কারণ সম্পদ মানুষের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির ভিত্তিস্বরূপ। কি যুদ্ধের সময়ে, কি শান্তির সময়ে মানুষের ভাগ্য বহুলাংশে সম্পদের উপর নির্ভরশীল। সম্পদ সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহ নূতন না হইলেও, সমসাময়িক কালে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে আমরা সম্পদ-চেতনায় নূতন ধারা লক্ষ্য করি। এই **নূতন সম্পদ-চেতনার (New Resource-consciousness)** ধারা বুঝিতে হইলে গত দুইশত বৎসরে **অর্থনৈতিক চিন্তাধারায়** যে বিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা অনুধাবন করিতে হইবে এবং সম্পদ-সম্পর্কীয় নূতন ধারণার **ঐতিহাসিক পটভূমিকা** বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

সম্পদ সম্পর্কে অর্থনৈতিক চিন্তাধারা (Economic Thoughts on Resources)—হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া মানুষ (অন্ততঃ অধিকাংশ

মানুষ) দাস, ভূমিদাস (Serf) বা অধীনস্থ প্রজা হিসাবে নানারূপ বাধা-নিষেধের কঠিন শৃঙ্খলের মধ্যে বাস করিয়াছে।

তারপর পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে এক পরিবর্তনের জোয়ার আসে। পাশ্চাত্ত্যের অধিবাসিবৃন্দ নূতন নূতন সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করেন। শক্তিচালিত বৃহদাকার কলকারখানার দ্রুত প্রসার ঘটিতে থাকে। প্রাকৃতিক সম্পদের নূতন ও অধিকতর সুষ্ঠু ব্যবহার হইতে থাকে। ব্যক্তির ক্ষমতা ও অধিকার সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া উঠিতে থাকে। **বিবর্তন (evolution) ও বিপ্লবের মধ্য দিয়া সামাজিক নিয়ন্ত্রণ শিথিল** হইয়া পড়ে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক নিগড় হইতে এই মুক্তি অবাধ বাণিজ্যাধিকার ও স্বাধীন শিল্পোদ্যোগের (Free Enterprise system) মধ্যে প্রকাশ পায়। ইহার ফলে সমগ্র পাশ্চাত্ত্য জগতে, বিশেষ করিয়া ইংরাজী-ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহে মানুষের কর্মশক্তির ব্যাপক ও বিপুল স্ফূর্তি ঘটে। অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও তাহার ফলে জীবনযাত্রার মানের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। অবাধ শিল্পোদ্যোগ ব্যবস্থার এই সাফল্যের ফলে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইতে থাকে যে, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বিপুল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সামাজিক ও সরকারী বাধানিষেধের অপসারণের ফলেই সম্ভব হইয়াছে, এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং বাণিজ্য ও মুনাফা অর্জনের অবাধ অধিকার থাকিলেই সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধিত হইবে; অর্থাৎ **অবাধ প্রতিযোগিতার** মধ্য দিয়াই ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হইবে।

এই মতাদর্শ উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষপর্যন্ত ইংরাজী-ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহের অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে প্রভুত্ব করিতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ আল্‌ফ্রেড মার্শাল (Alfred Marshall) সর্বপ্রথম **অবাধ বাণিজ্য-নীতির** এই মতাদর্শ খণ্ডন করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ স্বার্থ অনুসরণ করিলেই সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হয় না এবং জনস্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য সুনির্দিষ্ট ও সচেতন সরকারী নীতির (Public policy) প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। পিগু এবং আরও অনেকে মার্শালের এই মত সমর্থন করেন। পরবর্তী কালে ফিন্‌স্ এই মত আরও জোরের সহিত প্রচার করেন।

ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক স্বার্থের সহিত সরকারের যে সকল বিষয়ে পার্থক্য রহিয়াছে, দেশের সম্পদ, বিশেষ করিয়া মৃত্তিকা, জল, অরণ্য, শক্তিসম্পদ, খনিজ পদার্থ প্রভৃতি মৌলিক সম্পদের সংরক্ষণ তাহাদের অন্যতম। ব্যবসায়ীর প্রধান লক্ষ্য **মুনাফা-অর্জন**। তাহার দৃষ্টি বর্তমান অথবা নিকট-ভবিষ্যতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। একশত বা দুইশত বৎসর পরে দেশের কয়লা ফুরাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা এবং থাকিলে এখন হইতে কয়লা-সম্পদ সংরক্ষণের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ইহা লইয়া কোন কয়লা-খনির মালিক বা কয়লা-ব্যবসায়ী মাথা ঘামাইবে না। যে-কোন প্রকারে বর্তমান লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি করাই তাহার লক্ষ্য। এইজন্য দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে **সরকারী হস্তক্ষেপ** আবশ্যক হইয়া পড়ে। জনগণের সামগ্রিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কয়লা, তৈল, মৃত্তিকা প্রভৃতি সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সরকার অগ্রসর হন, যাহাতে দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নতির গতি অব্যাহত থাকে।

সম্পদ-সম্পর্কীয় নূতন দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহাসিক পটভূমিকা (Historical background of the New Attitude on Resources)—উল্লিখিত অর্থনৈতিক চিন্তাধারার পরিবর্তনের পিছনে রহিয়াছে নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ :

(১) **প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয়িষ্ণুতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতনতা** : বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসতিবিস্তার সম্পূর্ণ হইবার পর হইতেই, অর্থাৎ যখন হইতে বিনামূল্যে জমিসংগ্রহ আর সম্ভব হইল না, তখন হইতেই এই নবচেতনার উন্মেষ হয়।

(২) দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে বিশ্বব্যাপী **বাণিজ্যমন্দা (Great Depression)** দেখা দেওয়ার ফলে অবাধ বাণিজ্য-নীতির দুর্বলতা প্রকট হইয়া উঠে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ অনিবার্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডিলেনো রুজভেল্টের **'নিউ ডিল' (New Deal)** এই স্বীকৃতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মৌলিক সম্পদসমূহ যাহাতে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বণিকস্বার্থের জন্যই বরাবর ব্যবহৃত না হয় তাহার ব্যবস্থা করাই সরকারী হস্তক্ষেপের অন্যতম উদ্দেশ্য।

(৩) পর পর দুইটি **মহাযুদ্ধের** ফলে সম্পদ-চেতনা মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে। আধুনিক বিশ্বগ্রাসী মহাসমর সাফল্যের

সহিত পরিচালনা করিতে হইলে দেশের সমগ্র সম্পদ সংহত করা প্রয়োজন। আধুনিক যুদ্ধের অপ্রতিরোধ্য তাগিদ মানুষকে সম্পদ-সচেতন করিয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে দুই বৃহৎ শক্তিশিবিরের মধ্যে যে **ঠাণ্ডা লড়াই** চলিতেছে তাহাও মানুষের সম্পদ-চেতনাকে তীব্রতর করিয়াছে।

(৪) আধুনিক **রাষ্ট্রের গঠন** ক্রমেই বৃহত্তর ও জটিলতর হইতেছে। ইহার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব-বৃদ্ধি প্রয়োজন হইতেছে এবং এই কর্তৃত্ব ক্রমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সমেত নাগরিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত হইতেছে।

(৫) অবাধ বাণিজ্য-নীতির ভিত্তি ছিল অবাধ প্রতিযোগিতা। কিন্তু বিভিন্ন দেশে ক্রমেই অবাধ প্রতিযোগিতার পরিবর্তে **একচেটিয়া কারবারের** উৎপত্তি হইতেছে এবং মুষ্টিমেয় কয়েক জনের হাতে ধন কেন্দ্রীভূত হইতেছে। এইরূপে অবাধ বাণিজ্য-নীতির ভিত্তি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের দাবি প্রবল হইয়া উঠিতেছে এবং সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে দেশের সমস্ত সম্পদ সরকার কর্তৃক পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবার পক্ষে জনমত ঝুঁকিতেছে।

(৬) প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাশিয়া এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইউরোপ ও এশিয়ার বহুদেশে **সমাজতন্ত্র** প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা সর্বদাই সম্পদ-সচেতন এবং এই ব্যবস্থার অধীনে পরিকল্পনার সাহায্যে মৌলিক সামাজিক সম্পদসমূহের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়।

সর্বশেষে, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণের মধ্যেও ধীরে ধীরে **সামাজিক দায়িত্ববোধের** উন্মেষ হইতেছে। এই দায়িত্ববোধ হইতে সম্পদের প্রকৃতি ও গুরুত্ব সম্বন্ধে আগ্রহও বৃদ্ধি পাইতেছে।

সম্পদ, একটি গতিশীল ধারণা (Resources, A Dynamic Concept)—উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, শত শত বৎসর ধরিয়া অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে সম্পদ অবহেলিত হইয়াছে। সম্পদের মূল্য নিছক ব্যক্তিগত মুনাফার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হইয়াছে। অর্থনীতিবিদ্গণের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত হওয়ায় ইহা শুধু প্রকৃতি-বিজ্ঞান বিশেষ করিয়া প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

সম্পদ সম্বন্ধে ধারণা অপেক্ষাকৃত নূতন বলিয়া ইহাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার অবকাশ রহিয়াছে। সম্পদের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে

প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীর মধ্যে মতৈক্য স্থাপন করিতে হইবে এবং ইহার সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলি **(Popular misconceptions)** দূর করিতে হইবে।

সম্পদ সম্পর্কে **ভুল ধারণাগুলি (Misconceptions)** নিম্নরূপ :

(১) সাধারণতঃ লোকে যে সকল জিনিসের **বস্তুগত অস্তিত্ব (Tangible things)** রহিয়াছে, শুধু সেইগুলিকেই সম্পদ বলিয়া গণ্য করে। সম্পদ সম্বন্ধে ইহা অন্যতম ভুল ধারণা। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, কয়লা, লৌহ, কাঠ, মাটি প্রভৃতি বস্তু সম্পদ হিসাবে কার্য করিয়া থাকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, **বস্তুগত অস্তিত্ব** নাই এমন সকল জিনিস **(Intangible things)**—যথা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জাতীয় সংহতি, সামাজিক নিরাপত্তা, সরকারের শাসন-কুশলতাও কম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ নহে। বরঞ্চ বলা চলে যে, এই উভয় প্রকার উপাদানের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়াই সম্পদের সৃষ্টি হয়।

(২) অনুরূপভাবে এতদিন পর্যন্ত **সাংস্কৃতিক ও মানবিক সম্পদসমূহ (Cultural and Human resources)** বাদ দিয়া শুধু **প্রাকৃতিক সম্পদকে (Natural resources)** সম্পদ বলিয়া গণ্য করা হইত। ইহার ফলে সম্পদের সত্য প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা বিকাশ লাভ করে নাই।

(৩) সম্পদ সম্বন্ধে আর একটি ভুল ধারণা হইল কোন জিনিসকে বিচ্ছিন্নভাবে সম্পদ হিসাবে গণ্য করা। যেমন, খনিজ তৈলকে সম্পদ বলা হয়, অথচ খনিজ তৈল সম্পদ নহে; উহার **কার্যকারিতাই সম্পদ**। খনিজ তৈলের কার্য আবার নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, কারিগরী দক্ষতা, সমাজ-সংগঠন, সরকারী প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিষয়ের উপর এবং এই সকল বিষয়ের স্থান ও কাল অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং সম্পদ হিসাবে বিচার করিবার সময় একক খনিজ তৈলকে না ধরিয়া একটি বিশেষ স্থান ও কালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি, সরকারী নীতি ও শাসন-কুশলতা, অর্থনৈতিক উন্নতি, কয়লা, জলবিদ্যুৎ প্রভৃতি শক্তির অন্যান্য উৎসের লভ্যতা ইত্যাদি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে উহাকে বিচার করিতে হইবে।

(৪) শুধু বিচ্ছিন্ন বস্তুসম্পদকে সম্পদ হিসাবে গণ্য করার ফলে মানুষ সম্পদকে নির্দিষ্ট (fixed) ও স্থাণু (static) বলিয়া মনে করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সম্পদ **অনির্দিষ্ট ও গতিশীল (Dynamic)**।* মানুষের

প্রয়োজন ও প্রচেষ্টা অনুযায়ী ইহার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।* বহুলাংশে সম্পদ **মানুষের নিজের সৃষ্টি**। মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইহার উপরেই তাহার সম্পদ-সৃষ্টির ক্ষমতা নির্ভর করে।

(৫) সর্বশেষে, ইহা অনুধাবন করিতে হইবে যে, পৃথিবীতে যেমন দিন ও রাত্রি উভয়ই আছে, যেমন লাভের সহিত লোকসান, সুখের সহিত দুঃখ বিদ্যমান তেমনই **সম্পদের সহিত বাধা ও প্রতিরোধও (Resistances)** অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রহিয়াছে। একটিকে বাদ দিয়া আর একটির চিন্তা করিলে ভুল হইবে।

সম্পদের সংজ্ঞা
(Resources Defined)

সম্পদ বলিতে কোন জিনিস বা বস্তু বুঝায় না। কোন জিনিস বা বস্তু যে **কার্য (function)** করিতে পারে তাহাই সম্পদ এবং এই কার্যের লক্ষ্য হইল মানুষের অভাব মোচন করা। সুতরাং **সম্পদ নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের উপায় মাত্র**। এই লক্ষ্য হইল ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক চাহিদা মিটানো। কোন জিনিসকে সম্পদ বলিয়া গণ্য হইতে হইলে প্রথমতঃ, উহার **উপযোগিতা (utility)** থাকা চাই এবং দ্বিতীয়তঃ, উহাকে **মানুষের অভাব মোচনের কার্য** করিতে হইবে†। গুজরাটের ক্যাম্বে, আঙ্কলেশ্বর ও কালোলের মাটির নীচে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া তৈল সঞ্চিত রহিয়াছে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত ভারতের মানুষ ঐ তৈলের সন্ধান পায় নাই এবং উহা আমাদের কোন কাজে আসে নাই। অল্পদিন হইল ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের প্রচেষ্টায় এবং রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকগণের সহায়তায় ঐ সকল স্থানের তৈল আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং

* Those who still insist that the natural environment is constant and that the supply of 'land' is fixed face a powerful array of opposing authorities",
—*E. W. Zimmerman.*

† The word 'resource' does not refer to a thing or a substance but to a function which a thing or a substance may perform or to an operation in which it may take part, namely, the function or operation of attaining a given end such as satisfying a want."
—*E. W. Zimmermann.*

ইহা উত্তোলিত হইয়া নানা কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে, অর্থাৎ ঐ তৈল সম্পদে পরিণত হইয়াছে। মোট কথা, কোন জিনিসের **কার্যকারিতাই** উহাকে *সম্পদে পরিণত করে।* ***তৈল সম্পদ নহে, তৈলের কার্যকারিতাই সম্পদ।***

সম্পদের কার্যকারিতা-তত্ত্ব

(Functional or Operational theory of Resources)

এই পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি হইবার পর দীর্ঘ দিন মানুষের সহিত অন্যান্য পশুর আকৃতিগত পার্থক্য ছাড়া অন্য কোন পার্থক্য ছিল না। এই স্তরের মানুষকে আমরা পশু-মানব (man on animal level) আখ্যা দিতে পারি। তারপর ধীরে ধীরে মানুষ পশুর স্তর অতিক্রম করে। এই পরবর্তী স্তরের মানুষকে আমরা সভ্যমানুষ (man on supra-animal or human level) বলিব। সম্পদ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিতে হইলে সভ্যমানুষের সহিত প্রকৃতির সম্পর্ক বুঝিতে হইবে।

পশু-মানুষ তাহার পাশবিক অভাব (creature-wants) মিটাইবার জন্য স্বাভাবিক ক্ষমতাবলে (Natural capacities) প্রকৃতি হইতে জীবনধারণের উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিত। সেইসঙ্গে সে প্রকৃতির অন্তর্গত ক্ষতিকর অবস্থা ও শক্তিসমূহের (যথা, ঝড়, বন্যা, অগ্ন্যুৎপাত, মহামারী, বন্যপশুর আক্রমণ ইত্যাদির) সম্মুখীন হইত। প্রকৃতির যে সকল উপাদানে পশু-মানুষ তাহার পাশবিক চাহিদা মিটাইত তাহাদিগকে **প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural resources)** এবং প্রকৃতির যে সকল উপাদান তাহার ক্ষতি অথবা বাধা সৃষ্টি করিত তাহাদিগকে **প্রাকৃতিক বাধা (Natural resistances)** বলা হয়। অভাবপূরণ শুধু প্রাকৃতিক সম্পদের উপরে নির্ভর করে না। প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রাকৃতিক বাধা এই দুয়ের উপর কতটা অভাব পূরণ করা যাইবে তাহা নির্ভর করে। পৃথিবীর অধিকাংশ পদার্থ, শক্তি ইত্যাদি পশু-মানুষের কোন উপকারে আসে না, আবার অপকারও করে না। অর্থাৎ ঐগুলি তাহার নিকট **নিরপেক্ষ সামগ্রী (Neutral stuff)**।

অন্যান্য পশুর ন্যায় পশু-মানুষও জীবজগতের নিয়মের অধীন ছিল এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজেকে **নিষ্ক্রিয়ভাবে খাপ খাওয়াইয়া**

(Passive adaptation) লইত। *অন্যান্য পশুর ন্যায় পশু-মানুষের কলা-কৌশলও ছিল গণ-কলাকৌশল (Geus technique); অর্থাৎ সমগ্র পশু-মানবসমাজ অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে একই কলা-কৌশল* অবলম্বন করিত এবং এই কলা-কৌশল তাহার দৈহিক গঠন ও জীবনধারার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই কলা-কৌশলের পরিবর্তন করা কোন পশু-মানুষের একক সাধ্যের অতীত ছিল। পরিবেশের চাপে ধীরে ধীরে ইহার পরিবর্তন হইত। এইরূপে নিজের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকায় এবং কোনরূপ সংস্কৃতির সহায়তা না পাওয়ায় প্রকৃতির দুরতিক্রম্য বাধার সম্মুখে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ সম্পদের সাহায্যে পশু-মানুষ এই পৃথিবীতে কোনক্রমে টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছিল।

অতঃপর প্রায় অর্ধলক্ষ বৎসর পূর্বে মানুষ ক্রমে ক্রমে পরিবেশের সহিত **নিজের ইচ্ছানুযায়ী খাপ খাওয়াইবার (Active adaptation)** ক্ষমতা অর্জন করিয়া জীবজগতে স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী হইল। মানুষ দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সামনের পা-দুইটি দেহের ভার বহনের কাজ হইতে মুক্ত হইয়া অন্য জিনিস ধরিবার এবং যন্ত্রপাতি নির্মাণ করিবার ক্ষমতা অর্জন করিল। হাত, মস্তিষ্ক, অতুলনীয় প্রকাশক্ষমতাসম্পন্ন স্বরযন্ত্র ও দৈহিক শক্তির সাহায্যে মানুষের সংস্কৃতি সৃষ্টির অভিযান আরম্ভ হইল। মানুষ প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে ক্রমেই অধিকতর সম্পদ ছিনাইয়া লইতে লাগিল, এখন সে প্রকৃতিকে অনুকরণ করিয়া নূতন সম্পদ সৃষ্টি করিতেছে (যথা, কৃত্রিম রেশম, কৃত্রিম রবার) এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নতিসাধন করিতেছে (যথা, কয়লা ধৌত করিয়া নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লাকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লায় পরিণত করা ইত্যাদি)।

মানুষ তাহার অতুলনীয় প্রকাশক্ষমতাসম্পন্ন স্বরযন্ত্রের সাহায্যে **ভাষার সৃষ্টি** করিয়াছে, যাহার দ্বারা সে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও জটিল উচ্চস্তরের ভাবধারা পর্যন্ত বিনিময়ে সক্ষম। ক্রমশঃ ভাষার লিখিত রূপ দেওয়া হইয়াছে, ছাপাখানার আবিষ্কার হইয়াছে। এই ভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান স্থায়িভাবে সংরক্ষণের, এক যুগ হইতে অন্য যুগে, এবং স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া কলা-কৌশলের উন্নতি হইতেছে এবং হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া গড়িয়া উঠা সংস্কৃতি প্রকৃতির রূপ পাল্টাইয়া দিতেছে। মানুষের কলা-কৌশল এখন আর নিছক অপরিবর্তনীয় গণ-কলাকৌশল

নহে। সামাজিক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মানুষ নিত্য নব **কলা-কৌশল উদ্ভাবন** করিতেছে। নূতন আবিষ্কারের ফলে পুরাতন কলা-কৌশল দ্রুত বাতিল হইয়া যাইতেছে।

প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা (Paucity of Natural Resources)—সভ্যমানুষের সম্পদের অর্থ ও প্রকৃতি বুঝিবার জন্য পশু-মানুষের সভ্যমানুষে উত্তরণের এই কাহিনী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সভ্যমানুষের সম্পদ বহুল পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ নয়। প্রকৃতি তাহার ভাণ্ডারের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশমাত্র মুক্তহস্তে দান করে। অবশিষ্ট অংশ যে সে দান করে না শুধু তাহাই নহে, সম্পদ-সন্ধানী সভ্যমানুষের সম্পদলাভের প্রয়াসে সে দুরতিক্রম্য **বাধার সৃষ্টি** করে। সভ্যমানুষের অধিকাংশ সম্পদ তাহার বহু আয়াসে লব্ধ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবনী কৌশলের সম্মিলিত ফল। জলস্রোত প্রকৃতির দান, কিন্তু তাহা হইতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ মানুষের সংস্কৃতির অবদান। প্রকৃতিতে সমস্ত মৌলিক পদার্থ রহিয়াছে। কিন্তু পশু-মানুষের নিকট ইহাদের কোন মূল্যই নাই। কারণ সে ইহাদের ব্যবহার জানিত না। এমনকি সে ইহাদের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সচেতন ছিল না। কিন্তু বর্তমানে প্রকৃতিতে একশত মৌলিক পদার্থ থাকিলে সভ্যমানুষ তাহা হইতে লক্ষ লক্ষ যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারে।

এই কারণে মিশেল বলিয়াছেন যে, **মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হইল তাহার জ্ঞান (Knowledge)**।* কারণ জ্ঞানই সমস্ত সম্পদের উৎস। প্রস্তর যুগের মানুষ যাহারা ক্ষুধা ও শত্রুর সঙ্গে লড়াই করিয়া দুঃখের জীবন যাপন করিত তাহাদের সঙ্গে এবং বর্তমান যুগের অপেক্ষাকৃত নিরাপত্তা ও সুখের ভিতর লালিত মানুষের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হইল জ্ঞান। কয়লা ও খনিজ তৈল, বিদ্যুৎ ও পারমাণবিক শক্তি, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি এবং বিজ্ঞানের অসংখ্য বিস্ময়কর আবিষ্কারের যে জ্ঞান আধুনিক মানুষের রহিয়াছে, প্রস্তর যুগের মানুষের তাহা ছিল না। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও প্রয়োগবিদ্যার যত উন্নতি হইবে এবং মানুষের চাহিদা যত বাড়িবে ততই নূতন নূতন সম্পদ আবিষ্কৃত হইবে এবং পুরাতন সম্পদের নূতনভাবে প্রয়োগের

* **"Incomparably greatest among human resources is knowledge. It is greatest because it is the mother of other resources."—*Welsey C. Mitchell.***

ব্যবস্থা হইবে।* সুতরাং দেখা যায় যে, সম্পদের বিচার তাহার **কার্য-কারিতার** দিক হইতে করিতে হইবে।

সম্পদ ও চাহিদা (Resources and Wants)—সম্পদের পরিবর্তন শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রয়োগ-কৌশলের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে না, এই পরিবর্তন মানুষের **ব্যক্তিগত চাহিদা** ও **সামাজিক লক্ষ্যের** পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেও ঘটিয়া থাকে। ইংরাজ আমলে ভারতবর্ষের লক্ষ্য এবং স্বাধীন ভারতের লক্ষ্যের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রহিয়াছে। ইহার ফলে ১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতে যে সম্পদ ছিল ১৯৪৭ সালের পর তাহার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রগঠন। ফলে পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পদবৃদ্ধির জোর প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ দামোদর, মহানদী, কোশী প্রভৃতি নদীগুলি পূর্বে বিশেষ কাজে লাগিত না। বিভিন্ন নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া বর্তমানে ঐগুলি হইতে বিদ্যুৎ, মৎস্য, সেচের জল ইত্যাদি পাওয়া যাইতেছে।

প্রকৃতি ও সংস্কৃতি (Nature and Culture)—মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ-সৃষ্টিতে সংস্কৃতি ক্রমেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক প্রগতি প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। মানুষ নিজেও ইহার দ্বারা প্রভাবিত হয়। কেবলমাত্র মানুষের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত চাহিদা ও সামর্থ্য সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয় না। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক সংস্থা, প্রথা ও পদ্ধতিও ইহার প্রভাব এড়াইতে পারে না। মানবগোষ্ঠী ক্রমেই প্রসারিত ও জটিল হইতেছে। শ্রমবিভাগ ও শ্রম-বিশেষী-করণ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতেছে। উন্নততর যাতায়াত ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার ফলে দূর-দূরান্তের মানুষ পরস্পরের নিকট-সান্নিধ্যে আসিতেছে এবং পৃথিবীব্যাপী পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাইতেছে। সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলে জনসংখ্যারও পরিবর্তন ঘটিতেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, কারিগরী দক্ষতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা প্রভৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। অবশ্য কালক্রমে জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির গতি হ্রাস পাইতে পারে, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে জনসংখ্যাও হ্রাস পাইতে পারে।

* "It is technology which gives value to the stuffs which it possesses; and as the useful arts advance, the gifts of nature are remade."

—*Walton H. Hamilton.*

সুতরাং দেখা যাইতেছে সংস্কৃতি দুই প্রকারের পরিবর্তন ঘটায়, একদিকে প্রকৃতি এবং মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রয়োগ-কৌশল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে পরিবর্তন ঘটায়, অন্যদিকে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, গোষ্ঠীর সহিত ব্যক্তির এবং গোষ্ঠীর সহিত গোষ্ঠীর সম্পর্কে পরিবর্তন ঘটায়। সরকার, ধর্মীয় সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, চেম্বার অব কমার্স, জীবনযাত্রার মান, রাজনৈতিক মতবাদ প্রভৃতি সংস্কৃতির অবদান।

সম্পদের সৃষ্টি ও ধ্বংস (Resource-creation and Destruction)—মানুষ যেমন সম্পদ সৃষ্টি করে তেমনি সে সম্পদ ধ্বংসও করে। কয়লা, তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস বা অরণ্যের কাষ্ঠ ব্যবহার করিতে গেলে এইগুলির ধ্বংস হইবেই। আবার অনেকসময় **নূতন আবিষ্কারের** ফলে কোন কোন সম্পদ ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। বৃহদাকার ইস্পাত-কারখানা-স্থাপনের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহখনি ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বর্তমানে ঐগুলি আর সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে না। উহারা **নিরপেক্ষ সামগ্রীতে (Neutral Stuff)** পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মানুষের **নির্বুদ্ধিতা** ও **অদূরদর্শিতার** ফলে আরও অনেক বেশী সম্পদ ধ্বংস হয়। ত্রুটিপূর্ণ কৃষিকার্য, অপরিমিত পশুচারণ অথবা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অরণ্য-সম্পদ আহরণের ফলে ভূমিক্ষয় (soil-erosion) ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অনেকের মতে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেতু নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের অনেক নদীনালা মজিয়া গিয়াছে। গৃহযুদ্ধ, আন্তর্জাতিক যুদ্ধ, শ্রেণী-সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব ও কলহের ফলে কি বিপুল পরিমাণ সম্পদের ধ্বংস হয় তাহার হিসাব কে রাখে?

সম্পদ-সৃষ্টির উদাহরণ হিসাবে আমরা ব্রেজিলের মিনাস্ গেরাইস্ (Minas Geraes) অঞ্চলের লৌহ আকরিকের উল্লেখ করিতে পারি। এই অঞ্চলে যে লৌহ আকরিকের ভাণ্ডার রহিয়াছে তাহা বহুদিন হইতেই মানুষের জানা ছিল। মধ্যে মধ্যে ইহা ব্যবহারের চেষ্টাও হইয়াছে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত ইহা 'নিরপেক্ষ সামগ্রী' ছিল। মাত্র কয়েক বৎসর হইল এই লৌহ-ভাণ্ডারের উপর ভিত্তি করিয়া একটি আধুনিক লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠায় ইহা সম্পদে পরিণত হইয়াছে। নিরপেক্ষ সামগ্রীর এইরূপ সম্পদে রূপান্তর নিম্নলিখিত **উপাদানগুলির** উপর নির্ভর করিয়াছে :

(১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৎ-প্রতিবেশী নীতি (The Good Neighbour Policy)—যাহার মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বার্থ, জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি এবং

বিভিন্ন দেশের সরকারের মধ্যে পারস্পরিক বুঝাপড়ার ফল প্রতিফলিত হইয়াছে। (২) মূলধন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৎ-প্রতিবেশী নীতি গ্রহণ করার ফলে ঐ দেশ হইতে একটি আধুনিক ইস্পাত-কারখানা স্থাপনের জন্য ঋণ, কারিগর ও যন্ত্রপাতি ব্রেজিলে সরবরাহ করা হয়। (৩) স্থানীয় অঞ্চল মনুষ্যবাসের উপযোগী করিবার জন্য জনস্বাস্থ্যমূলক ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। (৪) ভিটোরিয়া বন্দর পর্যন্ত রেলপথের সংস্কার ও যাতায়াত-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা হয়। (৫) শ্রমিক—শ্রমিকের সামর্থ্য ও কাজ করিবার ইচ্ছা বাড়াইবার জন্য শ্রমিক আইন, মজুরি নীতি ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। (৬) ইস্পাত-দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়ানো হয়। (৭) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে ব্রেজিলের লৌহ আকরিকের বৈদেশিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। (৮) সরকারী নীতি—ব্রেজিল সরকার দেশে ইস্পাতশিল্পের উন্নতিতে আগ্রহী ছিলেন এবং এই শিল্পকে সাহায্য (subsidy) দিয়াছিলেন। (৯) আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা (technology)—লৌহ আকরিক-উত্তোলন, ধাতব লৌহ-নিষ্কাশন এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ইস্পাত-উৎপাদন কারিগরী বিদ্যার উন্নতির ফলেই সম্ভব হইয়াছে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, **প্রাকৃতিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান-সমূহের গতিশীল ঘাত-প্রতিঘাতের (Dynamic interaction) মধ্য দিয়াই কোন জিনিস সম্পদে পরিণত হয়।**

সম্পদের উন্নতিসাধন সম্বন্ধে আধুনিক চিন্তাধারা (Modern Trends in Resource Development)—মানুষের জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির জন্যই সম্পদের প্রয়োজন। মানুষের জীবনমানের উন্নতিই সম্পদ-সৃষ্টির প্রধান লক্ষ্য।* এই লক্ষ্যসাধনের জন্য মানুষ বুদ্ধিবলে সংস্কৃতির সাহায্যে প্রচণ্ড বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির দানকে সম্পদে পরিণত করিয়া জীবনধারণ বা জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য নিয়োজিত করে। প্রাকৃতিক বাধা-বিঘ্ন অনেকসময় মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নতিতে ও সম্পদ-সৃষ্টিতে সাহায্য করে (৬৬ পৃঃ)। আধুনিক শিল্পোন্নত দেশসমূহের সম্পদ-সৃষ্টির দিকে তাকাইলেই দেখা যায়, কিভাবে চাহিদার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে, কিভাবে কলা,

* "The only final value is human life, or rather human living, with all its richness and fullness of experience."—*Albert B. Wolfe.*

বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির উচ্চ মান প্রকৃতির দানকে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে নিয়োজিত করিতেছে। চাহিদা মিটাইবার জন্য শুধু যে সম্পদ-সৃষ্টিই হইতেছে তাহা নহে, সম্পদের অধিকতর কার্যকারিতার জন্য অপেক্ষাকৃত কম কার্যকরী সম্পদ ধ্বংস করা হইতেছে। কারণ মানুষ বিচার করে কিভাবে প্রকৃতি হইতে সুলভে সর্বাপেক্ষা বেশী সম্পদ উৎপন্ন করা যায়। অনেকে মনে করেন যে, অধিকতর কম কার্যকরী সম্পদের ধ্বংসসাধন মানুষের অবনতি ঘটাইবে এবং শেষপর্যন্ত শিল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক পতন আসন্ন হইয়া উঠিবে। অবশ্য সকল দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ্ এই ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত একমত নহেন।

সম্পদ-সংরক্ষণ
(Conservation of Resources)

সম্পদ ও ইহার ব্যবহার লইয়া পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করিতে হইলে সম্পদ-সংরক্ষণের সমস্যা লইয়াও আলোচনা করিতে হইবে। কারণ সংরক্ষণ বলিতে সম্পদের উপযুক্ত হারে উৎপাদন ও ব্যবহার বুঝায়। সংরক্ষণ-সমস্যার মধ্য দিয়া ব্যক্তি-স্বার্থের সহিত সমষ্টি-স্বার্থের সংঘাত অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে।

সংরক্ষণ-সম্বন্ধীয় ধারণা (Concept of Conservation)—সংরক্ষণের অর্থ—স্থান ও কাল অনুযায়ী পরিবর্তনশীল। এইজন্য ইহার কোন একটি চরম সংজ্ঞা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। সংরক্ষণের দুইপ্রকার অর্থ করা যাইতে পারে। সংরক্ষণ বলিতে কম উৎপাদন ও ব্যবহার বুঝায়। আবার সংরক্ষণ বলিতে বুঝায় **অপচয়-নিবারণ**। প্রথম অর্থে সংরক্ষণ বলিতে বুঝায় ব্যবহারে সংযম অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানের ত্যাগস্বীকার। সংরক্ষণের দ্বিতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী অপচয়-নিবারণের অর্থ হইল উৎপাদনে দক্ষতা-বৃদ্ধি। কিন্তু দক্ষতা বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন-খরচ কম হইবে, খরচ কম হইলে স্বভাবতঃই বাজার-দরও কম হইবে; ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে সাধারণতঃ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। সম্পদের উৎপাদন-বৃদ্ধি নিশ্চয়ই সম্পদ-সংরক্ষণ নয়। সংরক্ষণের আরও বহু সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু সেগুলি মোটেই স্পষ্ট নয়।

অনেকে সংরক্ষণ বলিতে **মিতব্যয়িতা** বুঝাইয়াছেন। কিন্তু দুইটি শব্দ সমার্থক নহে। সংরক্ষণ বলিতে বুঝায় কম করিয়া ব্যবহার, যাহার ফলে

একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তে অপেক্ষাকৃত বেশী সম্পদ মজুত থাকিবে। কিন্তু মিতব্যয়িতা বলিতে যে স্বভাবতঃই কম করিয়া ব্যবহার বুঝাইবে তাহা নহে। মিতব্যয়িতা বলিতে বুঝায় যথাসম্ভব ত্যাগস্বীকার করিয়া যথাসম্ভব অধিক ফললাভ। অনেকসময় মিতব্যয়িতার ফলে সংরক্ষণ হইতে পারে। কিন্তু তাহা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করিবার কোন কারণ নাই যে, সংরক্ষণ ও মিতব্যয়িতা একই অর্থ প্রকাশ করে। যেখানে অপচয়-নিবারণ অর্থাৎ মিতব্যয়িতার ফলে উৎপাদন ও ভোগ বৃদ্ধি পায় সেখানে মিতব্যয়িতা সংরক্ষণের সূচনা করে না।

সংরক্ষণ বলিতে কেবলমাত্র সম্পদের উৎপাদন হ্রাস করা বুঝায় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, কোন কোন সময় মিতব্যয়িতার ফলে সংরক্ষণ হইতে পারে। এই মিতব্যয়িতা বা অপচয়-নিবারণ উৎপাদনে হইতে পারে, আবার ব্যবহার বা ভোগেও হইতে পারে। ব্যবহারে মিতব্যয়িতা বলিতে কেবল কম ব্যবহার বুঝায় না, **বিচার-বিবেচনার সহিত ব্যবহার** বুঝায়। কিন্তু বিচার-বিবেচনার সহিত সম্পদ ভোগ করিতে হইলে দুইটি জিনিসের প্রতি নজর রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, কোন বিশেষ সম্পদ প্রধানতঃ সেই সকল কাজে ব্যবহার করিতে হইবে, যে সকল কাজের পক্ষে ইহা বিশেষভাবে উপযোগী। খনিজ তৈল উত্তাপ-সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু উত্তাপ-সৃষ্টি কয়লার দ্বারাও হইতে পারে। অথচ খনিজ তৈল পরিশোধনের পর পেট্রোল উৎপাদন করিয়া মোটর-গাড়ী, বিমান চালানো যায়, যাহা কয়লার দ্বারা সম্ভব নহে। সুতরাং বিচার-বিবেচনার সহিত ব্যবহার করিতে হইলে খনিজ তৈল উত্তাপ-সৃষ্টির জন্য ব্যবহার না করিয়া মোটর-গাড়ী, বিমান-পোত প্রভৃতি চালাইবার জন্য ব্যবহার করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সঞ্চিত সম্পদের স্থলে যথাসম্ভব প্রবহমান সম্পদ ব্যবহার করিতে হইবে (৩৩ পৃঃ)। উদাহরণস্বরূপ কয়লা ও খনিজ তৈলের স্থলে যথাসম্ভব জলবিদ্যুৎ ব্যবহার করিতে হইবে।

সম্পদ সংরক্ষণ করিতে হইলে শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ লইয়া বিবেচনা করিলে চলিবে না। শ্রম, মূলধন অর্থাৎ উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলিও বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ একটি বিশেষ অনুপাতে শ্রম, মূলধন ও ভূমি অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদের সমন্বয়ের ফলেই উৎপাদন সংঘটিত হয় এবং এই **অনুপাতের পরিবর্তন** ঘটানো সম্ভব। সুতরাং সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের ফলে যদি প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান হ্রাস পায়, তাহা হইলে

শ্রম এবং মূলধনের চাহিদা এবং ব্যবহার সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে। অতএব সংরক্ষণের সমস্যা বিবেচনা করিবার সময় উৎপাদনের সকল উপাদান একসঙ্গে লইয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

একথাও মনে রাখা দরকার যে, সকল প্রকার সম্পদ-সংরক্ষণের জন্য একই **নিয়ম** ও **পদ্ধতি** অবলম্বন করিলে চলিবে না। সম্পদের প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী সংরক্ষণের নিয়ম ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে হইবে। কারিগরী বিদ্যার দ্রুত উন্নতির ফলে নূতন নূতন সম্পদ আবিষ্কৃত হইতেছে, সম্পদের নূতন ব্যবহারের প্রচলন হইতেছে এবং নূতন উৎস হইতে প্রচলিত সম্পদ আহরণের ব্যবস্থা হইতেছে ; ফলে বিভিন্ন সম্পদের গুরুত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তারও হ্রাস-বৃদ্ধি হইতেছে। সাধারণ মাটি হইতে অ্যালুমিনিয়াম-উৎপাদন যদি সহজসাধ্য হয়, তাহা হইলে অ্যালুমিনিয়াম সংরক্ষণকে আর কতটা গুরুত্ব দেওয়া হইবে ? আণবিক শক্তি-উৎপাদন সহজসাধ্য ও সুলভ হইলে কয়লা ও খনিজ তৈলের গুরুত্বের পরিবর্তন ঘটিবে। এই সকল পরিবর্তনের জন্য সংরক্ষণ সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম প্রণয়ন করা কঠিন।

ব্যবহারের ফলে সম্পদের পরিমাণ, বিশেষ করিয়া সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ কমিয়া যায়। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে সম্পদের ব্যবহারোপ-যোগিতা বৃদ্ধি পাইয়া অথবা পরিবর্ত-সম্পদ আবিষ্কৃত হইয়া উহা আবার কিয়ৎ পরিমাণে পূরণ হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা সম্পদ হিসাবে গণ্য করিলে আমরা উপরোক্ত ঘটনা এইভাবে ব্যক্ত করিতে পারি যে, ক্রমেই সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক সম্পদ বস্তুগত সম্পদের স্থান গ্রহণ করে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কারিগরী দক্ষতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে **জনসংখ্যা** দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়। ফলে সাংস্কৃতিক উন্নতির ফলে যেটুকু সম্পদ বাঁচে তাহা বর্ধিত জনসংখ্যার ব্যবহারের ফলে খরচ হইয়া যায়। এই অবস্থায় সাংস্কৃতিক উন্নতির দ্বারা সম্পদ-সংরক্ষণের কোন সাহায্য হয় না। যদি সাংস্কৃতিক উন্নতির সঙ্গে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহা হইলেই সম্পদ-সংরক্ষণ সম্ভব হয়।

পৃথিবীতে সম্পদের সর্বাধিক বিনাশ ঘটে যুদ্ধের ফলে। বিশেষ করিয়া আধুনিক সর্বগ্রাসী **মহাযুদ্ধ** অপরিমেয় সম্পদ-ধ্বংসের প্রধান কারণ।

সুতরাং সম্পদ-সংরক্ষণের সমস্ত রকমের ব্যবস্থার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হইল পৃথিবীতে চিরকালের জন্য যুদ্ধবন্ধের ব্যবস্থা করা এবং শান্তি চিরস্থায়ী করা।

প্রশ্নাবলী

1. Account for the growing resource-consciousness in the modern world.

উঃ—'সম্পদ সম্পর্কে অর্থনৈতিক চিন্তাধারা' (১২ পৃঃ—১৪ পৃঃ) লিখ।

2. Define 'resources'. Discuss some of the popular misconceptions about resources and trace the evolution of the concept of resources.

উঃ—'সম্পদ একটি গতিশীল ধারণা' (১৫ পৃঃ—১৭ পৃঃ) এবং 'সম্পদের সংজ্ঞা' (১৭ পৃঃ—১৮ পৃঃ) লিখ।

3. "Resource is a dynamic concept"—Explain.

উঃ—'সম্পদ একটি গতিশীল ধারণা' (১৫ পৃঃ—১৭ পৃঃ) লিখ।

4. "The extent of want-satisfaction is a function of resources and resistances, not of resources alone"—Elucidate.

উঃ—'সম্পদের কাযকারিতা-তত্ত্ব' (১৮ পৃঃ—২১ পৃঃ) লিখ।

5. Analyse the functional theory of resources and indicate the modern trends in resource development.

উঃ—'সম্পদের সংজ্ঞা' (১৭ পৃঃ—১৮ পৃঃ) এবং 'সম্পদের কাযকারিতা-তত্ত্ব' (১৮ পৃঃ—২১ পৃঃ) লিখ।

6. Explain fully the concept of *conservation of resources* and indicate briefly the need for the conservation of forest resources and their utilization in some countries of the world,

উঃ—'সম্পদ-সংরক্ষণ' (২৪ পৃঃ—২৭ পৃঃ) লিখ এবং 'অরণ্য ও অরণ্যসম্পদ' অধ্যায়ের 'অরণ্য-সংরক্ষণ' লিখ।

7, Explain fully how resources evolve out of the dynamic interaction of natural, human and cultural forces. Illustrate your answer by suitable examples.

উঃ—'প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা' (২০ পৃঃ—২১ পৃঃ), 'সম্পদ ও চাহিদা' (২১ পৃঃ), 'প্রকৃতি ও সংস্কৃতি' (২১ পৃঃ—২২ পৃঃ), 'সম্পদের সৃষ্টি ও ধ্বংস' (২২ পৃঃ—২৩ পৃঃ) লিখ।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাকৃতিক সম্পদ

(Natural Resources)

যে সকল সম্পদের উপর ভিত্তি করিয়া মানুষের অর্থনৈতিক জীবন গড়িয়া উঠে এবং কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি অর্থনৈতিক কার্য-কলাপ যে সকল সম্পদ লইয়া সৃষ্টি হয়, তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:. (১) প্রাকৃতিক সম্পদ ; যথা, খনিজ পদার্থ, জলস্রোত, অরণ্য, জলবায়ু ইত্যাদি ; (২) মনুষ্য-সম্পদ ; (৩) সাংস্কৃতিক সম্পদ ; যথা, সংগঠন, কারিগরী দক্ষতা ইত্যাদি। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের সহিত তাহার পরিবেশের সম্পর্ক বুঝিতে হইলে এই তিন শ্রেণীর সম্পদের প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রকৃতির আপাতবিরোধী স্বভাব

(Some Paradoxes of Nature)

প্রকৃতি—অনুকূল ও প্রতিকূল (Nature, Friend and Foe)— প্রাকৃতিক সম্পদ লইয়া আলোচনা করিবার সময় প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, প্রকৃতি একদিকে মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নানা-প্রকার জিনিস প্রতিনিয়ত সরবরাহ করিতেছে, অন্যদিকে মানুষের জীবনে নানা বিঘ্নও সৃষ্টি করিতেছে। বৃষ্টিপাতের ফলে ধরণী শস্যশ্যামলা হয়, নদী-নালা, খাল-বিল পুষ্ট হয় ; কিন্তু ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাতে বহু গৃহ, শস্য, পশু, ও মানুষের ক্ষতি হয়। পৃথিবীতে যেমন উর্বর পলিমাটি দ্বারা গঠিত নদী-উপত্যকা ও বদ্বীপ রহিয়াছে তেমনি আছে ঊষর কঠিন পার্বত্য অঞ্চল ও শুষ্ক মরুভূমি। নদীপথে যাতায়াতের সুবিধা হয়, নদী হইতে পানীয় জল, সেচের জল ও মৎস্য পাওয়া যায়। আবার সেই নদীতে বন্যা হইলে ধন-প্রাণের সমূহ ক্ষতি হয়। পশ্চিমবঙ্গে দামোদর নদের সাহায্যে একদিকে যেমন জলসেচের ব্যবস্থা, জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন ও যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে, অন্যদিকে ১৯৫৯ সালে এই দামোদরের বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘরে কান্নার রোল পড়িয়া গিয়াছিল। মানুষ প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক সম্পদগুলি

সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার ও জীবনযাত্রার প্রণালী আরামপ্রদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি যেখানে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে মানুষ চেষ্টা করিতেছে সেই বাধা অতিক্রম করিবার। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, তাপ-নিয়ন্ত্রণ, জলসেচের ব্যবস্থা, যানবাহন ইত্যাদি ইহার উদাহরণ। প্রকৃতি মানুষের **বন্ধু** আবার **শত্রু**ও বটে।

প্রকৃতি—কৃপণ ও মুক্তহস্ত (Nature, Niggardly, and Bountiful)—প্রকৃতি একদিকে যেমন কৃপণ, অন্যদিকে তেমনি মুক্তহস্ত। জীবনধারণের অবশ্য প্রয়োজনীয় বাতাস ও জল প্রকৃতির মুক্তহস্তের দান (Free gift of Nature)। অনুকূল জলবায়ু, উর্বর ভূমি, বন্যপশু ও অরণ্যসম্পদও প্রকৃতি মানুষকে দিয়াছে। কিন্তু লোকসংখ্যা যতই বাড়িতে থাকে ততই অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমি ও প্রতিকূল জলবায়ুতে মানুষ বসতি স্থাপন করিতে বাধ্য হয়। প্রকৃতির কৃপণ রূপটি তখন বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রেও আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষ উদ্যোগী ও পরিশ্রমী হইলে অপেক্ষাকৃত প্রতিকূল পরিবেশেও জীবনধারণের বন্দোবস্ত করিতে পারে। বুদ্ধি, কৌশল ও পরিশ্রমের দ্বারা প্রতিকূল পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া, প্রকৃতিকে বশে আনিয়া প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে সম্পদ আহরণ করিয়া মানুষ নিজেকে ঐশ্বর্যশালী করিয়াছে। এইভাবে অনুর্বর জমিতে সার দিয়া ইহাকে উর্বর করা হইতেছে; নূতন ধরনের ফসল ও বীজ আবিষ্কার করিয়া অত্যধিক শুষ্ক ও শীতল অঞ্চলে কৃষিকার্য হইতেছে; নদীতে বাঁধ দিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইতেছে; নূতন খনিজ পদার্থ আবিষ্কার করিয়া যন্ত্রপাতির সাহায্যে নূতন পদ্ধতিতে ইহা উত্তোলনের ব্যবস্থা করিয়া এবং খনিজ পদার্থের নূতন নূতন ব্যবহার প্রচলন করিয়া সহস্র রকমের জিনিস প্রস্তুত হইতেছে।

প্রকৃতি—অপরিবর্তনীয় ও পরিবর্তনশীল (Nature, Constant and Changing)—জড়বিজ্ঞানের (Natural Science) দৃষ্টিকোণ হইতে প্রকৃতিকে অপরিবর্তনীয় (Constant) বলিয়া মনে হয়। কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর আয়তন বাড়েও নাই কমেও নাই। পৃথিবীতে মোট স্থলভাগের পরিমাণও প্রায় নির্দিষ্ট। সাগর-মহাসাগরে জলের পরিমাণেও কোনও পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানের (Social Science) দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে প্রকৃতিকে আর অপরিবর্তনীয় বলিয়া মনে হয় না;

প্রকৃতি নিয়ত-পরিবর্তনশীল (Changing)। ভূগর্ভে সঞ্চিত কয়লা, লৌহ ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ; মানুষ ইচ্ছামতো ইহার পরিমাণ বাড়াইতে পারে না। কিন্তু খনিজ পদার্থের ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা অর্জন করিয়া কিংবা নূতন ব্যবহার আবিষ্কার করিয়া ইহার উপযোগিতা বৃদ্ধি করিতে পারে। যেমন, কয়লা প্রধানতঃ শক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ কয়লা সঞ্চিত ছিল, আজ তাহার পরিমাণ কিছুই বাড়ে নাই ; ব্যবহারের ফলে বরং কিছু কমিয়াছে। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এক টন কয়লা হইতে যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করা যাইত বর্তমানে কারিগরী জ্ঞানের উন্নতির ফলে তাহা অপেক্ষা অন্ততঃ সাতগুণ বেশী শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব। সুতরাং সঞ্চিত কয়লার দৈহিক পরিমাণ গত পঞ্চাশ বৎসরে না বাড়িলেও উপযোগিতার দিক দিয়া ইহার পরিমাণ প্রায় সাতগুণ বাড়িয়াছে। শুধু তাহাই নহে, কয়লা হইতে শক্তি উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার উপজাত দ্রব্যও (যথা, ক্রিয়োসোট, ন্যাপথালিন, স্যাকারিণ, আলকাতরা, পিচ ইত্যাদি) পাওয়া যাইতেছে। ফলে কয়লার উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য খনিজ পদার্থ সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যায়। পৃথিবীতে জমির পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই ; কিন্তু জলসেচ, সার, ভালো বীজ ও উন্নততর পদ্ধতির সাহায্যে জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে ; চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে আরও বাড়িবে। সুতরাং উপযোগিতার দিক দিয়া বিচার করিলে জমি বাড়িয়াছে বলিতে হইবে। আবহমানকাল ধরিয়া নদীতে জলস্রোত বহিয়া চলিয়াছে। নদী হইতে মৎস্যশিকার, যাতায়াত-ব্যবস্থা ও পানীয় জলসংগ্রহ পূর্বেও হইত, এখনও হয়। কিন্তু আধুনিক কালে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের ব্যবস্থা হওয়ায় নদীতে স্রোতের পরিমাণ না বাড়িলেও মানুষের কাছে ইহার উপযোগিতা লক্ষগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। বহুক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া যায়। ব্যবহারের ফলে কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতির পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে অরণ্যসম্পদ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর বুক হইতে অনেক পশু দ্রুত লোপ পাইতেছে।

প্রকৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

(Significant Aspects of Nature)

প্রাকৃতিক সম্পদের বণ্টন (Distribution of Natural Endowment)—পৃথিবীতে প্রাকৃতিক সম্পদ সকল অঞ্চলে সমানভাবে পাওয়া যায় না। মেরু অঞ্চল বাদ দিলে পৃথিবীর মোট স্থলভাগের শতকরা মাত্র ৪০ ভাগ জমি কৃষিকার্যের উপযোগী। ইহার মধ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জমির পরিমাণ আরও কম এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। চীনের হোয়াংহো, ইয়াং-সি-কিয়াং ও সিকিয়াং নদীর অববাহিকা, ভারতের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি অঞ্চল, উত্তর আফ্রিকায় নীলনদের উপত্যকা, পূর্ব ইউরোপের স্টেপ্‌স্‌, উত্তর আমেরিকার প্রেইরী, আর্জেন্টিনার পম্পাস্‌ ও অস্ট্রেলিয়ার ডাউন্‌স অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কৃষি-জমি রহিয়াছে। কিন্তু মঙ্গোলিয়া, সিংকিয়াং, তিব্বত, বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান, আরব ও উত্তর আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলে কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ খুব সামান্য। প্রধান প্রধান খনিজ পদার্থের বণ্টনও অত্যন্ত অসমান। পৃথিবীর মোট কয়লার খুব সামান্য অংশই দক্ষিণ গোলার্ধে রহিয়াছে; উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে খনিজ তৈল নাই বলিলেই চলে। বিভিন্ন দেশে নানাপ্রকারের জলবায়ু দেখা যায়। ভূ-প্রকৃতি সর্বত্র একপ্রকার নহে। প্রাকৃতিক সম্পদের এই **অসমান বণ্টনের** ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক উন্নতি ও জীবনযাত্রার মানে তারতম্য দেখা যায়। অবশ্য প্রকৃতির সহিত মানুষের এই সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ নহে। নানাপ্রকার জটিল উপাদানের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া এই সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, নিউ ইয়র্কের অতি আধুনিক জটিল সমাজের মানুষের জীবনযাত্রার উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব খুব স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ নহে। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, কারিগরী ও সাংগঠনিক অগ্রগতির ফলে এই সম্পর্ক জটিল ও অস্পষ্ট।

প্রাকৃতিক সম্পদের বণ্টন শুধু অসমান নহে, বিভিন্ন সম্পদের বণ্টন **বিভিন্ন হারে অসমান**; যথা:

(ক) কোন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায় (Ubiquities); যেমন, বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন।

(খ) কয়েকটি প্রাকৃতিক সম্পদ সর্বত্র পাওয়া না গেলেও অনেক

জায়গায় পাওয়া যায় (Commonalities); যেমন, কৃষিযোগ্য ভূমি ও অরণ্যসম্পদ।

(গ) কোন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ দুষ্প্রাপ্য (Rarities); পৃথিবীর মাত্র অল্প কয়েকটি স্থানেই ইহা পাওয়া যায়; যথা, মলিবডেনাম (পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত হয়), নিকেল (মোট উৎপাদনের শতকরা ৭৫ ভাগ কানাডায় পাওয়া যায়), টিন (অধিকাংশ টিন মালয় ও ইন্দোনেশিয়ায় পাওয়া যায়) ইত্যাদি।

(ঘ) কয়েকটি প্রাকৃতিক সম্পদ শুধু একটিমাত্র স্থানেই পাওয়া যায় (Uniquities); যেমন, বাণিজ্যিক ক্র্যায়োলাইট শুধু গ্রানল্যাণ্ডেই পাওয়া যায়।

কোন প্রাকৃতিক সম্পদ কি পরিমাণে কোন্ কোন্ জায়গায় পাওয়া যায় তাহা নানাদিক দিয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অধিকাংশ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য একাধিক প্রাকৃতিক সম্পদের **একত্র সমাবেশ** প্রয়োজন। যেমন, লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের জন্য প্রধানতঃ প্রয়োজন লৌহ আকরিক ও কয়লা। লৌহ আকরিক ও কয়লা পৃথকভাবে বহুস্থানে পাওয়া গেলেও, ইহাদের পাশাপাশি অবস্থান কয়েকটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ।

কোন প্রাকৃতিক সম্পদ কোথাও সঞ্চিত থাকিলেই যে তাহা ব্যবহার করা যাইবে তাহা নহে। সকল উৎপাদনের ক্ষেত্রেই **খরচের প্রশ্ন** বড় হইয়া দেখা দেয়। সুতরাং সঞ্চিত সম্পদ সংগ্রহ করিতে হইলে কি পরিমাণ অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় হইবে তাহার উপরেই ইহার ব্যবহার নির্ভর করিবে।

বর্তমান পৃথিবীতে কয়েকটি প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ খুব অল্প; যেমন, টিন। আবার কয়েকটি প্রাকৃতিক সম্পদ মোট পরিমাণের দিক দিয়া কম না হইলেও এবং পৃথিবীর অধিকাংশ জায়গায় পাওয়া গেলেও উৎপাদন-খরচের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ সহজলভ্য নহে। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে অল্পবিস্তর বক্সাইট পাওয়া যায়। অথচ বক্সাইট হইতে অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন-খরচ অত্যন্ত বেশী; কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের বাজারদর তেমন বেশী নহে। ফলে যে সকল স্থানে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বক্সাইট একসঙ্গে অধিক পরিমাণে সহজে পাওয়া যায় সেই সকল স্থানেই ইহা সংগ্রহ করা হয়। যে সকল বক্সাইটে খাঁটি অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম তাহা উত্তোলন করিলে খরচ পোষাইবে না। সুতরাং অন্যনিরপেক্ষভাবে অ্যালুমিনিয়াম

সুলভ হইলেও আপেক্ষিক ভাবে ইহা দুর্লভ; অর্থাৎ ব্যবহারোপযোগী অ্যালুমিনিয়াম অনেক কম।

সকল প্রাকৃতিক সম্পদের **গুরুত্ব** সমান নহে। অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় সম্পদ দুর্লভ হইলে যতটা চিন্তার কারণ হইবে, অবশ্য-ব্যবহার্য জিনিস দুর্লভ হইলে তাহা অপেক্ষা বেশী চিন্তার কারণ হইবে।

সঞ্চিত সম্পদ ও প্রবহমান সম্পদ (Flow and Fund Resources)—কোন্ প্রাকৃতিক সম্পদ কোথায় কি পরিমাণে পাওয়া যায় তাহা আলোচনা করিবার সময় ইহাদের স্থায়িত্ব (Permanency) বা ক্ষয়িষ্ণুতার (Exhaustibility) প্রশ্নটিও বিবেচনা করা প্রয়োজন। কয়েকটি প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ফলে কমিয়া যায় না, ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে পূরণ হয়। এইগুলিকে বলা হয় প্রবহমান সম্পদ (Flow Resources)। জলপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ, সূর্যকিরণ প্রভৃতি প্রবহমান সম্পদ। উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করিলে অরণ্য ও মৃত্তিকাও প্রবহমান সম্পদ। আর এক শ্রেণীর প্রাকৃতিক সম্পদ আছে যেগুলি যে পরিমাণে ব্যবহার করা হয় সেই পরিমাণে স্থায়িভাবে কমিয়া যায়। যেমন, কয়লা, খনিজ তৈল ইত্যাদি। ইহাদের বলা হয় সঞ্চিত সম্পদ (Fund Resources)। প্রবহমান সম্পদ অপেক্ষা সঞ্চিত সম্পদ দুর্লভ হইলে মানুষের দুশ্চিন্তার কারণ হয়। অবশ্য **সকল সঞ্চিত সম্পদই ক্ষয়িষ্ণু (Exhaustible) নহে**। কয়লা পোড়াইলে নিঃশেষ হইয়া যায়; কিন্তু লৌহ হইতে নির্মিত দ্রব্যাদি (যথা, যন্ত্রপাতি, সেতু ইত্যাদি) বহুদিন টেঁকে এবং ব্যবহারের অনুপযোগী হইলে ঐগুলি গলাইয়া আবার নূতন জিনিস প্রস্তুত করা যায়।

শক্তিসম্পদের মধ্যে কয়লা ও তৈল ক্ষয়িষ্ণু বলিয়া বর্তমানে ইহাদের ব্যবহার কমাইয়া প্রবহমান শক্তির (যথা, জলবিদ্যুতের) ব্যবহার বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হইতেছে এবং অন্যান্য প্রবহমান শক্তি (যথা, সূর্যশক্তি) ব্যবহারের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা হইতেছে। মানব-সভ্যতার ভবিষ্যৎ বহুল পরিমাণে এই সকল প্রয়াসের সাফল্যের উপর নির্ভর করিতেছে।

শক্তি
(Energy)

প্রকৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান শক্তি। সমস্ত উৎপাদনমূলক কাজের মূলে রহিয়াছে শক্তি। মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করিলে দেখা

যায় যে, মূলতঃ উহার পিছনে রহিয়াছে নূতন নূতন শক্তির উৎসের আবিষ্কার ও উৎপাদনকার্যে তাহার ব্যবহার। সর্বপ্রথমে মানুষ জীবনধারণের জন্য কেবলমাত্র নিজের পেশীশক্তির উপর নির্ভর করিত। তারপর ধীরে ধীরে সে পশুকে বশ করিতে শিখে এবং সমস্ত উৎপাদনকার্য পশু ও মানুষের পেশীশক্তির ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠে। প্রাচীন মিশর, ভারত, চীন ও অন্যান্য স্থানের **উদ্ভিদ-সভ্যতা** (Vegetable civilization) এইরূপ মানুষ ও পশুর শক্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে মানুষ বৃহৎ যন্ত্রের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে কয়লা, খনিজ তৈল, জলবিদ্যুৎ প্রভৃতি উন্নততর শক্তির উৎস আবিষ্কার ও উৎপাদনকার্যে ব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছে। ইহার ফলে মানুষের উৎপাদন-ক্ষমতা অবিশ্বাস্যরকমে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎপাদন-খরচ বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে এবং মানুষের শ্রমের ভার লাঘব হইয়াছে।

পদার্থ ও শক্তি (Matter and Energy)—পূর্বে পদার্থ ও শক্তির মধ্যে যে ভেদরেখা টানা হইত বর্তমানে তাহা আর হয় না। পদার্থকে শক্তিরই প্রকাশ বলিয়া মনে করা হয়। শক্তিকে পদার্থে ও পদার্থকে শক্তিতে পরিণত করিবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পারমাণবিক শক্তি-উৎপাদন এই আবিষ্কারের ফল। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ পদার্থ ও শক্তির মধ্যে আজ আর কোন ভেদরেখা না টানিলেও সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে পদার্থ ও শক্তি দুই ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। সেইজন্য খনিজ তৈল শক্তি হইলেও যে ঘন কালো তরল পদার্থ খনি হইতে উত্তোলন করা হয় এবং জাহাজে, রেলগাড়ীতে করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয় এবং ইহা হইতে উৎপাদিত যে শক্তির সাহায্যে মোটর-গাড়ী, বিমানপোত, কলকারখানা প্রভৃতি চালানো হয় তাহা সাধারণের দৃষ্টিতে এক নহে। একই খাদ্য একদিকে আমাদের দেহ গঠন করে অন্যদিকে কর্মশক্তি সৃষ্টি করে।

জৈবশক্তি ও জড়শক্তি (Animate and Inanimate Energy)—শক্তিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। গাছ, পশু, ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক-জাতীয় উদ্ভিদ ইত্যাদি জীবন্ত পদার্থের (Living Organism) মধ্য দিয়া যে শক্তির প্রকাশ তাহাকে জৈবশক্তি (Animate energy) বলে। কয়লা, খনিজ তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস, জলপ্রবাহ প্রভৃতি জড়পদার্থ (Non-living matter) হইতে যে শক্তি উৎপন্ন করা হয় তাহা জড়শক্তি (Inanimate energy)।

বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, জৈবশক্তিই হউক আর জড়শক্তিই হউক সূর্যই সকল শক্তির উৎস। পশু ও মানুষ শক্তি সংগ্রহ করে খাদ্য হইতে। এই খাদ্য আসে উদ্ভিদজগৎ হইতে। উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধি আবার নির্ভর করে সৌরশক্তির উপর। সুতরাং **সূর্যই শক্তির মূল উৎস।** সূর্যদেহে প্রতিনিয়ত হাইড্রোজেন-কণা হিলিয়ামে পরিণত হইবার ফলে প্রচণ্ড শক্তি উৎপাদিত হইতেছে। এই শক্তি উদ্ভিদের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটাইতেছে। পশু এই উদ্ভিদ খাদ্যহিসাবে গ্রহণ করিয়া, এবং মানুষ উদ্ভিদ ও পশু উভয়কেই খাদ্যহিসাবে গ্রহণ করিয়া জৈবশক্তি উৎপাদন করিতেছে। এই প্রক্রিয়া অন্তহীনভাবে চলিয়াছে। এই কারণে **জৈবশক্তি প্রবহমান সম্পদ (Flow resource)**।

কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি জড়শক্তির উৎসও সূর্য। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে ভূগর্ভে প্রোথিত উদ্ভিদদেহ হইতে কয়লা ও খনিজ তৈলের সৃষ্টি হইয়াছে; এই উদ্ভিদদেহ যে সূর্যকিরণের দ্বারা গঠিত হয় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি জড়শক্তি সঞ্চিত সৌরশক্তি। এই কারণে ইহারা ক্ষয়িষ্ণু (exhaustible) এবং ইহাদিগকে **সঞ্চিত সম্পদ (Fund resource)** বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। অবশ্য জলপ্রবাহ হইতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জড়শক্তি হইলেও ক্ষয়িষ্ণু নহে। জলবিদ্যুৎ প্রবহমান সম্পদ।

জৈবশক্তির দুইটা দিক রহিয়াছে—(১) **পেশীশক্তি (Muscular energy)** ও (২) **প্রাণশক্তি (Biotic energy)**। যে শক্তির সাহায্যে ঘোড়া গাড়ী টানে, গাধা মাল বহন করে, হাতী বড় বড় কাঠের গুঁড়ি গাড়াতে বোঝাই করে তাহা পেশীশক্তি। প্রাণের সৃষ্টি ও বৃদ্ধির মধ্য দিয়া যে শক্তির প্রকাশ তাহা হইল প্রাণশক্তি। এই শক্তির বলেই বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়, অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হয়, বৃক্ষ শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া উঠে, ফুল ও ফল ধারণ করে। সেইভাবে পশু ও মানুষের সন্তান-উৎপাদন এবং সেই সন্তানের পূর্ণতাপ্রাপ্তি প্রাণশক্তির ফল। পেশীশক্তি প্রাণশক্তির উপর নির্ভরশীল। একটা ঘোড়াকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে তবেই তাহাকে দিয়া কাজ করানো যাইবে। পশু বা মানুষ যে খাদ্য গ্রহণ করে তাহার অধিকাংশ প্রাণধারণ ও বৃদ্ধিসাধনের জন্য খরচ হয়; অল্প অংশমাত্র পাওয়া যায় কর্মশক্তি সৃষ্টির জন্য। **জড়শক্তির তুলনায় জৈবশক্তি নিকৃষ্ট।** কোন একটি পশু বা একজন মানুষে শক্তির পরিমাণ অতি সামান্য;

ফলে পশু ও মানুষের মাথাপিছু উৎপাদন-ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। একটি রেলের ইঞ্জিন যে পরিমাণ মাল টানিয়া লয় সেই পরিমাণ মাল বহন করিতে কতসংখ্যক মানুষ বা পশুর প্রয়োজন হইবে? পশু বা মানুষের সাহায্যে, তাহা যত অধিকসংখ্যকই হউক না কেন, শব্দের চেয়ে দ্রুতগতি বিমান চালানো সম্ভব নয়। কোন শ্রমিক বা পশু যন্ত্রের মতো না থামিয়া চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করিতে পারে না। মানুষ বা পশুর কাজ যন্ত্রের মতো কাঁটায় কাঁটায় নির্ভুল হওয়া প্রায় অসম্ভব। জড়শক্তির তুলনায় পেশীশক্তির খরচ অনেক বেশী। শিল্পোন্নত দেশসমূহে গড়পড়তা হিসাবে জড়শক্তির তুলনায় পশুশক্তির খরচ ৩০ হইতে ১০০ গুণ এবং মনুষ্যশক্তির খরচ ৩০০ হইতে ১০০০ গুণ বেশী। অনুন্নত দেশসমূহে মনুষ্যশক্তি অপেক্ষাকৃত সুলভে পাওয়া যায়।

আমাদের খাদ্য ও পরিধেয়ের প্রায় সবটাই পাওয়া যায় বৃক্ষ, ফুল, ফল, মাংস, দুগ্ধ প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রকাশিত প্রাণশক্তি হইতে। বাসস্থানের সরঞ্জাম, তৈজসপত্র ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য অনেক জিনিস ইহা হইতে পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া শিল্পবিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগের অর্থাৎ **কৃষিপ্রধান সমাজের অর্থনীতি** মূলতঃ পেশীশক্তি ও প্রাণশক্তির অর্থাৎ **জৈবশক্তির উপর নির্ভরশীল** ছিল। কয়লা, খনিজ তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি জড়শক্তির ব্যবহার প্রধানতঃ শিল্পবিপ্লবের সময় হইতেই আরম্ভ হয়। **জড়শক্তির ব্যবহার শিল্পপ্রধান সমাজের বৈশিষ্ট্য।** (এই বিষয়টি শক্তিসম্পদ অধ্যায়ের 'শক্তি-ব্যবহারের অর্থনৈতিক তাৎপর্য' অংশে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।)

মনুষ্যশক্তি (Human Energy)—শক্তির ক্ষেত্রে মনুষ্যশক্তির স্থান অতুলনীয়। মনুষ্যশক্তি দুইরূপে প্রকাশিত হয়: (১) **দৈহিক শক্তি**, (২) **মনঃশক্তি** বা **চিন্তাশক্তি**। দৈহিক শক্তিতে মানুষ জড়শক্তি-চালিত যন্ত্র ও পশুর তুলনায় নগণ্য। একটি নির্দিষ্ট সময়ে এক টন কয়লা হইতে উৎপাদিত শক্তি যন্ত্রের সাহায্যে যে পরিমাণ কাজ করিবে এক সহস্র মানুষের পক্ষেও তাহা সম্ভব হইবে না। উপরন্তু ঐ মানুষগুলির যে আহার্যের প্রয়োজন হইবে তাহার মূল্য এক টন কয়লা অপেক্ষা অনেক বেশী।

কিন্তু মনঃশক্তিতে মানুষ অনন্য। একজন মানুষের চিন্তা, আবিষ্কার, উদ্যোগ ও আকাঙ্ক্ষা সভ্যতার অগ্রগতিতে যে প্রেরণা যোগাইতে পারে, পৃথিবীর সমস্ত কয়লা বা তৈলের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। মানুষের প্রকৃত

শক্তির উৎস তাহার মস্তিষ্ক—পেশী নহে, এবং এই মস্তিষ্কের ক্ষমতায় জীবজগতে তাহার তুলনা নাই। মানুষের শক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তাহার চিন্তা, আবিষ্কার ও আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া এবং এই সকল কাজ মানুষ ছাড়া আর কাহারও দ্বারা সম্ভব নহে। এই কারণে উৎপাদন-ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু ও দক্ষ তখনই হইবে যখন মানুষ দৈহিক শ্রম হইতে মুক্ত হইয়া শুধু আবিষ্কার, পরিকল্পনা, সংযোগসাধন, নিয়ন্ত্রণ, সংগঠন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার কাজে নিযুক্ত থাকিবে; আর সমস্ত রকমের কায়িক শ্রমের কাজ করিবে পশু ও জড়শক্তি-চালিত যন্ত্র। মানুষ অধিকাংশ সময় দৈহিক শ্রমের কাজে নিযুক্ত থাকিলে তাহার চিন্তাশক্তির স্ফূর্তি ঘটিবে না। ফলে সভ্যতার অগ্রগতি ব্যাহত হইবে। এইজন্য মানুষকে দৈহিক শ্রমের ভার হইতে মুক্তি দিতে হইবে যাহাতে সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, আবিষ্কার, পরিকল্পনা ও পরিচালনার কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখিতে পারে। কোন সমাজ মানুষকে এই সুযোগ কতটা দিতে পারে তাহার উপরেই সেই সমাজের উন্নতি ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

জৈবশক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন সভ্যতাসমূহের সর্বপ্রধান ত্রুটি হইল এই সকল সভ্যতায় অধিকাংশ মানুষ প্রায় সর্বক্ষণ কায়িক শ্রমের কাজে নিযুক্ত থাকিত। ফলে চিন্তাশক্তি-বিকাশের সুযোগ মুষ্টিমেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতায় জড়শক্তি-চালিত যন্ত্র মানুষের কায়িক শ্রমের ভার; এমনকি কিছু কিছু মানসিক শ্রমের ভারও নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লওয়ায় ব্যাপকভাবে মানুষের চিন্তাশক্তি-বিকাশের সুযোগ ঘটিয়াছে।

জড়শক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of Inanimate Energy)—জৈবশক্তির তুলনায় জড়শক্তি অর্থাৎ কয়লা, তৈল, জলপ্রবাহ, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতিতে শক্তি অনেক ঘনীভূতরূপে পাওয়া যায়। জড়শক্তি নিয়ন্ত্রণ করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। জড়শক্তির সাহায্যে অতিকায় যন্ত্রসমূহ প্রচণ্ড শক্তিতে ও গতিতে চালানো যায় যাহা জৈবশক্তির দ্বারা সম্ভব নহে। পশু বা মানুষের পেশীশক্তির সাহায্যে দ্রুতগতি বিমান বা বিশ-ত্রিশ হাজার টনের দ্রুতগামী জাহাজ চালানো আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ-স্থাপন এবং চন্দ্রগ্রহে রকেট-প্রেরণ জড়শক্তি ব্যতীত কোন দিনই সম্ভব হইত না। জড়শক্তি ব্যবহার করিতে হইলে একদিকে ধাতুনির্মিত মূল্যবান্ যন্ত্রপাতি অন্যদিকে উচ্চস্তরের প্রযুক্তিবিদ্যা (technical knowledge) এবং অনুকূল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রয়োজন। এই সকল

যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর জন্য নানারূপ খনিজ পদার্থ বিশেষ করিয়া লৌহ, তাম্র প্রভৃতি ধাতব খনিজ প্রয়োজন। আবার এই সকল খনিজ পদার্থ ব্যাপকহারে উত্তোলন, নিষ্কাশন ও ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য কয়লা বা তৈলের ন্যায় জড়শক্তি প্রয়োজন। শক্তিচালিত যন্ত্র এমন সূক্ষ্ম, নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে কাজ করিতে পারে যাহা মানুষ বা পশুর পক্ষে অসম্ভব। জড়শক্তি ব্যবহারের ফলেই শ্রমবিভাগ, শ্রমবিশেষীকরণ, স্ট্যানডার্ডাইজেসন ও র‍্যাশানালাইজেসন সম্ভব হইয়াছে। মানুষের উৎপাদন-ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, উৎপাদন-খরচ বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে এবং মানুষের শ্রমের ভার লাঘব হওয়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ললিতকলা-চর্চার অধিকতর সুযোগ ঘটিয়াছে; ইহা সভ্যতার অগ্রগতি দ্রুততর করিয়াছে। (এই বিষয়টি 'শক্তিসম্পদ' অধ্যায়ে 'শক্তি-ব্যবহারের অর্থনৈতিক তাৎপর্য' অংশে আরও বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।)

ভূমির পরিবর্তনশীল ভূমিকা
(Changing Role of Land)

ভূমি-ব্যবহারের সম্ভাবনা (Land-use potentials)—সমগ্র পৃথিবী স্থলভাগ ও জলভাগে বিভক্ত। মহাদেশসমূহ, সাগর-মহাসাগরে অবস্থিত অসংখ্য দ্বীপ ও মেরু অঞ্চল লইয়া স্থলভাগ গঠিত। স্থলভাগ বিভিন্নভাবে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়:

(১) গ্রাম, নগর, রাস্তাঘাট, কল-কারখানা ও বাসস্থান নির্মাণের জন্য;

(২) বন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থল হিসাবে;

(৩) পশুপালন ও কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য;

(৪) পদার্থের রূপান্তরপ্রাপ্তির প্রধান কারক হিসাবে; যেমন, ভূগর্ভে চাপ ও তাপের ক্রিয়ার ফলে উদ্ভিদদেহ কয়লায় রূপান্তরিত হইয়াছে;

(৫) খনিজ পদার্থের সর্বপ্রধান উৎস হিসাবে। ইহা ছাড়া ভূপৃষ্ঠ তুষার, সূর্যরশ্মি, বৃষ্টিপাত ও জলবায়ুর অন্যান্য উপাদান নিজদেহে গ্রহণ করিয়া মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করে।

পৃথিবীতে কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ প্রাকৃতিক অবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ। অবশ্য এই সীমাবদ্ধ ভূমির কতটা কিভাবে সদ্ব্যবহার করা যাইবে তাহা নির্ভর করে মানুষের উদ্যোগ, প্রচেষ্টা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার উপর। পৃথিবীতে

স্থলভাগের মোট আয়তন প্রায় ১৫ কোটি বর্গ-কিলোমিটার। ইহার মধ্যে ১'৫ কোটি বর্গ-কিলোমিটার ভূমি মেরু অঞ্চলে অবস্থিত। অবশিষ্ট ১৩'৫ কোটি বর্গ-কিলোমিটার ভূমির মধ্যে কৃষি-বিশেষজ্ঞগণের অভিমত অনুযায়ী ৫'৫ বর্গ-কিলোমিটার ভূমি কৃষিকার্যের উপযোগী বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক ভূমি (Two-Dimensional and Three-Dimensional Land)—গতিশীল জগতে ভূমির ভূমিকাও রূপান্তরিত হইয়াছে। শিল্পবিপ্লবের পূর্বপর্যন্ত প্রকৃতিকে কাজে লাগাইবার প্রচেষ্টা প্রায় সম্পূর্ণভাবে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভূমি বলিতে দ্বিমাত্রিক ভূমি অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমন্বিত ভূমির উপরিভাগকেই বুঝাইত। এই **দ্বিমাত্রিক ভূমি (Two-Dimensional Land)** মৃত্তিকারূপে প্রধানতঃ কৃষি ও পশুপালনে ব্যবহৃত হইত। ভূমির উর্বরতার উপর কোন দেশের উন্নতি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ নির্ভর করিত। এই অবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদ বলিতে সাধারণভাবে ভূমিকেই বুঝাইত। কারণ মানুষের যাহা-কিছু প্রয়োজন তাহার অধিকাংশই ভূমি হইতে সংগ্রহ করা হইত। কৃষিকার্য, পশুপালন, অরণ্যসম্পদ আহরণ ইত্যাদি সেকালের অধিকাংশ অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ছিল মৃত্তিকার দান। কাহার অধীনে কি পরিমাণ ভূমি আছে তাহার দ্বারাই কে কতটা প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক তাহা বুঝানো হইত। কৃষিপ্রধান যুগে এই ভূমির উপর ভিত্তি করিয়া পৃথিবীর সকল দেশে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই ব্যবস্থায় অধিকাংশ মানুষ ছিল ভূমির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ. এবং ভূমির মালিকানার উপর নির্ভর করিত মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি, সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভূমির কার্যকারিতাও পরিবর্তিত হইয়াছে। যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি জড়শক্তি, এবং এই সকল শক্তিসম্পদ উৎপাদন, নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগের জন্য লৌহ, তাম্র প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতু উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। ফলে ভূগর্ভের অজানা জগতে মানুষ প্রবেশ করিয়াছে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ সংগ্রহের জন্য। তাই বর্তমানে ভূমির ব্যবহার শুধু ইহার উপরিভাগে বা মৃত্তিকায় সীমাবদ্ধ নহে। অধিকাংশ খনিজ সম্পদের আধার ভূগর্ভও সমানভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। কেবল মাটির নীচের দিকে নহে, উপরের দিকেও মানুষের হস্ত প্রসারিত হইয়াছে। বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করা হইতেছে,

সূর্যরশ্মি কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা হইতেছে, তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভূমি বলিতে আজকাল শুধু দৈর্ঘ্যপ্রস্থ-সমন্বিত দ্বিমাত্রিক ভূমি বুঝায় না, ইহার সহিত ঘনত্বও যুক্ত হইয়াছে। তাই ভূমি বর্তমানে **ত্রিমাত্রিক (Three-Dimensional Land)**। শিল্পবিপ্লবের পূর্বে ভূমি প্রধানতঃ ব্যবহার করা হইত কৃষিকার্য ও পশুপালনের জন্য। বর্তমানে কৃষি ও পশুপালন ব্যতীত খনিজ সম্পদ-সংগ্রহ, শক্তি-উৎপাদন ও অন্যান্য বহু কাজে ভূমি ব্যবহৃত হইতেছে। যে অঞ্চলের ভূগর্ভ হইতে খনিজ পদার্থ উত্তোলন করা হয় তাহার আয়তনের তুলনায় ঐ পদার্থের গুরুত্ব অনেক বেশী হওয়ায় আজকাল নিছক হেক্টর বা বর্গ-কিলোমিটারের হিসাবে ভূমির পরিমাপ করা সম্ভবপর নয়।

ভূমির সীমাবদ্ধতা ও প্রাকৃতিক সম্পদের পরিবর্তনশীলতা (Fixity of Land and Dynamics of Nature)—ভূমি বলিতে যখন দ্বিমাত্রিক ভূমি অর্থাৎ ভূমির উপরিভাগকে বুঝায়, তখন ইহা নির্দিষ্ট। কিন্তু যখন ভূমির অর্থ সকল রকমের প্রাকৃতিক সম্পদ, তখন ইহা আর নির্দিষ্ট নহে ; ইহা তখন পরিবর্তনশীল। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, প্রয়োগবিদ্যা ও সামাজিক সংগঠনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহারও পরিবর্তন ঘটে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে নিত্য নূতন প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কৃত হইতেছে। পুরাতন সম্পদ নূতন কাজে ব্যবহারের কিংবা অধিকতর সার্থকভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা হইতেছে। প্রথমে অ্যালুমিনিয়াম হইতে শুধু বাসনপত্র প্রস্তুত হইত ; ক্রমে ইহা দ্বারা বিমানপোত, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতে থাকে। আজকাল অ্যালুমিনিয়ামের সাহায্যে যানবাহন, সেতু, গৃহাদির কাঠামো ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। আজ পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার শুধু জ্বালানি হিসাবে সীমাবদ্ধ নহে ; ইহা হইতে কিটোন, অ্যাসিটোন, ইথার, ন্যাপথালিন, মোম প্রভৃতি নানাবিধ উপজাত দ্রব্য উৎপাদন করিয়া অসংখ্য কাজে ব্যবহার করা হইতেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম, প্রয়োগবিদ্যা ও সংগঠন পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ; মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ইহাদের সম্মিলিত ফল। পৃথিবীতে দ্বিমাত্রিক ভূমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ হইলেও ত্রিমাত্রিক ভূমি অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ সীমাবদ্ধ নহে।

স্থূল অর্থে ভূমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ হইলেও **কার্যকারিতার** দিক হইতে বিচার করিলে ভূমি সামাবদ্ধ নহে। ভারতে বর্তমানে এক হেক্টর জমিতে যে পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হয়, ভালো বীজ, সার, জলসেচ, উন্নত কৃষিপদ্ধতি

ও যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে একই পরিমাণ জমি হইতে বর্তমানের তুলনায় বেশী ফসল পাওয়া যাইবে; অর্থাৎ কার্যকারিতার দিক হইতে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। ইহা ছাড়া বিশেষ সামাজিক সংগঠন ও আইন একটি বিশেষ সময়ে জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতে পারে এবং সেই আইন ও সংগঠনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভূভাগ মানুষের নিকট উন্মুক্ত হইয়া যায়। বিভিন্ন দেশে সামন্ত-তন্ত্রের যুগে আইন করিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী জমি ব্যবহার করিতে কিংবা নূতন জমির সন্ধানে বাহির হইতে দেওয়া হইত না। ফলে জমির পরিমাণ ছিল নির্দিষ্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঔপনিবেশিকগণ আসিয়া প্রথমে দেশের পূর্বদিকে বসতি স্থাপন করে। সেই সময় ইহাদের ব্যবহারে যে জমি ছিল গৃহযুদ্ধের পর হইতে পশ্চিমদিকে বসতিবিস্তারে কার্যতঃ কোন বাধা না থাকায় ব্যবহারযোগ্য জমির পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জমির পরিমাণের বিষয় যখন বিবেচনা করা হইবে তখন একটি নির্দিষ্ট স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা করিতে হইবে।

ভূমির কৃষিযোগ্যতা
(Cultivability of Land)

কৃষিযোগ্যতার সীমা (Agricultural Limitations)—গত দেড় শত দুই শত বৎসরে যন্ত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি ঘটিয়াছে এবং তুলনামূলকভাবে কৃষিকার্যের গুরুত্ব সেই অনুপাতে হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু অন্যদিকে পৃথিবীতে জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কোন কোন অঞ্চলে এই বৃদ্ধির হার একটা বিস্ফোরণের পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দ্রুতবর্ধমান এই লোক-সংখ্যার খাদ্য-সমস্যার সমাধানের জন্য কৃষিযোগ্য কি পরিমাণ জমি পৃথিবীতে আছে তাহা নির্ধারণ করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পৃথিবীতে কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ প্রাকৃতিক অবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ। অবশ্য এই সীমাবদ্ধ ভূমির কতটা কিভাবে সদ্ব্যবহার করা যাইবে তাহা নির্ভর করে মানুষের উদ্যোগ, প্রচেষ্টা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার উপর। পৃথিবীতে স্থলভাগের মোট আয়তন প্রায় ১৫ কোটি বর্গ-কিলোমিটার। ইহার মধ্যে ১·৫ কোটি বর্গ-কিলোমিটার ভূমি মেরু অঞ্চলে অবস্থিত। অবশিষ্ট ১৩·৫ কোটি বর্গ-কিলোমিটার ভূমির মধ্যে কৃষি-বিশেষজ্ঞগণের অভিমত অনুযায়ী ৫·৫ বর্গ-

কিলোমিটার ভূমি কৃষিকার্যের উপযোগী বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু কি পরিমাণ জমি কৃষিকার্যের জন্য পাওয়া যাইতে পারে তাহার হিসাব করিবার সময় একথা মনে রাখা দরকার যে, কিছু পরিমাণ জমি আছে যাহাতে মানুষের বর্তমান জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী কোন কিছু উৎপাদন করা সম্ভব নহে। আবার কিছু জমিতে উৎপাদন সম্ভব হইলেও তাহা এত কম যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া কৃষকের পক্ষে স্থায়িভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা সম্ভব নহে; ফলে সেই জমি কাগজপত্রে কৃষিকার্যের উপযোগী হইলেও কার্যতঃ নহে। ভূমির কৃষিযোগ্যতা (অর্থাৎ কি পরিমাণ জমি কৃষিকার্যের উপযোগী) নিম্নলিখিত চারিটি **প্রাকৃতিক উপাদানের (Physical factors)** উপর নির্ভর করে :

(ক) **উত্তাপ (Temperature)**—মনুষ্যজীবনের ন্যায় উদ্ভিদজীবনের অস্তিত্ব ও বৃদ্ধির জন্য একটা নিম্নতম তাপমাত্রা প্রয়োজন। মেরু অঞ্চলে এই নিম্নতম উত্তাপ পাওয়া যায় না বলিয়াই কৃষিকার্য সম্ভব নহে। কৃষিকার্য সম্পর্কে কোন অঞ্চলের তাপমাত্রা বিবেচনা করিবার সময় বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা এবং শরৎকালে কখন তুষারপাত শুরু হয় ও বসন্তকালে কখন উহা শেষ হয় তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(খ) **আর্দ্রতা (Moisture conditions)**—বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি, কুয়াশা, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ও বাষ্পীভবনের হার ইত্যাদিকে এখানে আদ্রতা নামে অভিহিত করা হইতেছে। উদ্ভিদজীবনের জন্য নিম্নতম পরিমাণ আর্দ্রতা প্রয়োজন। কোথাও এই আর্দ্রতা না থাকিলে কৃষিকার্য সম্ভব নহে। নিম্নতম আর্দ্রতা না থাকিবার জন্যই মরু অঞ্চল কৃষিযোগ্য নহে।

(গ) **মৃত্তিকা (Soil)**—মনুষ্যজীবনের ন্যায় উদ্ভিদজীবনের জন্যও খাদ্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। উদ্ভিদ এই খাদ্য সংগ্রহ করে মাটি হইতে। কৃষিকার্যের জন্য মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ গাছের খাদ্য থাকা প্রয়োজন অর্থাৎ মাটি উর্বর হওয়া প্রয়োজন। মাটির গুণাগুণ বিবেচনা করিবার সময় উহার দৈহিক ও রাসায়নিক গঠন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করিতে হইবে।

(ঘ) **ভূ-প্রকৃতি (Landform or Topography)**—ভূগোলের সকল ছাত্রই জানে যে পার্বত্য অঞ্চলে কৃষিকার্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য অথবা একেবারেই অসম্ভব। অথচ সমভূমি অঞ্চলে ইহা সহজ ও সুলভ। একখণ্ড নীরস কঠিন প্রস্তরের উপর শস্য-উৎপাদন সম্ভব নহে।

উপরোক্ত চারিটি প্রাকৃতিক উপাদানের উপর কৃষিকার্য নির্ভরশীল; এইজন্য এই চারিটি উপাদানকে ভূমির কৃষিযোগ্যতার **প্রাকৃতিক চতুঃসীমা** (**Physical frontiers**) আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কৃষিকার্য এই চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ; অর্থাৎ উপযুক্ত উত্তাপ, আর্দ্রতা, ভূ-প্রকৃতি ও মৃত্তিকার উপর ভূমির কৃষিযোগ্যতা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

উপরোক্ত চারিটি উপাদান ব্যতীত **স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জও (Natural vegetation)** ভূমির কৃষিযোগ্যতা নির্ধারণে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ—বৃক্ষ ও তৃণ—আর্দ্রতা ও উর্বরতা সংরক্ষণে সাহায্য করে। যে মাটিতে কোনপ্রকার উদ্ভিদ্ নাই, তাহা শুষ্ক ও অনুর্বর হইয়া পড়ে এবং কৃষিকার্যের অনুপযুক্ত হয়।

এই প্রাকৃতিক চতুঃসীমার জন্য সকল জমিকেই মানুষের কার্যে নিযুক্ত করা যায় না। একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টিকে আরও ভালোভাবে বুঝানো যাইবে। পৃথিবীর মোট ১৫ কোটি বর্গ-কিলোমিটার জমির মধ্যে গম-উৎপাদনের উপযোগী তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকা এবং ভূ-প্রকৃতি দেখা যায় মাত্র ২ কোটি বর্গ-কিলোমিটার স্থানে।

ভূমির কৃষিযোগ্যতার সাংস্কৃতিক ও মানবিক সীমাবদ্ধতা (Cultural and Human Limitations of Cultivability)—প্রাকৃতিক চতুঃসীমার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কতটা জমিতে কিভাবে কৃষিকার্য করা যাইবে, তাহা নির্ভর করে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও সামাজিক সংগঠনের উপর। বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা ও যন্ত্রশিল্পে উন্নত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত অপেক্ষাকৃত অনুন্নত চীনদেশের অবস্থার তুলনা করিলে ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। কোন কোন ভৌগোলিকের হিসাব অনুযায়ী চীনে কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ ২৮ কোটি হেক্টর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪০ কোটি হেক্টর। অন্যদিকে চীনে লোকবসতির ঘনত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশী এবং চীনদেশে যেখানে শতকরা ৮০ জন লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেখানে মাত্র শতকরা ২০ জন। অথচ চীনদেশে মাত্র ৯ কোটি হেক্টর জমিতে কৃষিকার্য হয় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হয় ১৪ কোটি হেক্টর জমিতে।*

কৃষিযোগ্য ভূমির ভিত্তিতে চীনদেশে লোকবসতির ঘনত্ব মার্কিন

* এই হিসাবের মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে চীনে যে অর্থ নৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা ধরা হয় নাই।

যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ৪'৫ গুণ বেশী হইলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিযোগ্য ভূমির শতকরা ৩৬ ভাগে প্রকৃতপক্ষে কৃষিকার্য হয় আর চীনে হয় শতকরা ৩১ ভাগ জমিতে। দুই দেশের মধ্যে এই পার্থক্যের প্রধান কারণ, কৃষিকার্যে জড়-শক্তির ব্যবহার। চীনদেশে কৃষিকার্য হয় প্রধানতঃ কৃষকের কায়িক শ্রমের সাহায্যে; কৃষিক্ষেত্রে পশুও ব্যবহৃত হয়। এই দেশে কৃষি-যন্ত্রপাতি ও কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি জড়শক্তির ব্যবহার নাই বলিলেই চলে। কৃষি-জমি প্রস্তুত করা হইতে শুরু করিয়া ফসল-কাটা, ঝাড়াই-করা প্রভৃতি প্রায় সকল কাজই কৃষকের দৈহিক শক্তির সাহায্যে করা হইয়া থাকে এবং এই শক্তি কৃষক সংগ্রহ করে কৃষিজাত দ্রব্য খাদ্যহিসাবে গ্রহণ করিয়া। অর্থাৎ চীন-দেশে কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি কৃষিক্ষেত্র হইতেই সংগ্রহ করা হয়। শুধু তাহাই নহে, কৃষিকার্যের জন্য দেশের অধিকাংশ লোকের প্রায় সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় দেশের এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে মানুষের যাতায়াতও কম। ইহার ফলে দেশটি হাজার হাজার প্রায়-স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজ লইয়া গঠিত হইয়াছে।

যন্ত্রশক্তির তুলনায় কায়িক শ্রমের সাহায্যে ভূমিকর্ষণ করিতে ও ফসল কাটিতে অনেক বেশী সময় লাগে। এক হেক্টর জমি কোদাল দিয়া প্রস্তুত করিতে ছয়দিন সময় দরকার হয়। ফলে বৎসরের মধ্যে যে সময়টুকু কৃষিকার্যের উপযোগী তাহার একটা অংশ বৃথা নষ্ট হয়। এক বৎসরের মধ্যে ৬ মাস যদি কৃষিকার্যের উপযোগী হয় এবং ইহার মধ্যে ১/১½ মাস জমি প্রস্তুত করিতে এবং ১ মাস ফসল কাটিতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে ফসলের বৃদ্ধি ও পরিণতির জন্য পাওয়া যায় মাত্র ৩½/৪ মাস সময়। ইহার ফলে বিভিন্ন রকমের ফসলের চাষ সম্ভব হয় না। যন্ত্রের ব্যবহার না থাকিলেও চীনদেশে হেক্টর-প্রতি উৎপাদনের হার যথেষ্ট; কিন্তু মাথাপিছু উৎপাদন অত্যন্ত কম।

অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হেক্টর-প্রতি উৎপাদনের হার কম হইলেও কৃষকের মাথাপিছু উৎপাদন খুব বেশী। ইহার প্রধান কারণ কৃষিকার্যে জড়-শক্তির ব্যবহার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিকার্য হয় ট্রাক্টর, হারভেস্টার প্রভৃতি কৃষি-যন্ত্রের সাহায্যে। এই সকল যন্ত্র চলে কয়লা, তৈল বা বিদ্যুতের ন্যায় জড়শক্তির সাহায্যে; অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি চীনের ন্যায় কৃষিক্ষেত্র হইতে সংগ্রহ করা হয় না। এই শক্তি আসে খনি হইতে। এই জড়শক্তির সাহায্যে একজন কৃষক একসঙ্গে শত শত হেক্টর জমি

চাষ করিতে ও ইহার ফসল তুলিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষক ফসল উৎপাদনের জন্য শুধু যে প্রত্যক্ষভাবে কয়লা, তৈল প্রভৃতি জড়শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতেছে তাহা নহে; তাহার কাজের পিছনে রহিয়াছে শত শত কল-কারখানা। এই সকল কারখানায় যন্ত্র ও শক্তির সাহায্যে কৃষিকার্যে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কৃষি-যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইতেছে। ইহা ছাড়া কৃষকের জন্য আছে অতি উন্নত সুসংগঠিত কৃষি-গবেষণাগারসমূহ, যেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে নিত্য নূতন কৃষিপদ্ধতি ও ফসল আবিষ্কৃত হইতেছে। ইহার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু উৎপাদনের হার অত্যন্ত বেশী, কৃষিকার্যের গতি অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত এবং কৃষকের পক্ষে বহু বিচিত্র ফসল উৎপাদন করা সম্ভবপর। জড়শক্তি ও উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা রাশিয়ায় যে সকল জমি কৃষিকার্যের আওতায় আনা সম্ভব হইয়াছে, চীনদেশে (এবং কারিগরী বিদ্যায় অনুন্নত সকল দেশেই) অত্যধিক শীতল বা শুষ্ক আবহাওয়া বা ঐরূপ কোন প্রাকৃতিক বাধার জন্য সেইজাতীয় জমি এখনও পতিত রহিয়াছে।

বিনিময় অর্থনীতিতে ভূমির কৃষিযোগ্যতা (Cultivability in an Exchange Economy)—অনুন্নত দেশের কৃষক শস্য উৎপাদন করে প্রধানতঃ নিজের ও পরিবারের ব্যবহারের জন্য। উৎপাদনের খুব সামান্য অংশ বাজারে বিক্রয়ের জন্য অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় শিল্পোন্নত দেশে কৃষক ফসল উৎপাদন করে প্রধানতঃ বাজারে বিক্রয়ের জন্য। উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পায় তাহা দিয়া সে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিস বাজার হইতে ক্রয় করে। সুতরাং যে সকল দেশে বিনিময় অর্থনীতি পরিপূর্ণভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে সেখানে কতটা জমিতে চাষ করা হইবে তাহা নির্ভর করে ফসল উৎপাদনের খরচ ও ফসলের বিক্রয়মূল্যের উপর। বিক্রয়মূল্য যদি বেশ চড়া থাকে এবং উৎপাদিত ফসল কৃষিক্ষেত্র হইতে শহর ও বন্দর অঞ্চলে লইয়া যাইবার সুবিধা থাকে এবং পরিবহণের খরচ কম হয়, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিতেও ফসল উৎপন্ন হইবে। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রের সহিত বাজার অঞ্চলের যোগাযোগের ব্যবস্থা যদি ভালো না থাকে এবং উৎপাদিত ফসলের বিক্রয়মূল্য যদি কম হয় তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমিতে কৃষিকার্য করিলে তাহা লাভজনক হইবে না। ফলে কিছু জমি পতিত থাকিয়া যাইবে। ফসল উৎপাদনের

খরচ শুধু জমির উৎপাদিকা-শক্তির উপর নির্ভর করে না। কৃষকের দক্ষতা, কৃষি-সংগঠনের দক্ষতা, কয়লা ও তৈলের ন্যায় জড়শক্তির ব্যবহার, কৃষিঋণ, জলসেচ, উন্নত বীজ, সার, যন্ত্রপাতি. কীটনাশক ঔষধপত্র পাইবার সুবিধা, যাতায়াতের সুব্যবস্থা প্রভৃতির উপরও উৎপাদন-খরচ নির্ভর করে। সুতরাং কি পরিমাণ জমিতে কৃষিকার্য করা সম্ভব হইবে তাহা একদিকে যেমন কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয়মূল্যের উপর নির্ভর করে, অন্যদিকে কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনের খরচের উপরও নির্ভর করে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ সকল দেশে সকল সময়ের জন্য নির্দিষ্ট নহে। যে দেশ শিল্প-বাণিজ্যে যত উন্নত, কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদায় যত সমৃদ্ধ, কৃষকের দক্ষতা, যাতায়াত-ব্যবস্থা, জলসেচ, উন্নত বীজ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি ও শক্তির সরবরাহে যত উন্নত, এককথায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে যত অগ্রসর, সেই দেশে মোট স্থলভাগের তত বেশী অংশ কৃষিকার্যের আওতায় আসা সম্ভব হইয়াছে। পৃথিবীতে মানুষ যুগে যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানে কারিগরী দক্ষতায় যত উন্নত হইবে, ততই অধিক পরিমাণে জমি কৃষিযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

প্রশ্নাবলী

1. **Discuss some of the paradoxes of nature.**

উঃ—'প্রকৃতির আপাতবিরোধী স্বভাব' (২৮ পৃঃ—৩০ পৃঃ) লিখ।

2. **"Nature is constant and also it is changing." Explain how it happens.**

উঃ—'প্রকৃতি—অপরিবর্তনীয় ও পরিবর্তনশীল' (২৯ পৃঃ—৩০ পৃঃ) লিখ।

3. **Discuss some of the significant aspects of nature.**

উঃ—'প্রকৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ' (৩০ পৃঃ—৩৩ পৃঃ) লিখ।

4. **Discuss the pattern of distribution of natural endowment in the world and show how it has influenced the economic activities of man.**

উঃ—'প্রাকৃতিক সম্পদের বণ্টন' (৩০ পৃঃ—৩৩ পৃঃ) লিখ।

5. **Attempt a comparative analysis of the characteristic features and merits and demerits of animate and inanimate energy.**

উঃ—'জৈবশক্তি ও জড়শক্তি' (৩৪ পৃঃ—৩৬ পৃঃ), 'মনুষ্যশক্তি' (৩৬ পৃঃ—৩৭ পৃঃ) এবং 'জড়শক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ' (৩৭ পৃঃ—৩৮ পৃঃ) লিখ।

6. What do you mean by Two-Dimensional and Three-Dimensional land? Also describe how land has changed its role as a factor of production.

Or, Describe how the role of land in the economic activities of man has changed with the changes in human culture.

উঃ—'ভূমির পরিবর্তনশীল ভূমিকা' (৩৮পৃঃ— ৪১পৃঃ) লিখ।

7. Describe and explain with the help of specific examples the physical as well as the cultural and human limitations of culturability.

Or, Discuss the factors which determine the cultivability of land with suitable examples.

উঃ—'ভূমির কৃষিযোগ্যতা' (৪১ পৃঃ—৪৬ পৃঃ) লিখ।

8. Discuss how cultivability of land is affected by the energy use.

Or, "A key to availability in general and to cultivability in particular is the use made of energy—more specially, inaminate energy"—Explain.

উঃ—'ভূমির কৃষিযোগ্যতার সাংস্কৃতিক ও মানবিক সীমাবদ্ধতা' (৪৩ পৃঃ— ৪৫ পৃঃ) লিখ।

9. Evaluate the land-use potentials in different parts of the world and discuss in this connection the agricultural limitations in terms of climate, soil, natural vegetation and land-form.

উঃ—'কৃষিযোগ্যতার সীমা' (৪১ পৃঃ— ৪৩ পৃঃ) লিখ।

10. Attempt a comparative analysis of the characteristic features and the merits and demerits of animate and inanimete energy.

উঃ—'শক্তি' (৩৩ পৃঃ—৩৮ পৃঃ) লিখ।

চতুর্থ অধ্যায়

মনুষ্য-সম্পদ
(Human Resources)

প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া নিজের অভাব পরিতৃপ্তির জন্য ইহা ব্যয় করে। শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ থাকিলেই তাহা মানুষের ব্যবহার্য হয় না। ইহার সহিত মানুষের বুদ্ধি ও শ্রম যোগ করিলে তবেই ভোগ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়। বুদ্ধিবলে মানুষ নূতন আবিষ্কারের সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদকে নূতন নূতন কার্যে নিয়োজিত করিয়াছে। জমি প্রাকৃতিক সম্পদ; কিন্তু জমিতে বীজ বপন না করিলে ধান ও গম প্রভৃতি হইতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইবে না। আবার খনিজ সম্পদের আবিষ্কারের দ্বারা মানুষ প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে নানাবিধ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছে। নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা কয়লা শুধু শক্তি-উৎপাদনের জন্যই ব্যবহৃত হইতেছে না, নানাবিধ উপজাত দ্রব্যাদি (আলকাতরা, পিচ, গ্যাস, অ্যামোনিয়া, স্যাকারিণ প্রভৃতি) কয়লা হইতে প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে মানুষের বুদ্ধি ও শ্রমের যোগাযোগ হইলেই ভোগ্যদ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতে পারে। এইভাবে দেখা যায় মানুষ নিজেই সম্পদ-উৎপাদনের একটি প্রধান অঙ্গ। অন্যদিকে উৎপাদিত সম্পদ মানুষই ভোগ করে। প্রকৃতির দান কৃষি-জমি হইতে মানুষ খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিয়া নিজেই তাহা খাইয়া জীবন ধারণ করে। সুতরাং মানুষ একদিকে সম্পদ উৎপাদনের অঙ্গ, অন্যদিকে সম্পদের ভোগকর্তা। সম্পদ-উৎপাদনে ও ব্যবহারে মানুষ এইভাবে **দ্বৈত ভূমিকা** (Dual Role) অবলম্বন করে।

ইহা ছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে নিজের বুদ্ধিবলে ও কর্মপ্রচেষ্টায় নানাবিধ জিনিস প্রস্তুত করিয়া বা আবিষ্কার করিয়া মানুষ প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে। সৃষ্টির আনন্দ ব্যবহারের আনন্দের চেয়ে কম নহে। নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে মানুষের শ্রমের লাঘব হওয়ায় অবসর বিনোদনের জন্য মানুষ ক্রমশঃই বেশী সময় পাইতে থাকে। অবসর সময়ে মানুষ চিত্তবিনোদন করিয়া, কলাচর্চা করিয়া বা শিক্ষার প্রসার করিয়া সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করে।

মানুষ ও জমির অনুপাত এবং লোকবসতি-ঘনত্ব (Man-Land Ratio and Population Density)—সম্পদ-উৎপাদনে জমির দান অসামান্য। জমির সাহায্যে মানুষ কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন করে ও ভূগর্ভ হইতে খনিজ সম্পদ আহরণ করে। জমি হইতে এই সকল সম্পদ উৎপন্ন হইলেও, সকল সময় জমির মোট পরিমাণ বেশী হইলেই বেশী সম্পদ উৎপন্ন হইবে না, কারণ সকল জমি মানুষের প্রয়োজনে আসে না। কানাডার তুন্দ্রা অঞ্চল, মিশরের মরু অঞ্চল সম্পদ-উৎপাদনে মানুষকে সাহায্য করে না। অন্যদিকে মানুষের কর্মক্ষমতা থাকিলেই সম্পদ উৎপন্ন হইবে না, প্রকৃতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে ইহার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। মানুষের কর্মক্ষমতা এবং জমির উৎপাদিকা-শক্তির অনুপাতের উপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে। জমির পরিমাণ লোকসংখ্যার তুলনায় অপর্যাপ্ত হইলে দেশের উন্নতি ব্যাহত হইবে; অন্যদিকে লোকসংখ্যার তুলনায় জমির পরিমাণ বেশী হইলে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি সহজসাধ্য হইবে।

এখানে জমি বলিতে সমগ্র ভূমিভাগকেই বুঝাইবে না, শুধু **কার্যকরী জমিকে** বুঝাইবে। যে জমি হইতে মানুষ সম্পদ উৎপাদন করিতে পারে, তাহাকেই কার্যকরী জমি বলা হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ উর্বর জমি থাকিবার জন্য ঐ দেশ ১৮ কোটি লোকের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছে। অন্যদিকে ব্রেজিলের আয়তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা বেশী হইলেও, জমি অনুর্বর বলিয়া এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য এই দেশের মাত্র ৬½ কোটি লোকের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয় নাই।

লোকবসতি-ঘনত্বের (Population Density) সঙ্গে মানুষ ও জমির অনুপাতকে (Man-land ratio) কখনই একভাবে দেখা উচিত নহে। লোকবসতির ঘনত্ব বলিতে আমরা বুঝি মোট জমি ও লোকসংখ্যার অনুপাত; কিন্তু মানুষ ও জমির অনুপাত বলিতে আমরা বুঝি লোকসংখ্যার সঙ্গে 'কার্যকরা জমি'র অনুপাত। এক্ষেত্রে কার্যকরী জমির সঙ্গে দেশের সমগ্র প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদকেও অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। সাধারণতঃ যে জমিকে সম্পদ-উৎপাদনে নিয়োজিত করা যায় বা যে জমি মানুষের ব্যবহারে প্রয়োজন হয়, তাহাই কার্যকরী জমি। যেমন, মিশরের লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ২৬ জন; কিন্তু এই দেশের মোট আয়তন হইতে বসতিহীন মেরু অঞ্চল বাদ দিলে কার্যকরী জমির (নীলনদের উপত্যকা)

পরিমাণ দাঁড়াইবে মাত্র ৩৪,৮১৫ বর্গ-কিলোমিটারে। এই কার্যকরী জমির সঙ্গে সমগ্র দেশের লোকসংখ্যার অনুপাত প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ৭৫০ জন। এক্ষেত্রে মিশরের প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে লোকবসতির ঘনত্ব ২৬ জন এবং মানুষ ও কার্যকরী জমির অনুপাত ৭৫০ জন। সুতরাং কোন দেশের শুধু আয়তন ও লোকসংখ্যা বিচার করিয়াই সেই দেশকে অত্যধিক ঘনবসতি-যুক্ত বা বিরল-বসতিযুক্ত অঞ্চল বলা যায় না। কোন দেশের মানুষ-জমির অনুপাত বুঝিতে হইলে দেশের কার্যকরী জমি, প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ এবং উৎপাদনক্ষম মানুষের সংখ্যার বিচার করিতে হইবে। অনেকে চীনদেশকে একটি অত্যধিক ঘনবসতিযুক্ত অঞ্চল বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু চীনের জমির উর্বরতা ও কার্যকারিতা এবং চীনাদের অধ্যবসায় ও কর্মক্ষমতা বিচার করিলে দেখা যায় আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে চীন মোটেই অত্যধিক বসতিযুক্ত দেশ নহে; কার্যকরী জমির তুলনায় এখানকার লোকসংখ্যা অধিক নহে।

জমির কার্যকারিতা **গতিশীল** মানব-সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়াছে। সভ্যতার বিকাশের প্রথমার্ধে মানুষ জমি হইতে শুধু কৃষিজ সম্পদ উৎপন্ন করিত এবং বনজ সম্পদ সংগ্রহ করিত। সেই সময়ে জমির কার্যকারিতা বলিতে শুধু জমি হইতে উৎপন্ন কৃষিজ ও বনজ দ্রব্যকেই বুঝাইত। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জমির অভ্যন্তরস্থ খনিজ সম্পদ আহরণ করিতে শিখিল। বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য মানুষের বিভিন্ন চাহিদা মিটাইতে শুরু করিল। এই সময় ভূমি বলিতে **ত্রিমাত্রিক ভূমি** বুঝাইত। খনিজ দ্রব্য বিনিময় করিয়া মানুষ অন্য দেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিতে শুরু করিল। এইভাবে জমির কার্যকারিতার পরিধি বিস্তৃত হইল। বৃটেন স্থানীয় কৃষিজ দ্রব্যের সাহায্যে যত লোকের ভরণপোষণ করিতে পারে, খনিজ সম্পদ বিনিময় করিয়া ইহার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী লোকের সমৃদ্ধি লাভ করাইতে পারে। ইহা ছাড়া সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য-বাদী দেশসমূহের নিজেদের জমির উপরই শুধু স্থানীয় লোকের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করিত না; ইহাদের দখলীকৃত **উপনিবেশসমূহের জমির** কার্যকারিতাও এই সকল দেশের উন্নতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে শুরু করিল। বৃটেনের ক্ষুদ্র ভূভাগের উপর কিভাবে ৫$\frac{1}{2}$ কোটি লোক স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করিতেছে, ইহা বুঝিতে হইলে বৃটেনের সকল উপনিবেশের জমির

কার্যকারিতা সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। পূর্বে ভারতের জমিতে উৎপাদিত পাট, তুলা বৃটেনের শিল্পে নিয়োজিত হইত ; ভারতের জমির অভ্যন্তরস্থ লৌহ আকরিক বৃটেনের ইস্পাতশিল্পের উন্নতির জন্য নিয়োজিত হইত। এখনও রোডেশিয়ার তাম্র বৃটেনের শিল্পসমৃদ্ধির জন্যই নিয়োজিত হয়। এইভাবে দেখা যায়, বর্তমান যুগে লোকসংখ্যা ও জমির অনুপাত (Man-land ratio) বুঝিতে হইলে স্থানীয় জমি হইতে প্রাপ্ত কৃষিজ, বনজ ও খনিজ সম্পদের পরিমাণ, উপনিবেশের বা রাজনৈতিক প্রভাবান্বিত অঞ্চলের জমির কার্যকারিতা প্রভৃতির সঙ্গে স্থানীয় লোকসংখ্যার অনুপাত বুঝিতে হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জমির কার্যকারিতা বুঝিতে হইলে স্থানীয় জমির উৎপাদিকা-শক্তির সহিত এই দেশের রাজনৈতিক প্রভাবান্বিত ফরমোসা, ফিলিপাইন, পাকিস্তান ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহের জমির কার্যকারিতাও কিয়দংশে যোগ করিতে হইবে। কারণ এই সকল দেশের কৃষিজ, প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিয়োজিত হয়। সুতরাং মানুষ-জমির অনুপাত বুঝিতে হইলে, একদিকে কার্যকরী ত্রিমাত্রিক জমি ও উপনিবেশের জমি এবং অন্যদিকে মানুষের সংখ্যা, সংস্কৃতি ও কর্মক্ষমতার অনুপাত বুঝিতে হইবে।

লোকবসতির ধরন ও ইহার বৈশিষ্ট্য (Settlement Patterns and their associated Features)—প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানুষের কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বসতি-ঘনত্বে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া গতিশীল পৃথিবীতে লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং একস্থান হইতে মানুষ অন্যস্থানে যাতায়াত করিতেছে। ইহার ফলে বিভিন্ন স্থানের বসতি-ঘনত্ব পরিবর্তিত হইতেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বসতি-ঘনত্বের উপর ভিত্তি করিয়া পৃথিবীকে নিম্নলিখিত চারিটি **বসতি-ঘনত্ব অঞ্চলে (Density Zones)** বিভক্ত করা যায় :

(ক) **নিবিড়-বসতিযুক্ত অঞ্চল**—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ (চীন, ভারত, পূর্ব পাকিস্তান, জাপান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি), পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপ (বৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইটালি প্রভৃতি), রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাংশ এবং মিশরের নীলনদের উপত্যকা এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চল পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিযুক্ত অঞ্চল ; পৃথিবীর

মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ লোক এই অঞ্চলে বাস করে। প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে এখানকার লোকসংখ্যা ৫০ জনের বেশী।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে অধিক বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া কৃষিকার্যের উন্নতি হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতেই এই সকল দেশে বিশেষতঃ চীন ও ভারতে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং কৃষিকার্যের উন্নতি হইয়াছিল। ১৬০০ সালেও এই অঞ্চলে ৩৩ কোটি লোক বাস করিত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের প্রধান **বৈশিষ্ট্য** এই যে, এখানকার লোকবসতি প্রধানতঃ কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল। যে সকল স্থানে কৃষিকার্য অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেখানেই বসতি-ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার এবং চীনের ইয়াং-সি-কিয়াং ও সিকিয়াং নদীর উপত্যকার কৃষি অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশী লোক বাস করে। এখানকার কোন কোন অঞ্চলে জলসেচের সাহায্যে কৃষিকার্য হইয়া থাকে; ইহার ফলে লোকবসতি প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ৪০০ জন পর্যন্ত হয়। ইন্দোনেশিয়ার জাভা নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও উর্বর মৃত্তিকার সাহায্যে কৃষিকার্যের উন্নতি হওয়ায় লোকবসতি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। চীনের গড় লোকবসতি প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে প্রায় ৬০ জন; কিন্তু ইহার নদী-উপত্যকার কৃষি অঞ্চলের লোকবসতি প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে প্রায় ১২০০ জন। জাপানের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, ভগ্ন তটরেখা ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি এই দেশের নিবিড় লোকবসতির প্রধান কারণ।

পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ কৃষিকার্যে মোটামুটি উন্নতি লাভ করিলেও এই সকল দেশের সম্পদ-সৃষ্টির প্রধান উপায় শিল্পগঠন। স্থানাভাবে এই সকল দেশ শ্রমশিল্পের উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হইয়াছে। স্থানীয় খনিজ সম্পদ ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু এই বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। এই অঞ্চলের প্রধান **বৈশিষ্ট্য** শিল্পের উপর নির্ভরশীলতা এবং অতি-উৎপাদন কৃষি-ব্যবস্থার মাধ্যমে কম জমিতে অধিক শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত হওয়ায় বাণিজ্যেও এই সকল দেশ উন্নতি লাভ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষার উন্নতি, উপনিবেশসমূহ হইতে আনীত প্রচুর সম্পদ, এখানকার মানুষের কর্মদক্ষতা এই অঞ্চলের সম্পদ-বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। ফলে লোকবসতির ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে বৃটেনে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ২১৪ জন,

বেলজিয়ামে ২৮০ জন, জার্মানীতে ১৭০ জন, হল্যাণ্ডে ২৫৫ জন এবং ইটালিতে ১৪৪ জন লোক বাস করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাংশে ঘনলোকবসতি পরিলক্ষিত হয়। এই অঞ্চলের বসতি-ঘনত্বের প্রধান **বৈশিষ্ট্য** এই যে, ইহার পূর্বাংশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল অবস্থিত এবং পশ্চিমাংশে বিস্তীর্ণ কৃষি-বলয়সমূহ অবস্থিত। শিল্পাঞ্চলে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে প্রায় ২৩০ জন এবং কৃষি-অঞ্চলে প্রায় ১০০ জন লোক বাস করে। উৎকৃষ্ট নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, উর্বর মৃত্তিকা, পরিমিত বৃষ্টিপাত, অপর্যাপ্ত খনিজ সম্পদ, উৎকৃষ্ট বন্দর এই দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতিসাধনে সহায়তা করিয়াছে। উন্নত ধরনের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতি, স্থায়ী সরকার, অন্যদেশের উপর রাজনৈতিক প্রভাবও এই অঞ্চলের সম্পদ-বৃদ্ধিতে ও লোকবসতির ঘনত্ব-বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে।

রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি ও শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি হওয়ায় লোকবসতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। মিশরের নীলনদের উপত্যকায় কৃষিকার্য উন্নতি লাভ করায় এই অঞ্চলে ঘনলোকবসতি পরিলক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া পৃথিবীর বড় বড় শহরেও ঘন লোকবসতি বিদ্যমান।

(খ) **নাতিনিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল**—ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ, মালয়, পশ্চিম পাকিস্তান, পশ্চিম এশিয়ার মালভূমি (তুরস্ক, ইরাণ, ইরাক), আফ্রিকার উপকূল (ঘানা, নাইজেরিয়া, গিনি), দক্ষিণ আফ্রিকা, উত্তর আলজেরিয়া ও মরক্কো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাংশ, মধ্য আমেরিকা, ইউরোপীয় রাশিয়ার মধ্যাংশ ও পূর্বাংশে নাতিনিবিড় লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের অল্পাংশও এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল দেশে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ২১ হইতে ৫০ জন লোক বাস করে। এই অঞ্চলের দেশসমূহের **বৈশিষ্ট্য** এই যে, এখানকার অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী এবং কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনে ইহারা মোটামুটি স্বাবলম্বী। কোন কোন দেশ উদ্‌বৃত্ত কৃষিজ দ্রব্য রপ্তানিও করিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে খনিজ সম্পদ বিদ্যমান; ইউরোপের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন কোন অংশে শিল্পের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

(গ) **বিরল-বসতিযুক্ত অঞ্চল**—উত্তর আমেরিকার 'প্রেইরী', দক্ষিণ আমেরিকার 'পম্পাস্', রাশিয়ার 'স্টেপ্‌স্', অস্ট্রেলিয়ার 'ডাউন্‌স্' এবং দক্ষিণ

আফ্রিকার 'ভেল্ড্' তৃণভূমি, আফ্রিকার স্যাভানা অঞ্চল ইহার অন্তর্গত। ইহার প্রধান **বৈশিষ্ট্য** এই যে, এখানকার অধিকাংশ লোক তৃণভূমিতে পশুচারণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। কোন কোন অঞ্চলে তৃণভূমি পরিষ্কার করিয়া কৃষিকার্যও হইয়া থাকে। বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে অল্প লোক অধিকসংখ্যক পশু পালন করিতে পারে। সেইজন্য এখানে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে মাত্র ১ হইতে ২০ জন লোক বাস করে।

(ঘ) **প্রায়-জনহীন অঞ্চল**—এই অঞ্চলের অন্তর্গত স্থানসমূহে লোক-বসতি প্রায় নাই বলিলেই চলে। যে সকল স্থানে কিছু কিছু লোক আছে, সেখানেও প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে লোকবসতি ১ জনেরও কম। শীতল মেরু অঞ্চল, বিভিন্ন মরুভূমি ও পার্বত্য ভূমি এবং নিরক্ষীয় বনভূমি, ইন্দোনেশিয়ার কালিমান্তান (বোর্ণিও), নিউগিনি দ্বীপ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। উত্তর আমেরিকা ও উত্তর ইউরোপের তুন্দ্রা অঞ্চলেও কদাচিৎ কোন লোক দেখা যায়। অত্যধিক শীতের প্রকোপে তুন্দ্রা অঞ্চলে কোন গাছপালা হয় না এবং বল্গা হরিণ ও মৎস্য ভিন্ন খাদ্যের অন্য কোন বন্দোবস্ত নাই। মরু অঞ্চলের মধ্যে আফ্রিকার সাহারা ও কালাহারি, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা, এশিয়ার আরব, তুর্কিস্তান ও গোবি মরুভূমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মরুভূমিতে জলের অভাব, চরম জলবায়ু এবং ধূসর বালুকাময় বা বন্ধুর ভূ-প্রকৃতির জন্য বাস করা কঠিন। নিরক্ষীয় অঞ্চলের অত্যধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে গভীর অরণ্যের সৃষ্টি হয়; এখানকার জমি স্যাঁৎসেঁতে হওয়ায় জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। কঙ্গো-উপত্যকায় লোকবসতি সম্ভব হইলেও আমাজন-উপত্যকায় লোকবসতি প্রায় নাই বলিলেই চলে। অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু এবং নানাপ্রকার বিষাক্ত কীটপতঙ্গ ও সরীসৃপের উপদ্রবের জন্য ইন্দোনেশিয়ার নিউগিনি ও কালিমান্তান দ্বীপে লোকবসতি অত্যন্ত কম। বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চলে কৃষিকার্যের অসুবিধা হয় বলিয়া এবং পরিবহণ-ব্যবস্থার অভাবে বসতিস্থাপন করা কঠিন; এইজন্য ভারতের হিমালয় পর্বত, চীনের তিব্বত, উত্তর আমেরিকার রকি পর্বত, দক্ষিণ আমেরিকার আণ্ডিজ পর্বত আয়তনের তুলনায় প্রায় জনমানবশূন্য।

লোকবসতি-ঘনত্বের তারতম্যের কারণ (Factors of Density of Population)—পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বসতি-ঘনত্বের তারতম্য সম্বন্ধে

প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ
১ জনের কম
১—২০ জন
২১—৫০ জন
৫০ জনের বেশী
পৃথিবী
লোকবসতি
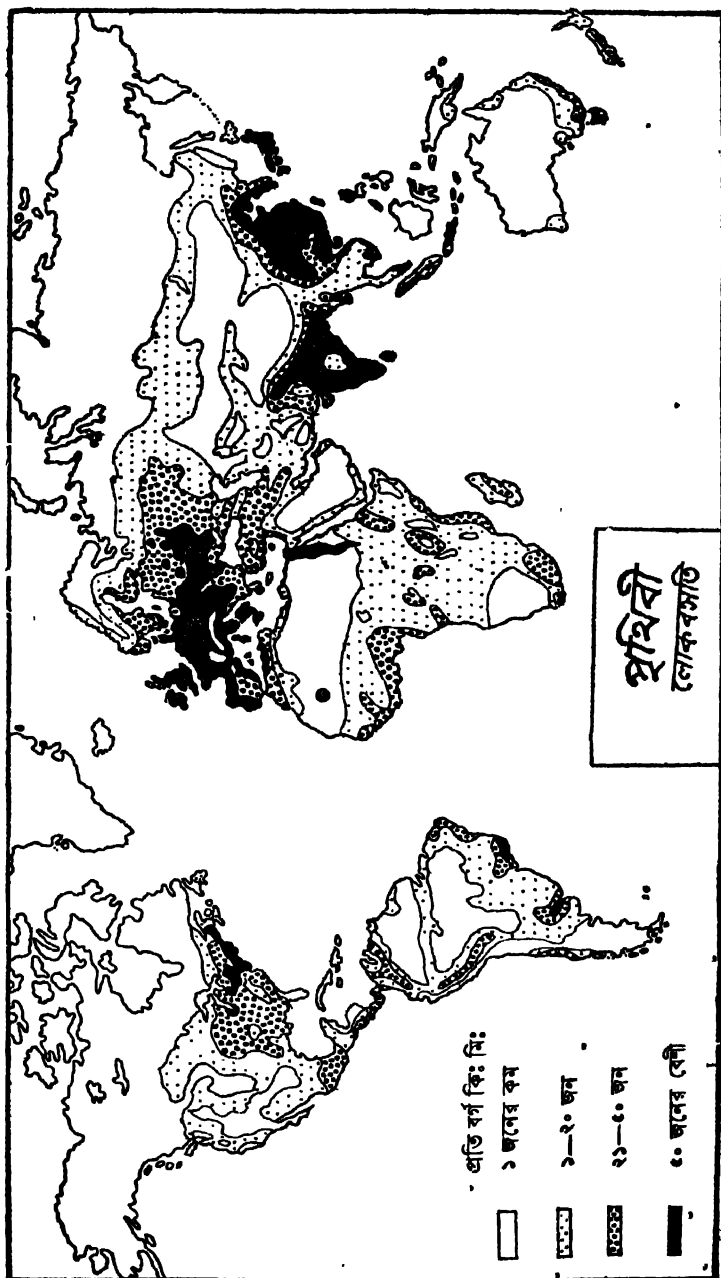
উপরে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের জন্য এই তারতম্য হইয়া থাকে।

(ক) **প্রাকৃতিক পরিবেশ**—প্রাকৃতিক পরিবেশ লোকবসতি-ঘনত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে। **জলবায়ুর** উপর মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভরশীল। বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার উপর কৃষিকার্য, মানুষের কর্মক্ষমতা, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি নির্ভর করে। কৃষিকার্য হইতে মানুষের অন্ন ও বস্ত্রের সংস্থান হইয়া থাকে। সুতরাং যে অঞ্চলে কৃষিকার্য উন্নতি লাভ করে সেখানে লোকবসতি বেশী হয়। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু মানুষের কর্মক্ষমতা-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ইহাতে শিল্পের উন্নতি হয় ও লোকবসতি বৃদ্ধি পায়। **ভূ-প্রকৃতি** সমতল হইলে কৃষিকার্যের উন্নতি হয় এবং লোকবসতি বৃদ্ধি পায়। পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রসার সমতলভূমিতেই সম্ভব। পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিকূল ভূ-প্রকৃতির জন্য ও কৃষিকার্যের অভাবে লোকবসতির ঘনত্ব বেশী হইতে পারে না। **মৃত্তিকা** উর্বর হইলে কৃষিকার্যের উন্নতি হয় ও লোকবসতি বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন দেশের শিল্পোন্নতির মূলে রহিয়াছে **খনিজ সম্পদ**। শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে লোকবসতি বৃদ্ধি পায়। খনিজ সম্পদের লোভে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মরু অঞ্চলেও মানুষ ছুটিয়া গিয়াছে।

(খ) **অর্থনৈতিক পরিবেশ**—কোনও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইলে, সেই দেশে লোকবসতির ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে বিভিন্ন কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির উপর। কৃষি-কার্যের উপর বসতি-ঘনত্বের নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে দেশের কাঁচামাল সংগ্রহের, মানুষের কর্মক্ষমতার ও বাজারের উপর কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতার উপর। সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহে বসতি-ঘনত্বের কারণ শুধু স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ নহে, উপনিবেশসমূহের অনুকূল পরিবেশও এই সকল দেশের লোকসংখ্যা-বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে (৫০পৃষ্ঠা)। ভারতের তূলা ও লৌহের সাহায্যে বৃটেনের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল। কঙ্গোর খনিজ সম্পদের সাহায্যে বেলজিয়ামের শিল্পের উন্নতি হইয়াছিল। বাণিজ্যের উন্নতি হইলেও লোকবসতি বৃদ্ধি পায়। বৃটেন পূর্বে সমগ্র জগতের বাণিজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিত বলিয়া ক্ষুদ্র আয়তনেও ঐ দেশে বহুলোক বাস করিতে সক্ষম হইয়াছে। বিদেশে নিয়োজিত মূলধন হইতে কোন কোন দেশের বাৎসরিক আয়

হইয়া থাকে। ব্যাঙ্কিং, জাহাজ, বীমা প্রভৃতি ব্যবসায় হইতেও বিদেশ হইতে অর্থ আমদানি করা সম্ভব। এইভাবে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো শক্ত করিতে পারিলে লোকবসতি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; বৃটেন ইহার জলন্ত উদাহরণ।

(গ) **সামাজিক পরিবেশ**—সমাজের বিভিন্ন সংস্কারের জন্য লোকসংখ্যা হ্রাস ও বৃদ্ধি পায়। হিন্দু ও বৌদ্ধ **ধর্মে** পুত্র দ্বারা পিতামাতার পরলোকের কার্যাদি করিবার সংস্কার প্রচলিত থাকায় চীনা ও ভারতীয়গণের পুত্রসন্তানের আকাঙ্ক্ষা গভীর। **রাজনৈতিক** কারণেও জন্মহার বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে হিটলার সৈন্যের প্রয়োজনে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য জার্মানীর সকল পিতামাতাকে অধিক হারে সন্তান-উৎপাদনের আদেশ দিয়াছিল। মানুষের **সাংস্কৃতিক** মান উন্নয়নের ফলেও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়; শিক্ষার উন্নতি-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী আবিষ্কারের সাহায্যে মানুষ নূতন নূতন জিনিস সৃষ্টি করে। ফলে অধিকতর সম্পদের সৃষ্টি হয় এবং লোকবসতি বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, শিল্পবিপ্লবের পরে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার হইয়াছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। বিভিন্ন দেশের **সরকারের কর্মকুশলতা** লোকসংখ্যা-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কোন কোন দেশের সরকার সম্পদের অভাবে পরিবার-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা কার্যকরী করে; ফলে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার কমিয়া যায়। পৃথিবীর কোন কোন দেশ পরিবার-পরিকল্পনায় বিশ্বাসী নহে। তাহারা খাদ্যোৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করে, লোকসংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য নহে। এই সকল দেশে স্বভাবতঃই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সরকারের কর্মকুশলতায় খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে মৃত্যুর হার কমিয়া যায়; ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। চীনদেশে বিপ্লবের সাফল্যের সময় (১৯৪৯ সাল) লোকসংখ্যা ছিল ৪৬ কোটি। ১৯৫৯ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৬৭ কোটিতে। ১১ বৎসরে এই দেশে ২১ কোটি লোক বাড়িয়াছে।* কারণ এই দেশ খাদ্যে স্বাবলম্বী এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য মৃত্যুর হার অনেক কম।

আয়তনযুক্ত, বসতিযুক্ত ও শিল্পোন্নত পৃথিবী (The Three Worlds of Space, People and Industry)—পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে

বিভিন্ন রকমের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন স্থান শুধু পৃথিবীর আয়তন-বৃদ্ধির জন্য শোভা পাইতেছে; এই সকল স্থান মানুষের কোনও প্রয়োজনে আসে না। কানাডার উত্তরাংশ, সাইবেরিয়ার উত্তরাংশ, অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ স্থান, আমাজন-উপত্যকা প্রভৃতি এখনও মানুষের বসবাসের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। অবশ্য পৃথিবীর মোট আয়তনের বহু অংশ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হইয়াছে। স্থলভাগের সমগ্র অংশকে **আয়তনযুক্ত পৃথিবী** বলা যায়।

পৃথিবীর স্থলভাগের যে অংশে মানুষ বসবাস করে, সেই অংশকে **বসতিযুক্ত পৃথিবী** বলা হয়। বসতিযুক্ত পৃথিবীতে জনহীন অঞ্চল বাদ যাইবে। যে সকল স্থানে মানুষ বসবাস করিয়া সেখানকার সম্পদ আহরণ করিতে পারে, পৃথিবীর স্থলভাগের সেই অংশ সর্বাপেক্ষা বেশী কার্যকরী। বসতিযুক্ত অঞ্চলের মানুষ কৃষিকার্য, খনিজ সম্পদ-আহরণ, শিল্পগঠন, বাণিজ্য প্রভৃতির সাহায্যে জীবন ধারণ করে। কোনস্থান কৃষিসমৃদ্ধ, কোনস্থান খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ, আর কোনস্থান শিল্পে সমৃদ্ধ।

পৃথিবীর স্থলভাগের যে অংশের মানুষ প্রধানতঃ শিল্পের উপর নির্ভরশীল, সেই অংশকে **শিল্পোন্নত পৃথিবী** বলা যায়। পৃথিবীর সকল স্থানে শিল্প-স্থাপন সম্ভব নহে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর শিল্পের উন্নতি নির্ভরশীল। পৃথিবীর অতি অল্প অংশই শিল্পোন্নত পৃথিবীর আওতায় আসিবে। সাধারণতঃ ইস্পাতকে শিল্পোন্নতির মাপকাঠি হিসাবে ধরা হইয়া থাকে। সুতরাং যে সকল দেশ প্রধানতঃ ইস্পাত-উৎপাদনে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, মোটামুটি সেই সকল দেশ শিল্পোন্নত পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডার দক্ষিণ-পূর্বাংশ, ইউরোপের দেশসমূহ, জাপান, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশ শিল্পোন্নত পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত।

এইভাবে তিন প্রকারের পৃথিবীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জমির পরিমাণ, লোকবসতি ও শিল্পোন্নতির বণ্টন অত্যন্ত অসমান।

আধুনিক লোকবসতির গতি-প্রকৃতি (Modern Demographic Pattern)—পৃথিবীর লোকবসতির ঘনত্ব, লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির কারণ সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে হইলে লোকসংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। জন্ম ও মৃত্যুর হার এবং সম্পদের উৎপাদন-সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্যের সাহায্যে

পৃথিবীর লোকবসতি সম্বন্ধে নানাবিধ সিদ্ধান্তে আসিতে হয়। পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। মৃত্যু অপেক্ষা জন্মের হার মোটামুটি বেশী হইয়াছে। ১৬৫০ সালে পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যা ছিল ৫৪'৫ কোটি; ১৯৬০ সালে লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৯৭ কোটিতে।

পৃথিবীর লোকসংখ্যার গতি-প্রকৃতি (কোটি)

মহাদেশ	১৬৫০	১৭৫০	১৮০০	১৯০০	১৯৫০	১৯৬০
উত্তর আমেরিকা	'১	'১	'৬	৮'১	২১'৫	২৪
দক্ষিণ আমেরিকা	১'২	১'১	১'৯	৬'৩	১১	১৪
ইউরোপ	১০	১৪	১৯	৪০	৫৫	৬০
এশিয়া	৩৩	৪৮	৬০	৯৪	১৩২	১৭৩'৭
আফ্রিকা	১০	৯'৫	৯	১২	২০	২৪
ওশিয়ানিয়া	'২	'২	'২	'৬	১'২	১'৩
পৃথিবী	৫৪'৫	৭২'৯	৯০'৭	১৬১	২৪০'৭	২৯৭

শিল্পবিপ্লবের পূর্বে কৃষিকার্য ও পশুপালনের উপর মানুষ অধিকতর নির্ভরশীল ছিল। সেই সময় জন্ম ও মৃত্যু উভয়ের হার ছিল অত্যন্ত বেশী; **জন্মের হার** ছিল হাজারে ৪০ জন এবং **মৃত্যুর হার** ছিল হাজারে ৩৫ জন। জন্ম ও মৃত্যুর হারে বিশেষ পার্থক্য না থাকায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইত না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতি না হওয়ায় এবং জনস্বাস্থ্যরক্ষার ভালো ব্যবস্থা না থাকায় মৃত্যুর হার ছিল বেশী। অধিকাংশ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই অথবা কর্মক্ষম হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইত। ইহার ফলে শিশুকে লালনপালনের জন্য যে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় হইত তাহা সমাজের কল্যাণে লাগিত না; কারণ শিশু বড় হইয়া সম্পদ-উৎপাদনে সাহায্য করিতে পারিত না। সেই সময় জীবনধারণের জন্য অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইত বলিয়াও মানুষের আয়ু অল্প হইত। ইহা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর ছিল।

শিল্পবিপ্লবের পর লোকসংখ্যাতত্ত্বের ধরন পাল্টাইয়া যায়; এই সময় মানুষ 'উদ্ভিদ-সভ্যতা' (Vegetable civilization) হইতে যান্ত্রিক সভ্যতায় পদার্পণ করে। যন্ত্রের সাহায্যে অল্প পরিশ্রমে মানুষ দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে শিখে। ইহার ফলে মানুষের আয়ু ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বিভিন্ন ঔষধপত্রের আবিষ্কার হওয়ায় মানুষের মৃত্যুর হার অনেক কমিয়া যায়। অন্যদিকে আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার আওতায় আসিয়া জন্মের হারও কমিতে থাকে। শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পরিবার-পরিকল্পনার কথা চিন্তা করিতে শিখে। মৃত্যুর হার কমিয়া যাওয়ায় শিশুদের লালন-পালন করিবার জন্য যে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে, শিশু বড় হইয়া তাহার উৎপাদন-ক্ষমতা দ্বারা সমাজের সেই ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। ইহার ফলে উৎপাদনক্ষম শ্রমিকের সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উদ্‌বৃত্ত শ্রমিকের সাহায্যে শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। যে সকল দেশ তাহাদের শ্রমশক্তিকে শুধু কৃষিকার্যে নিয়োজিত করিয়া রাখে, তাহাদের উন্নতি হওয়া কষ্টসাধ্য; কিন্তু যে সকল দেশ শ্রমশক্তির কিয়দংশকে কৃষিকার্য হইতে সরাইয়া খনিজ সম্পদ-আহরণে ও শিল্পে নিয়োজিত করিতে পারে, সেই দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ার অধিকাংশ লোক কৃষিকার্যে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমান সমাজতান্ত্রিক শাসনে কৃষিকার্যে যন্ত্রপাতি নিযুক্ত হওয়ায় কৃষিক্ষেত্র হইতে বহু শ্রমিককে সরাইয়া খনিতে ও শিল্পে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ফলে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। এইভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা হইলে, মানুষ সমস্ত উৎপাদনকার্য বজায় রাখিয়াও অবসর বিনোদনের জন্য প্রচুর সময় পায়; ইহাতে মানুষের সাংস্কৃতিক মান উন্নত হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিক্ষার মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সম্পদ-বৃদ্ধির সম্ভাবনা আরও বাড়িয়া যায়, সৎ ও বলিষ্ঠ সরকার-গঠন সম্ভবপর হয়।

শিল্পবিপ্লবের পর হইতে বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের ফলে ক্রমশঃ **জন্ম এবং মৃত্যু উভয়ের হার কমিয়া যাইতেছে**; কিন্তু যে হারে জন্মের হার কমিয়াছে, ইহার তুলনায় মৃত্যুর হার কমিয়াছে অনেক বেশী। ইহার ফলে লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাই আধুনিক লোকসংখ্যাতত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পৃথিবীতে বর্তমানে যে হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহাতে অনেকেই আতঙ্কিত হইতেছেন। বিংশ শতাব্দীতে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির গড় হার ৯% হইলেও বিভিন্ন মহাদেশে ইহার হার বিভিন্ন রকমের; উত্তর আমেরিকায় বৃদ্ধির হার শতকরা ১.৯, ইউরোরে ১.১, মধ্য আমেরিকায় ২.৭, ওশিয়ানিয়ায়

২'১, আফ্রিকায় '৮ এবং এশিয়ায় '৬ জন। কোন কোন লোকসংখ্যাতত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে, এই হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ১৯৭৫ সালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা হইবে ৩৪১ কোটি এবং ২০০০ সালে ৪৯৪ কোটি। অবশ্য এই হিসাবের সঙ্গে সকল লোকসংখ্যাতত্ত্ববিদ্ একমত নহেন। জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার সর্বদাই কমবেশী হওয়া স্বাভাবিক। মানুষের প্রজনন-ক্ষমতার হার, সম্পদ-উৎপাদনের গতি, যুদ্ধ, মহামারী, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতি প্রভৃতির উপর ভবিষ্যৎ বংশধরগণের সংখ্যা নির্ভর করে।

আদর্শ লোকবসতি ও বসতি-ঘনত্ব (Optimum Population and Population Density)—কোন দেশের লোকসংখ্যা যদি সেই দেশের 'কার্যকরী' জমির অনুপাতে গড়িয়া ওঠে, তাহাকেই আদর্শ লোকবসতি (Optimum population) বলা যায়। কার্যকরী জমি সম্বন্ধে ৪৯ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। যতক্ষণ কোন দেশের উৎপন্ন সম্পদের দ্বারা দেশের মানুষের ভোগসুখের বন্দোবস্ত করা যায়, ততক্ষণ সেই দেশে আদর্শ লোকবসতি বিদ্যমান থাকিবে ; কিন্তু যদি কোন দেশে সম্পদ-সৃষ্টির পরিমাণ লোকসংখ্যার অনুপাতে কম হয়, তাহা হইলে সেই দেশের বসতি-ঘনত্ব অত্যন্ত বেশী বলিতে হইবে। আবার যদি সম্পদের তুলনায় লোকসংখ্যা কম থাকে এবং শ্রমিকের অভাবে সম্পদ-সৃষ্টির ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে সেই দেশের বসতি-ঘনত্ব অত্যন্ত কম বলিতে হইবে। অনেক লোকসংখ্যাতত্ত্ববিদ্ মনে করেন চীনে লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী। কিন্তু বিপ্লবের পর সম্পদের উৎপাদন ঐ দেশে এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সেখানকার মানুষ স্থানীয় সম্পদের সাহায্যে সুখে বাস করিতেছে। সেইদিক হইতে বিচার করিলে চীনে অত্যধিক লোকবসতি আছে বলিয়া বিবেচনা করা যায় না।

সম্পদের উৎপাদন নির্ভর করে প্রধানতঃ প্রাকৃতিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও মানুষের কর্মক্ষমতার উপর। এই তিনটি পরিবেশের পারস্পরিক মিলন সম্ভব হইলে সম্পদ-সৃষ্টি সার্থক হইয়া থাকে। সকল দেশে ইহার অনুপাত সমান নহে। কোথাও প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও মানুষের কর্মক্ষমতার অভাবে তাহাকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা সম্ভব হয় নাই। কোথাও প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবে মানুষ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। সম্পদ উৎপাদনের এই ত্রয়ী পরিবেশের কার্যকারিতার সঙ্গে লোকবসতির মিল থাকা প্রয়োজন। এই ত্রয়ী পরিবেশের সঙ্গে লোকবসতির অনুপাত

ঠিক না থাকিলেই বসতি-ঘনত্বের আধিক্য বা অল্পতা হেতু বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থা লোকবসতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। শিল্পবিপ্লবের পর হইতেই যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও শক্তিসম্পদ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করিতেছে। ইহা ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের অর্থনীতি উপনিবেশের অর্থনীতির সহিত যুক্ত হইয়াছে। উপনিবেশ হইতে শোষিত সম্পদ এই সকল দেশের সম্পদ-বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। ইহা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন প্রভৃতি দেশ-বিদেশে পুঁজি নিয়োগ করিয়া প্রভুত সুদ ও লাভ বিদেশ হইতে আনিয়া থাকে। ইহাও দেশের সম্পদ-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় মানুষ সর্বদাই একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইয়া বসবাস করে। সুতরাং বর্তমান যুগে কোন দেশের বসতি-ঘনত্ব অধিক বা অল্প ইহা নির্ধারণ করিতে হইলে স্থানীয় শক্তিসম্পদ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার, বিদেশ হইতে আনীত সম্পদ, পুঁজি হইতে আহৃত লাভ এবং বসবাসের স্থান-পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয় বিচার করিতে হইবে।

গতিশীল পৃথিবীতে লোকসংখ্যাও সর্বদাই কমবেশী হওয়া স্বাভাবিক। আজ যে সকল দেশে আদর্শ লোকবসতি বিদ্যমান, জন্ম-মৃত্যুর হার এবং সম্পদের উৎপাদন কমবেশী হওয়ায় কিছুদিন পরে বসতি-ঘনত্ব অত্যন্ত বেশী বা কম হইতে পারে। লোকবসতির গতি কখন কোন্‌দিকে মোড় ফিরিবে তাহা নিশ্চয় করিয়া কেহই বলিতে পারে না।

প্রশ্নাবলী

1. **Describe the present-day settlement patterns and explain the principal features associated with the settlement.**

উঃ—'লোকবসতির ধরন ও ইহার বৈশিষ্ট্য' (৫১ পৃঃ—৫৪ পৃঃ) লিখ।

2. **What are the reasons for wide variations in population density in different parts of the world ?**

উঃ—'লোকবসতি-ঘনত্বের তারতম্যের কারণ' (৫৪ পৃঃ—৫৭ পৃঃ) লিখ।

3. "Nearly two-thirds of the human population are concentrated in about one-tenth of the land surface."—Describe and account for this peculiar distribution.

উঃ—'নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল' (৫১ পৃঃ—৫৩ পৃঃ) এবং 'লোকবসতি-ঘনত্বের তারতম্যের কারণ' (৫৪ পৃঃ—৫৭ পৃঃ) লিখ।

4. Describe briefly the modern demographic pattern of the world.

উঃ—'আধুনিক লোকবসতির গতি-প্রকৃতি' (৫৮ পৃঃ— ৬১পৃঃ) লিখ।

5. What do you mean by Optimum population ? How should you judge the population density of a country and decide whether it has an Optimum population or not ?

উঃ—'আদর্শ লোকবসতি ও বসতি-ঘনত্ব' (৬১ পৃঃ—৬২ পৃঃ) লিখ।

6. Explain fully the concept of *man-land ratio* and indicate how far population optima can be explained in terms of ideal man-land ratios.

উঃ—'মানুষ ও জমির অনুপাত এবং লোকবসতি ঘনত্ব' (৪৯ পৃঃ—৫১ পৃঃ) এবং 'আদর্শ লোকবসতি' ও বসতি-ঘনত্ব' (৬১ পৃঃ—৬২ পৃঃ) লিখ।

7. What do you understand by Man-Land ratio ? How does it differ from population density ?

উঃ—'মানুষ ও জমির অনুপাত এবং লোকবসতি-ঘনত্ব' (৪৯ পৃঃ—৫১ পৃঃ) লিখ।

8. Define optimum population. Discuss the factors which determine this with specific examples.

উ ঃ—'আদর্শ লোকবসতি ও বসতি-ঘনত্ব' (৬১ পৃঃ— ৬২ পৃঃ) এবং 'লোকবসতি-ঘনত্বের তারতম্যের কারণ' (৫৪ পৃঃ—৫৭ পৃঃ) লিখ।

পঞ্চম অধ্যায়

সাংস্কৃতিক সম্পদ
(Cultural Resources)

মানুষের অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভাব হয় প্রাকৃতিক সম্পদের ; তারপর আসে মানুষ। প্রথমে মানুষের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক সম্পদকে নিয়োজিত করা হইল। বন্যপশু, মৎস্য, ও ফলমূল ছিল মানুষের বাঁচিবার প্রধান সহায়। পরবর্তী কালেও বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষ স্বীয় বুদ্ধিবলে আহরণ করিতে শিখিল ; তন্মধ্যে খনিজ সম্পদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতি সর্বদা মানুষের অনুকূলে ছিল না ; কিন্তু মানুষ বাঁচিবার তাগিদে ক্রমশঃ প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিজের বুদ্ধিবলে কিয়দংশ আয়ত্তে আনিয়া নিজের প্রয়োজনে নিয়োজিত করিল। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে মানুষ আয়ত্ত করিল বিভিন্ন কলাবিদ্যা, আবিষ্কার করিল বিজ্ঞানের অমোঘ অস্ত্র। কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করা হইল প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনিয়া মানুষের কল্যাণ-সাধনে। অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ আরও অনেক কলাকৌশল আয়ত্ত করিল প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য। ক্রমে ক্রমে সভ্যতা গড়িয়া উঠিল, ভাষার আবিষ্কার হইল, মানুষের পশুপ্রবৃত্তি সংযত হইল, সমাজের সৃষ্টি হইল এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা হইল।

এইভাবে মানুষের সংস্কৃতির সৃষ্টি হইল। বর্তমানে **সংস্কৃতি (Culture)** বলিতে আমরা বুঝি শিক্ষা, কলা ও বিজ্ঞানের উন্নতি, ধর্মের প্রসার, সভ্য ব্যবহার, অভিজ্ঞতার দরুন লব্ধ জ্ঞান, মানুষের আদিম প্রবৃত্তির সংযম, যুদ্ধের পরিবর্তে সহযোগিতা, বন্য আইনের পরিবর্তে ন্যায়বিচার ও সমাজশৃঙ্খলার প্রবর্তন।* মানুষই পৃথিবীর একমাত্র প্রাণী যে সংস্কৃতির সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে। মানুষের এই সংস্কৃতি সর্বদাই তাহার কল্যাণ-সাধনে নিয়োজিত হইয়াছে।

"Calture means education, learning, experience, religion, civilized behaviour, suppression of vicious animal instincts, co-operation replacing conflict, the law of fair play and justice suppressing the law of the jungle."
—*E. W. Zimmermann*

এই সংস্কৃতির বলে মানুষ বাস করিতেছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে—তুন্দ্রাঞ্চলে, নিরক্ষীয় অঞ্চলে ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে। অবশ্য মানুষ বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈসাদৃশ্য এখনও এক করিতে পারে নাই; কিন্তু প্রকৃতিকে কিছুটা আয়ত্তে আনিয়া বা নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ বসবাস করিতেছে। প্রকৃতির প্রভাব এখনও বহুলাংশে মানুষের বসতিস্থাপনের উপর বিদ্যমান; কারণ গৃহাদিতে তাপ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইলেও এখনও অধিকাংশ মানুষ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের স্বাভাবিক উৎকৃষ্ট জলবায়ুতেই থাকিতে ভালবাসে।

সংস্কৃতি—মানুষ ও প্রকৃতির যুগ্ম সৃষ্টি (Culture, a Joint Product of Man and Nature)—পৃথিবীতে প্রথম সৃষ্টি হয় প্রকৃতির; তারপর আসে মানুষ। প্রকৃতি ও মানুষের যুগ্ম প্রচেষ্টার ফলেই সৃষ্টি হইয়াছে সংস্কৃতি। প্রকৃতির সাহায্য ছাড়া মানুষ কখনই তাহার সংস্কৃতির মান উন্নয়ন করিতে পারিত না। প্রকৃতির 'সাহায্য', 'উপদেশ' ও 'সম্মতি' নিয়াই মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে তাহার সংস্কৃতি; প্রকৃতি হইতে সংগৃহীত সম্পদ এবং প্রাকৃতিক শক্তির সহিত মানুষের বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার যোগাযোগের ফলেই সৃষ্টি হইয়াছে সংস্কৃতি। প্রকৃতির দান ভূমি হইতে মানুষের বুদ্ধিবলে উৎপন্ন হইয়াছে গম, ধান প্রভৃতি খাদ্যশস্য; প্রকৃতির দান কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ হইতে মানুষ তাহার বুদ্ধির সাহায্যে আবিষ্কার করিয়াছে শক্তি ও নানাবিধ উপজাত দ্রব্য। প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকিলে মানুষ তাহার বুদ্ধি-বিকাশের সুযোগ পাইত না। এইভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানুষের কর্মক্ষমতায় সৃষ্টি হইয়াছে কলা ও বিজ্ঞান; ইহার সাহায্যে গড়িয়া উঠিয়াছে মানুষের সংস্কৃতি। সুতরাং প্রকৃতি ও মানুষের যুগ্ম প্রচেষ্টায় সংস্কৃতি জন্মলাভ করিয়াছে।

প্রকৃতি মানুষের সাংস্কৃতিক মান-উন্নয়নের **সীমা** নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। মানুষ কম পরিশ্রমে ও ব্যয়ে চায় সর্বাপেক্ষা বেশী সম্পদ, উৎপাদন ও ভোগ। প্রকৃতির সাহায্যেই তাহাকে সম্পদ উৎপন্ন করিয়া মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করিতে হয়। সুতরাং মানুষ কখনই সরাসরি প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে না। প্রকৃতি যেখানে মানুষকে বাধা দেয়, সেখানে মানুষ সরাসরি প্রকৃতির সহিত সংঘর্ষে না আসিয়া ইহার পাশ কাটাইবার চেষ্টা করে। প্রকৃতির 'উপদেশ ও সম্মতি' নিয়াই মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ইউরোপীয়গণ প্রচুর আলু খায়, উত্তর আমেরিকার লোকেরা ভুট্টা-খাদক পশুর মাংস খায়, এশিয়াবাসী মানুষ চাউল খায়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ইউরোপের জলবায়ু আলুচাষের উপযোগী, উত্তর আমেরিকার জলবায়ু ভুট্টাচাষের উপযোগী এবং এশিয়ার মৌসুমী অঞ্চল ধানচাষের উপযোগী। মানুষ কম পরিশ্রমে এই সকল খাদ্যদ্রব্য উপরে বর্ণিত স্থানসমূহে উৎপন্ন করিতে পারে বলিয়াই তাহারা এই খাদ্যে অভ্যস্ত হইয়াছে। প্রকৃতি মানুষকে পথ দেখাইয়া দেয়, কিভাবে চলিলে সে কম আয়াসে বেশী সম্পদ উৎপন্ন করিতে পারিবে। সেইজন্য প্রকৃতি মানুষকে কখনই উত্তর মেরুতে বা সাহারা মরুভূমিতে বসবাস করিতে উপদেশ দেয় না। এইভাবে প্রকৃতির সাহায্যে মানুষ তাহার সাংস্কৃতিক মান-উন্নয়নের কার্যে সফলতা অর্জন করিয়াছে।

অনেকসময় মানুষের সংস্কৃতি প্রাকৃতিক সম্পদকে **অনুকরণ** করিয়া নূতন নূতন সম্পদ সৃষ্টি করে। রেশমের কাপড় প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু সাংস্কৃতিক উন্নতির ফলে মানুষ রেশমকে অনুকরণ করিয়া রেয়ন সৃষ্টি করিয়াছে। কয়লা ও খনিজ তৈল হইতে শক্তি উৎসারিত হয়। মানুষের সংস্কৃতি পারমাণবিক শক্তির সৃষ্টি করিয়া প্রাকৃতিক সম্পদ কয়লা ও খনিজ তৈল হইতে অধিকতর শক্তিশালী শক্তিসম্পদ সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রকৃতি সম্পদ-উৎপাদনে বিভিন্ন বাধা সৃষ্টি করায় মানুষ তাহার সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন করিয়া এইসব বাধা অতিক্রম করিয়াছে। সুতরাং পরোক্ষভাবে **প্রাকৃতিক বাধা-বিঘ্ন** মানুষের সংস্কৃতিকে উন্নত করিয়াছে। প্রাকৃতিক সম্পদ অনেকসময় যথাস্থানে, যথাসময়ে এবং যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর অধিকাংশ পশম উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশমবয়ন-শিল্পে নিয়োজিত হইলেও, প্রকৃতি বহুদূরে দক্ষিণ গোলার্ধের দেশ-সমূহে (অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা) অধিক পশম-উৎপাদনে সাহায্য করে। রবার প্রধানতঃ উৎপন্ন হয় মালয় ও ইন্দোনেশিয়ায়; কিন্তু ইহা ব্যবহৃত হয় প্রধানতঃ সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের মোটর-গাড়ী-নির্মাণ-শিল্পে। এইভাবে দেখা যায় প্রকৃতি সকল জিনিস যথাস্থানে উৎপন্ন করে না। প্রকৃতির এই **স্থানগত ত্রুটি** সংশোধনের জন্য মানুষকে রেলগাড়ী, মোটর-গাড়ী, জাহাজ, বিমানপোত ইত্যাদি বিভিন্ন যানবাহন, হিমায়নযন্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। খাদ্য প্রতিদিন মানুষের প্রয়োজনে লাগে।

একদিনে মানুষ পৃথিবীর সকল খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন খাদ্যশস্য প্রতিদিন উৎপন্ন করা যায় না বলিয়া খাদ্যশস্য মজুত করিয়া প্রতিদিন মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে হয়। প্রকৃতির এই **সময়গত ত্রুটি** সংশোধনের জন্য মানুষকে আবিষ্কার করিতে হইয়াছে গুদামঘর, হিমশীতল ঘর এবং আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের। প্রাচীনকালে সম্পদের পরিমাণ ছিল অতি অল্প। ইহার পরিমাণ-বৃদ্ধির জন্য মানুষকে বিভিন্ন পন্থা আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। পূর্বে গরু হইতে যে দুগ্ধ পাওয়া যাইত, তাহা শুধু বাছুরের প্রয়োজন মিটাইত। ক্রমশঃ মানুষের সংস্কৃতিকে নিয়োজিত করিতে হইয়াছে দুগ্ধের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য। কৃষিকার্যের মারফত পুষ্টিকর পশুখাদ্য উৎপন্ন করিয়া, তৃণভূমিকে পশুপালনের জন্য নিয়োজিত করিয়া, মিশ্র প্রজননের সাহায্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গরু সৃষ্টি করিয়া মানুষ বর্তমানে গরু হইতে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ সংগ্রহ করে। এইভাবে প্রকৃতির **পরিমাণগত ত্রুটি** মানুষ সংশোধন করিয়াছে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক **দুর্যোগ** মানুষের সংস্কৃতির উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। ঝড়-ঝঞ্ঝা হইতে জাহাজ ও বিমানকে রক্ষা করিবার জন্য মানুষকে আবিষ্কার করিতে হইয়াছে বেতারের মারফত যোগাযোগ-ব্যবস্থার। এইভাবে দেখা যায় প্রকৃতি বিভিন্ন বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া মানুষকে বিভিন্ন আবিষ্কারের মারফত সাংস্কৃতিক মান-উন্নয়নে সাহায্য করিয়াছে। মানুষের বুদ্ধিবলে এইসব আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃতি ও মানুষের যুগ্ম প্রচেষ্টার ফলেই সংস্কৃতির সৃষ্টি হইয়াছে।

সংস্কৃতি ও যান্ত্রিক যুগ (Culture and the 'Machine')—বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার সৃষ্টি হয় প্রধানতঃ শিল্পবিপ্লবের সময় হইতে। ইহার পূর্বে মানুষের সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের; সেই সময় মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে হাত মিলাইয়া চলিত। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিবার মতো সাহস মানুষের ছিল না। সেই সময় মানুষ সাধারণতঃ জমির কাঠামো বজায় রাখিয়া সাধারণ লাঙ্গল বা কোদালের সাহায্যে জমি চাষ করিত। বাড়ী, রাস্তা, শহর প্রভৃতি নির্মাণের ধরন ছিল খুব সাধারণ; নিকটবর্তী সামগ্রী হইতেই এই সকল নির্মিত হইত। এইভাবে দেখা যায়, সেই সময় প্রাকৃতিক পরিবেশের গতিকে অস্বাভাবিকভাবে পরিবর্তনের কোন ইচ্ছা মানুষের ছিল না। মানুষের **প্রাচীন সংস্কৃতি** প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে

কখনও জয় করিতে চাহিত না; প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে যতটা সম্ভব মানাইয়া চলিত।

যান্ত্রিক সভ্যতা শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে যন্ত্রের সাহায্যে প্রকৃতিকে জয় করিবার অদম্য আগ্রহ প্রকাশ পায়; যন্ত্রপাতির সাহায্যে মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। পূর্বে মানুষ হস্তচালিত তাঁতের সাহায্যে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিত। কাজ করিবার প্রধান হাতিয়ার ছিল সামান্য হাতুড়ি, করাত ও কোদাল। গাড়ী চালানো হইত পশুর সাহায্যে। যান্ত্রিক যুগে আবিষ্কৃত হইল বয়নযন্ত্র, কৃষি-যন্ত্রপাতি, আগ্নেয় অস্ত্রশস্ত্র, আরও কত কি! সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থায় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিবার ক্রমেই প্রচেষ্টা হইল। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একথা ঠিক যে পৃথিবীর সকল স্থানে সমান ভাবে যান্ত্রিক সভ্যতা বিস্তৃতি লাভ করে নাই। এখনও বহু দেশে প্রাচীন যুগের উৎপাদন-ব্যবস্থা বিদ্যমান। আবার কোন কোন দেশ যান্ত্রিক সভ্যতার চরম শিখরে উঠিয়াছে। পৃথিবীর বহু অনুন্নত দেশে এখনও পশুর সাহায্যে গাড়ী চলে, পশুশিকার করিয়া মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে, লাঙ্গলের সাহায্যে কৃষিকার্য হয়। অন্যদিকে রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন প্রভৃতি দেশে অধিকাংশ উৎপাদন-ব্যবস্থা যন্ত্রের সাহায্যে হইয়া থাকে। কৃষিকার্যে কৃষি-যন্ত্রপাতি (ট্র্যাক্টর, হারভেস্টার) নিযুক্ত হয়, পরিবহণে বিমান, মোটর-গাড়ী ও দ্রুতগামী রেলগাড়ী ব্যবহৃত হয়, অত্যন্ত আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয়। যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রকৃতিকে জয় করিবার অদম্য আগ্রহ যান্ত্রিক সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এইভাবে **যান্ত্রিক যুগের সংস্কৃতি** এক নূতন রূপ ধারণ করে। এই সংস্কৃতির মূল কথা কিভাবে যন্ত্রের সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের প্রয়োজনে নিয়োজিত করা যায়। এই সংস্কৃতি প্রাচীন সংস্কৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আধুনিক যে-কোনও বিখ্যাত শিল্প-নগরীর সহিত প্রাচীনকালের কোনও শহরের তুলনা করিলে সংস্কৃতির এই রূপান্তর পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়া উঠে। নিউ ইয়র্ক, মস্কো ও লণ্ডনের সঙ্গে প্রাচীনকালের নালন্দা, কাশী ও আগ্রার তুলনা করিলেই ইহা সহজে বুঝা যায়।

সংস্কৃতি ও কৃষিকার্য (Culture and Agriculture)—প্রাচীন সভ্যতার যুগেও কৃষিকার্যের প্রচলন ছিল। মানুষ সহজভাবে কৃষিজ দ্রব্য

(প্রধানতঃ খাদ্যশস্য) উৎপন্ন করিয়া নিজেদের প্রয়োজন মিটাইত। প্রথমে মনুষ্যশক্তির সাহায্যে এবং পরে পশুশক্তির সাহায্যে কৃষিকার্য করা হইত। সেই যুগে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল অনেক কম—প্রকৃতি যতটা দিত তাহাতেই মানুষ সন্তুষ্ট থাকিত।

মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্যের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়াছে। কৃষি-জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কৃষি-পদ্ধতির উন্নতি হইয়াছে, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও সাংস্কৃতিক মান-উন্নয়নের ফলে সৃষ্ট হইয়াছে দ্রুতগামী **পরিবহণ-ব্যবস্থার**। ইহার ফলে মানুষ এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাতায়াত শুরু করিয়াছে। এক দেশ হইতে শস্যের বীজ আনিয়া অন্যদেশে কৃষিকার্যের উন্নতি হইয়াছে; শস্যের আদি-ভূমি বহুক্ষেত্রে পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহার ফলে উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন-উপত্যকায় অধিকাংশ রবার উৎপন্ন হইত। আণ্ডিজ পর্বতের পাদদেশে অধিকাংশ আলু ও সিঙ্কোনা উৎপন্ন হইত। পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বীজ স্থানান্তরিত করা সম্ভব হইল। বর্তমানে মালয় ও ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর অধিকাংশ রবার, উত্তর ইউরোপের অধিকাংশ আলু এবং ইন্দোনেশিয়া অধিকাংশ সিঙ্কোনা উৎপন্ন করে। অন্যদিকে দক্ষিণ আমেরিকায় অন্যান্য মহাদেশ হইতে বীজ আনিয়া কফি, কোকো ও ইক্ষু-চাষের উন্নতি হইয়াছে। আমদানীকৃত উৎকৃষ্টশ্রেণীর পশুর সাহায্যে প্রজননের ফলে পশুপালনের উন্নতি হইয়াছে। পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এক দেশের কৃষিজ দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা সহজসাধ্য হইল। ইহার ফলে **আমদানি-রপ্তানির** সৃষ্টি হইল, কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদা এবং উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল।

সংস্কৃতির রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্য প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। **বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের** ফলে উন্নত ধরনের সার ও বীজের সাহায্যে এবং জলসেচের বন্দোবস্ত করিয়া অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমিতে কৃষিকার্য করা সম্ভব হইয়াছে। ইহাতে কৃষি-জমির পরিমাণ ও কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজস্থানের মরুপ্রায় অঞ্চলে অবস্থিত সুরতগড় সুন্দর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। উত্তর আমেরিকার 'প্রেইরী' ও রাশিয়ার 'স্টেপস্' তৃণভূমির অধিকাংশ কৃষি-ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গম-উৎপাদক অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে ট্র্যাক্টর ও ফসল-কাটা

যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় একদিকে যেমন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অন্যদিকে শ্রমের লাঘব হওয়ায় কম শ্রমিকের সাহায্যে বিস্তীর্ণ জমিতে কৃষিকার্য কবা সম্ভব হইয়াছে।

বর্তমান যুগে শুধু কৃষিকার্যের উৎপাদনই বৃদ্ধি পায় নাই, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে কৃষিজ ও বনজ **সম্পদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি** পাওয়ায় ইহার চাহিদাও বাড়িয়া গিয়াছে। পাট হইতে থলিয়া, কার্পেট প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ায় পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরলবর্গীয় বৃক্ষের কাঠ হইতে কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এইজাতীয় বৃক্ষের কার্যকারিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পশুপালন সম্বন্ধেও একই নীতি প্রযোজ্য। পশু হইতে সংগৃহীত দ্রব্যাদির নূতন নূতন ব্যবহার আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পশুপালনের উন্নতি হইয়াছে। পশম, হাড়, চর্ম প্রভৃতি পশুজাত দ্রব্য বিভিন্ন শিল্পে নিয়োজিত হয়। কলম্বাসের উত্তর আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্বে ঐ মহাদেশে পশুপালনের কোন বন্দোবস্ত ছিল না; কিন্তু পরে পশুখাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া মিশ্র প্রজননের বন্দোবস্ত করিয়া এই মহাদেশ পশুপালনে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছে। পশুপালনের উন্নতিতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

এইভাবে দেখা যায় যে, মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-কার্যের উৎপাদনের প্রকৃতি ও পরিমাণ, চাহিদা ও ব্যবহার প্রভৃতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সর্বোপরি, কৃষিকার্যে প্রকৃতির উপর মানুষের নির্ভর-শীলতা বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে।

প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ
(Natural and Cultural Environment)

অর্থনৈতিক ভূগোলশাস্ত্রের প্রধান কাজ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝাইয়া দেওয়া। কিভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ও সাংস্কৃতিক সম্পদ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করিতেছে, কিভাবে মানুষ তাহার সাংস্কৃতিক সম্পদের সাহায্যে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজনে নিয়োজিত করিয়াছে, এই সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা না থাকিলে কোনও দেশের অর্থনৈতিক ভূগোল সম্বন্ধে আলোচনা করা কঠিন।

বর্তমান যুগে প্রাকৃতিক পরিবেশকে কখনই সাংস্কৃতিক পরিবেশ হইতে পৃথক করিয়া চিন্তা করা যায় না। এই দুইটি পরিবেশ মানুষের প্রয়োজনে **পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত**। যেমন মৃত্তিকার উর্বরতা সম্পূর্ণতঃ প্রাকৃতিক সম্পদ, কিন্তু উর্বর মৃত্তিকার কার্যকারিতা নির্ভর করে মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নতির উপর। কৃষিক্ষেত্রের যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করিয়া, সারের বন্দোবস্ত করিয়া, উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ করিয়া, পরিবহণ-ব্যবস্থার সাহায্যে কৃষিজ দ্রব্যের আন্তর্জাতিক চাহিদার সৃষ্টি করিয়া মানুষ কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছে। প্রাকৃতিক সম্পদের আর একটি উদাহরণ—বনভূমি। কিন্তু মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বনভূমির কাঠের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কৃত হওয়ায় বনভূমির চেহারা পাল্টাইয়া গিয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে বনভূমি কাটিয়া নিঃশেষ করা হইয়াছে; আবার কোথাও বনজ সম্পদ-বৃদ্ধির জন্য মানুষ প্রচেষ্টা চালাইতেছে। এইভাবে দেখা যায় প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ উভয়েই একসঙ্গে কাজ করে এবং মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ
(Natural Environment)

প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পূর্ণতঃ প্রকৃতির সৃষ্টি। বিখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানী বার্ণার্ড (L. L. Bernard) প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রধানতঃ দুইভাবে বিভক্ত করিয়াছেন—জৈব (Organic) এবং অজৈব (Inorganic)। বিভিন্ন পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, মৎস্য প্রভৃতি জৈব পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। ভূ-প্রকৃতি, নদী, সৈকতরেখা, মৃত্তিকা, জলবায়ু, অবস্থান, খনিজ সম্পদ প্রভৃতি অজৈব পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ সাংস্কৃতিক পরিবেশের সাহায্যে এই সকল প্রাকৃতিক সম্পদকে সোজাসুজি বা কিছুটা পরিবর্তিত আকারে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। এই সকল জৈব ও অজৈব প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি পরিবেশ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে :

(ক) ভূ-প্রকৃতি (Topography)—ভূ-পৃষ্ঠের সকল স্থানের উচ্চতা সমান নহে। কোথাও সুউচ্চ পর্বত, কোথাও সমভূমি, কোথাও বা মালভূমি বিদ্যমান; কোনস্থান আবার সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতেও নিম্ন। প্রকৃতির এই

বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির ফলে কোন দেশ সমৃদ্ধিশালী, কোন দেশ অনুন্নত। ভু-প্রকৃতিকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—পার্বত্যভূমি, মালভূমি ও সমভূমি।

পার্বত্যভূমি একদিকে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে অসুবিধার সৃষ্টি করে, অন্যদিকে পরোক্ষভাবে মানুষের বহু উপকারে আসে। পার্বত্য অঞ্চলের জমি অসমতল বলিয়া রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্মাণ কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য ; এখানকার নদী খরস্রোতা বলিয়া জলপথের উন্নতি হয় না। এই সকল কারণে পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি না হওয়ায় শিল্প ও বাণিজ্য প্রসার লাভ করে না। অসমতল জমিতে কৃষিকার্যের উন্নতি করা কষ্টকর। সেইজন্য এখানকার লোকবসতি অত্যন্ত বিরল। পার্বত্য অঞ্চল হইতে মানুষের বহু উপকারও সাধিত হয়। পর্বতের অবস্থান হেতু বৃষ্টিপাত হয়, পর্বত হইতে নদী-নদীর উৎপত্তি হয়, পার্বত্য অঞ্চলে বনভূমির সৃষ্টি হয়। কৃষিকার্যের জন্য বৃষ্টিপাত প্রয়োজন ; নদ-নদী দেশের সমৃদ্ধি-সাধনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। বনভূমি হইতে মানুষ কাঠ, জ্বালানি ও শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ করে ; কোন কোন পার্বত্য অঞ্চলে বিস্তার্ণ পশুচারণ-ভূমি দেখা যায়। পর্বত হইতে নদী যখন সমতলভূমিতে প্রবেশ করে, সেই সময় ইহার স্রোত হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। শিল্পে ও মানুষের বাসস্থানে এই জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া পার্বত্য অঞ্চল গ্রীষ্মকালে অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে বলিয়া পৃথিবীর বিখ্যাত স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি পার্বত্য অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়।

মালভূমি অঞ্চলের অধিবাসিগণ বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। এখানে প্রচুর খনিজ সম্পদ থাকিলেও পরিবহণ-ব্যবস্থার অভাবে শিল্পের উন্নতি বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। এখানকার মৃত্তিকা সাধারণতঃ অনুর্বর বলিয়া চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে।

সমভূমি প্রধানতঃ নদীর উপত্যকায় সমুদ্রোপকূলে পরিলক্ষিত হয়। সমভূমিতে নদীবাহিত উর্বর পলিমাটি থাকায় কৃষিকার্যের উন্নতি হয়। সমতলভূমিতে উঁচু-নীচু না হওয়ায় পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি সহজসাধ্য হইয়া থাকে ; নদীগুলি নাব্য হওয়ায় জলপথের উন্নতি হয়। ইহার ফলে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হয় এবং লোকবসতির ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। জীবিকা-নির্বাহের সুবন্দোবস্ত থাকায় অবসর সময় মানুষ সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সুযোগ পায়। এইভাবে দেখা যায় যে, ভূ-প্রকৃতি মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির উপর বিশেষ

প্রভাব বিস্তার করে। প্রকৃতিকে মানুষ কিয়দংশে বশ করিলেও ভূ-প্রকৃতিকে পরিবর্তন করিবার মতো ক্ষমতা মানুষ এখনও অর্জন করিতে পারে নাই।

(খ) ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical Location)—কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে। দেশের অবস্থানের উপর জলবায়ু নির্ভরশীল; নিরক্ষ-রেখার নিকটবর্তী অঞ্চলের দেশসমূহে অত্যধিক তাপমাত্রা থাকাই স্বাভাবিক। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত দেশসমূহে মৃদু জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। কৃষিকার্য এই জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল বলিয়া দেশের অবস্থানের উপর পরোক্ষভাবে কৃষিকার্যও নির্ভরশীল। বসতি-স্থাপনের উপর ভৌগোলিক অবস্থান বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত দেশের অত্যধিক গরমের জন্য বিরললোকবসতি বিদ্যমান; কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত দেশসমূহে মৃদু জলবায়ু থাকায় লোকবসতির ঘনত্ব অত্যন্ত বেশী। ভৌগোলিক অবস্থানের উপর দেশের রাজনৈতিক নিরাপত্তা নির্ভর করে। দ্বৈপ অবস্থানযুক্ত দেশসমূহের প্রাকৃতিক সীমারেখা থাকায় বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া সহজসাধ্য। ইহা ছাড়া কোন দেশের অবস্থান পৃথিবীর মধ্যস্থলে হইলে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা হয়। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া অপেক্ষাকৃত কম ভাড়ায় সকল দেশের সঙ্গে পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করিতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন দেশে **মহাদেশীয় অবস্থান** পরিলক্ষিত হয়; এই সকল দেশের চতুর্দিকে স্থলভাগ থাকায় বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা থাকে; সমুদ্রতীর হইতে দূরে অবস্থিত হওয়ায় বন্দরের উন্নতি হয় না বলিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইহারা উন্নতি লাভ করিতে পারে না। বলিভিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে এইজাতীয় অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। নরওয়ে, সুইডেন, স্পেন প্রভৃতি দেশের **সমুদ্র-প্রান্তীয়** অবস্থান পরিলক্ষিত হয়; এই সকল দেশের এক অংশ সমুদ্র-তীরে অবস্থিত হওয়ায় বন্দর-স্থাপন ও বাণিজ্যের উন্নতি বিশেষ কষ্টসাধ্য হয় না। বৃটেন, জাপান প্রভৃতি দেশ **দ্বৈপ** অবস্থানযুক্ত বলিয়া বন্দর-স্থাপন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিয়াছে। **উপদ্বীপীয়** অবস্থানযুক্ত দেশসমূহে তিনদিকে জল এবং একদিকে স্থল থাকায় বন্দর-গঠন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের

উন্নতিসাধন সম্ভব। সমুদ্রের নিকটবর্তী দেশসমূহ মৎস্য-শিকারেও উন্নতি লাভ করিতে পারে।

(গ) নদী (River)—মানব-সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, নদীমাতৃক দেশসমূহে প্রাচীন সভ্যতার উন্মেষ হইয়াছিল। নীলনদের উপত্যকায় মিশর, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় ব্যাবিলন, সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকায় ভারতবর্ষ এবং হোয়াংহো ও ইয়াংসি নদীর উপত্যকায় চীন প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান। নদী হইতে মানুষ বিভিন্ন সাহায্য পাইয়াছে বলিয়াই নদীতীরে সভ্যতার এই বিকাশ সম্ভবপর হইয়াছিল। বর্তমান যুগেও নদী মানুষের পানীয় জল সরবরাহ করে, জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে ও জলসেচনের কার্যে সাহায্য করে, জল-নিষ্কাশনের প্রণালীরূপে ব্যবহৃত হয়; জলপথে পণ্য
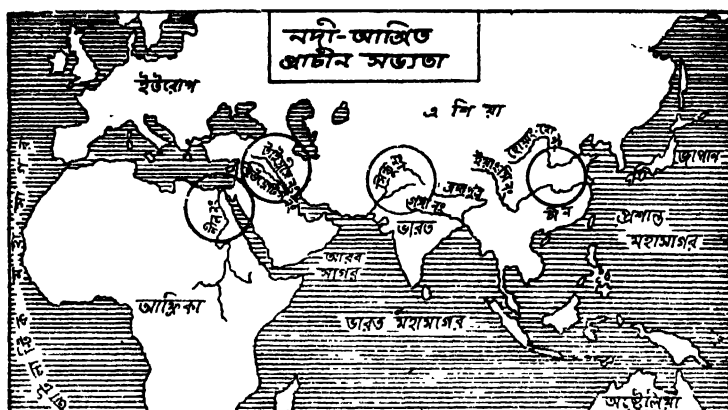
ও যাত্রী পরিবহণে সহায়তা করে এবং পলিমাটি বহন করিয়া নদী-উপত্যকাকে উর্বর করে। নদী মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে এইভাবে সাহায্য করিলেও, বন্যাদ্বারা নদী বহুবার মানুষের ঘরে ঘরে কান্নার রোল বহাইয়া দিয়াছে। অবশ্য বন্যায় প্রাথমিক ক্ষতি হইলেও বন্যার জলে জমি উর্বর হওয়ায় কৃষি-কার্যের উন্নতিতে সাহায্য করে।

(ঘ) সৈকতরেখা (Coast-line)—সৈকতরেখার প্রকৃতির উপর দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য নির্ভরশীল। সৈকতরেখা ভগ্ন হইলে বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মাণ করা সহজ; অবশ্য এইজন্য সমুদ্রের গভীরতাও প্রয়োজন। বন্দরের উন্নতি না হইলে বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতিসাধন সম্ভবপর নহে। যে সকল

দেশে অভগ্ন সৈকতরেখা বিদ্যমান, সেখানে বন্দর-স্থাপন সম্ভব হয় না। বৃটেনের বহির্বাণিজ্যের উন্নতির মূলে আছে দেশের ভগ্ন সৈকতরেখা। আফ্রিকার দেশসমূহের অনুন্নতির অন্যতম কারণ ঐ সকল দেশের অভগ্ন সৈকতরেখা।

(ঙ) জলবায়ু (Climate)—মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর জলবায়ু যতটা প্রভাব বিস্তার করে, অন্য কোন প্রাকৃতিক পরিবেশ ততটা করে না। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জলবায়ু মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রথমতঃ, **কৃষিকার্য** জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল ; বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা ও তুষারপাত কৃষিকার্য নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের খাদ্য কি প্রকারের হইবে তাহাও নির্ভর করে স্থানীয় জলবায়ুর উপর। এইজন্য বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ভাত এবং পাঞ্জাবীর প্রধান খাদ্য গমের রুটি। বাংলাদেশের জলবায়ু ধান উৎপাদনের এবং ভাত পরিপাকের সহায়ক ; পাঞ্জাবের জলবায়ু গম উৎপাদনের ও রুটি পরিপাকের সহায়ক। দ্বিতীয়তঃ, বৃষ্টিপাতের পরিমাণের উপর প্রধানতঃ স্বাভাবিক **উদ্ভিজ্জ** নির্ভরশীল। জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের উদ্ভিজ্জ জন্মিয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশে সরলবর্গীয় বৃক্ষ জন্মে ; কিন্তু নিরক্ষীয় জলবায়ুতে চিরহরিৎ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, **পশুপালন** স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের উপর নির্ভরশীল। কারণ, তৃণভূমি অঞ্চলে পশুপালন উন্নতি লাভ করে। জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে তৃণ ছোট বা বড় হয়। দীর্ঘ তৃণ গবাদি পশুপালনের এবং ক্ষুদ্রকায় তৃণ মেষ, ছাগল প্রভৃতি পশুপালনের উপযোগী। চতুর্থতঃ, জলবায়ুর তারতম্যের ফলে সৃষ্ট শীতল ও উষ্ণ স্রোতের মিলন হয় বলিয়া পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে বিখ্যাত **মৎস্যক্ষেত্র** গড়িয়া উঠিয়াছে। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু প্রধানতঃ মৎস্যশিকারের উপযোগী। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক মৎস্য-চাষের উপর নির্ভরশীল। পঞ্চমতঃ, মানুষের **বসবাসের** স্থানও জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। জলবায়ুর বিভিন্নতার জন্য কোনস্থান অত্যধিক গরম, কোনস্থান অত্যধিক ঠাণ্ডা, কোনস্থান মরুভূমি, কোনস্থান বরফাচ্ছন্ন। নাতিশীতোষ্ণ ও মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল জীবনধারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল বলিয়া পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এই সকল জলবায়ু অঞ্চলে বাস করে। উপনিবেশ-স্থাপনও জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। ঔপনিবেশিকের দল তাহাদের দেশের অনুরূপ জলবায়ু-যুক্ত অঞ্চলেই সাধারণতঃ উপনিবেশ স্থাপন করে।

ষষ্ঠতঃ, **যন্ত্রশিল্পের** উপর জলবায়ু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। শিল্পগঠনের জন্য প্রয়োজন কাঁচামাল, শ্রমনৈপুণ্য, পরিবহণ-ব্যবস্থা ও চাহিদা। শিল্পের এই সকল উপাদানের উপর জলবায়ুর প্রভাব খুব স্পষ্ট। **কাঁচামাল** অধিকাংশই কৃষিজ, বনজ ও পশুজাত দ্রব্য ; ইহাদের উৎপাদন জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। পাটচাষের উপযোগী জলবায়ু থাকিলেই পাট-উৎপাদন ও পাটশিল্পের উন্নতি সম্ভবপর। তূলা উৎপাদনের উপযোগী জলবায়ু এবং সূক্ষ্ম সূতা উৎপাদনের উপযোগী আর্দ্র জলবায়ু থাকিলেই কার্পাসবয়ন-শিল্প উন্নতি লাভ করিবে। **শ্রমনৈপুণ্য** নির্ভর করে জলবায়ুর উপর। উষ্ণ জলবায়ুতে শ্রমিক অল্প সময় কাজ করিবার পরেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে ; কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের শ্রমিক অধিক সময় নিপুণভাবে কাজ করিতে পারে। শিল্পের উন্নতির জন্য **পরিবহণ-ব্যবস্থা** একান্ত প্রয়োজন। কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদ শিল্পকেন্দ্রে আনিতে এবং শিল্পজাত দ্রব্য বাজারে পাঠাইতে পরিবহণ-ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। উত্তাপ, বায়ুপ্রবাহ, তুষারপাত ও বৃষ্টিপাতের উপর পরিবহণ-ব্যবস্থা বহুলাংশে নির্ভরশীল। অত্যধিক ঘূর্ণিবায়ুর জন্য বিমান-চলাচল ব্যাহত হয়, অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে অথবা বরফ জমিয়া রেলপথ, রাস্তাঘাট বা নদ-নদী পরিবহণের অনুপযোগী হইয়া যায়। শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন নির্ভর করে **চাহিদার** উপর। জলবায়ু এই চাহিদা-সৃষ্টির উপরও প্রভাব বিস্তার করে। শীতপ্রধান দেশে পশমী দ্রব্যের চাহিদা বেশী, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কার্পাসবস্ত্রের চাহিদা বেশী। সেইজন্য বৃটেন, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশমবয়ন-শিল্পে এবং ভারত ও চীন কার্পাসবয়ন-শিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে।

(চ) মৃত্তিকা (Soil)—কৃষিকার্যের উন্নতি নির্ভর করে মৃত্তিকার উর্বরা-শক্তির উপর। চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ভারতের কৃষিকার্যের উন্নতির মূলে রহিয়াছে তাহাদের মৃত্তিকার উর্বরতা। মহারাষ্ট্র রাজ্যের শোলাপুরে কৃষ্ণমৃত্তিকা থাকার জন্যই প্রচুর পরিমাণে তূলা ঐ অঞ্চলে উৎপন্ন হইতেছে। প্রাচীনকালের ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে, মানব-সভ্যতার বিকাশের সহিত মৃত্তিকার উর্বরতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রাচীনকালে সভ্যমানুষ যেখানে কৃষিকার্যের উপযোগী উর্বর জমি পাইয়াছে, সেখানেই বসতি স্থাপন করিয়াছে। ভারত, চীন প্রভৃতি দেশের মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর বলিয়া এখানে সভ্যতার উন্মেষ হইয়াছিল।

(ছ) খনিজ সম্পদ (Minerals)—বিভিন্ন খনিজ সম্পদ বিশেষতঃ কয়লা ও খনিজ তৈলের ন্যায় জড়শক্তির উৎসসমূহ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। শিল্প-বিপ্লবের পর হইতে খনিজ সম্পদ যন্ত্রশিল্পের উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। খনিজ সম্পদের সন্ধানে মানুষ ছুটিয়া চলিয়াছে দূর-দূরান্তরে মরুভূমিতে বা বসবাসের অযোগ্য স্থানে। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি অঞ্চলে স্বর্ণখনি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতকায় মানুষ সেখানে ছুটিয়া চলিল। আটাকামা মরুভূমিতে খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়ায় এই মরু অঞ্চলেও মানুষ বসবাস করিতে দ্বিধা করিতেছে না। কারণ খনিজ সম্পদ দেশের শ্রীবৃদ্ধিতে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। বর্তমান যুগে ইস্পাতশিল্পের উন্নতি দ্বারা দেশের শিল্পোন্নতির পরিমাপ করা হয়। ইস্পাতশিল্পের উন্নতি নির্ভর করে কয়লা লৌহ আকরিক প্রভৃতি খনিজ সম্পদের উপর। বর্তমান যুগে যে সকল দেশে এই সকল খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়, সাধারণতঃ সেই সকল দেশেই শিল্পোন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান যুগে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে খনিজ সম্পদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী।

(জ) উদ্ভিজ্জ (Vegetation)—দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে উদ্ভিজ্জের অবদান কম নহে। জলবায়ুর প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রণে, মৃত্তিকার ক্ষয়রোধে, বন্যা-নিয়ন্ত্রণে, জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে, প্রবল ঝঞ্ঝা-দমনে উদ্ভিজ্জ প্রভূত সাহায্য করে। ইহা ছাড়া বনভূমি হইতে ফলমূল ও কাঠ সংগ্রহ করিয়া মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। জ্বালানি, আসবাবপত্র, বাড়ীঘর নির্মাণের সাজ-সরঞ্জাম, মোটর-গাড়ী, বাস্, নৌকা, জাহাজ, রেলের কামরা, প্যাকিং বাক্স, দিয়াশলাই ও কাষ্ঠমণ্ড প্রভৃতি তৈয়ারীর জন্য বনভূমির কাঠ ব্যবহৃত হয়। কাষ্ঠমণ্ড হইতে কাগজ, রেয়ন ও কৃত্রিম সুরাসার প্রস্তুত হয়। তৃণভূমি অঞ্চলে পশুপালন উন্নতি লাভ করে। পশু হইতে মাংস, চর্ম, পশম ও দুগ্ধজাত দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

এই সকল প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করিলেও, বর্তমান যুগে মানুষ সম্পূর্ণতঃ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল নহে। নিজের প্রয়োজনের তাগিদে প্রাকৃতিক সম্পদের রূপ পরিবর্তন করিয়া প্রকৃতিকে নিজের বশে আনিয়া মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে নিয়োজিত করিবার নিরলস প্রচেষ্টায় মানুষ ব্যস্ত। তাপ-নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে মানুষ

জলবায়ুর প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে, সারের সাহায্যে অনুর্বর জমিকেও কৃষিকার্যে নিয়োজিত করিতেছে, মরুভূমিতে নলযোগে জল আনিয়া বসবাসের বন্দোবস্ত করিতেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ যেখানে মানুষের উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করিতেছে, সেখানেই ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া সেই বাধা অতিক্রম করা হইতেছে।

সাংস্কৃতিক পরিবেশ

(Cultural Environment)

গতিশীল জগতে মানুষের সাংস্কৃতিক মান ক্রমশঃই উন্নতি লাভ করিতেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার ক্রমশঃই অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। সাংস্কৃতিক পরিবেশের কার্যকারিতা অনুসারে বিখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানী বার্ণার্ড (L. L. Bernard) ইহাকে নিম্নলিখিত তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন:

(ক) আবিষ্কার ও শিক্ষা-দীক্ষার পরিবেশ—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ শিখিল কিভাবে বিভিন্ন জৈব ও অজৈব সম্পদ হইতে মানুষের প্রয়োজনীয় নানাবিধ সামগ্রী সৃষ্টি করা যায়। প্রথমতঃ, **অজৈব পদার্থ** হইতে মানুষ তাহার বুদ্ধিবলে বিভিন্ন সম্পদ উৎপন্ন করিয়া এক নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। খনিজ সম্পদের নূতন নূতন ব্যবহার আবিষ্কার করিয়া, খনিজ দ্রব্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সাহায্যে যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিয়া, পরিবহণ-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত করিয়া, গৃহাদি নির্মাণ করিয়া ও বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া মানুষ এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। এই পরিবেশ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, **জৈব সম্পদকে** বুদ্ধিবলে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া মানুষ একটি সুন্দর নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। মিশ্র প্রজননের নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পশুর সৃষ্টি হইতেছে। বন্য পশুকে বশ করিয়া মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতেছে। কৌশলে বন্য হস্তী ধরিয়া ইহার প্রচণ্ড শক্তিকে ব্যবহার করা হইতেছে কাষ্ঠ-পরিবহণে। সঙ্কর বীজের সাহায্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। এমনকি অশিক্ষিত মানুষকে অধিকতর বুদ্ধিমান মানুষ নানাবিধ কাজ শিখাইয়া বিভিন্ন কার্যে নিয়োগ করিতেছে। দাস-প্রথার সাহায্যে মানুষকে জোরপূর্বক কার্যে নিয়োজিত করিবার কথা মানুষ এখনও ভুলিয়া যায় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

নিগ্রোদের দাস হিসাবে আমদানি করিয়া কাজ শিখাইয়া বিভিন্ন কার্যে নিয়োজিত করা হইয়াছে। বর্তমান যুগে ছাত্রকে শিক্ষা দিয়া উন্নততর মানুষে পরিণত করা হয়, যুবককে চর্চাদ্বারা সৈনিক তৈয়ার করা হয়, খেলাধূলা শিক্ষার মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের উৎকৃষ্ট খেলোয়াড়ে পরিণত করা হয়। মানুষ শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে এইভাবে জৈব শক্তিকে বিভিন্ন কার্যে নিয়োজিত করিয়া এক নূতন সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে।

(খ) মনস্তাত্ত্বিক-সামাজিক পরিবেশ—ভাষা ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক-সামাজিক পরিবেশ গড়িয়া ওঠে। প্রথমতঃ, আদিম সভ্যতার যুগে ভাষা আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ **ভাবভঙ্গী** দিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিত। এই ভাবভঙ্গীর ভাষার মধ্যেও গড়িয়া উঠিয়াছিল এক সামাজিক ঐক্য পরিবেশ। বর্তমানেও যে এইজাতীয় পরিবেশ পৃথিবীর কোন অঞ্চলে নাই একথা বলা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, মানব-সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয় **কথ্য ভাষার**। মানুষ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের কথ্য ভাষার সাহায্যে মনের ভাব ব্যক্ত করে। ইহার ফলে ভাষাভিত্তিক সমাজের স্বষ্টি হয়। একই ভাষার মাধ্যমে মনের ভাব ব্যক্ত হওয়ায় মানুষের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক ঐক্যও গড়িয়া ওঠে। যে সকল লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে তাহাদের মধ্যে একটি মানসিক ঐক্য বিদ্যমান। এক ভাষা-ভাষী লোক প্রায় একই রকম বিশ্বাস, সংস্কার, মতবাদ ও নিয়মকানুনের সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে।

তৃতীয়তঃ, সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আবিষ্কার করিল **লিখিত ভাষা**। লিখিত ভাষা আবিষ্কারের ফলে মানুষের সাংস্কৃতিক পরিবেশ পরিবর্তিত হইয়া গেল। মানুষ তাহার লব্ধ জ্ঞান পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। একস্থান হইতে অন্যস্থানে চিঠির মারফত খবর পাঠানো সম্ভব হইল। সৃষ্টি হইল উচ্চাঙ্গের ভাষা, কাব্য, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্য; উন্নতি হইল বিভিন্ন বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার; লিখিত ভাষার আবিষ্কার না হইলে বিজ্ঞান, কলা ও দর্শন যুগে যুগে প্রবাহিত হইতে পারিত না এবং উন্নতি লাভ করিতে পারিত না। বিজ্ঞানের উন্নতি না হইলে শিল্পের প্রসার হইত না, ঔষধ আবিষ্কার হইত না, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হইত না, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইত না। সুতরাং লিখিত ভাষা বর্তমান সভ্যতার প্রধান বাহক। বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন

যোগাযোগ-ব্যবস্থার 'উন্নতি হইয়াছে। ডাক, তার, টেলিফোন, টেলিভিসন, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, রেকর্ড প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষ একস্থান হইতে অন্যস্থানে তাহার ভাব প্রেরণ করিতে পারে। এইভাবে লিখিত ভাষা ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা বর্তমান সাংস্কৃতিক পরিবেশকে উন্নততর করিয়াছে।

(গ) সাংগঠনিক পরিবেশ—প্রধানতঃ সাংগঠনিক কার্যকলাপের ফলে এই পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। এই পরিবেশ প্রধানতঃ মনস্তাত্ত্বিক-সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। বর্তমান যুগে রাজনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার উন্নতি হওয়ায় রাষ্ট্র ও সরকারের সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্র ও সরকার-সৃষ্ট পরিবেশ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির উপর বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে

সাংস্কৃতিক পরিবেশের তারতম্য—পৃথিবীর সকল স্থানের সাংস্কৃতিক পরিবেশ এক নহে। কোন কোন অঞ্চলে মানুষ এখনও অশিক্ষিত, বর্বর এবং পশু শিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে; আবার কোন কোন দেশে মানুষ শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে অত্যন্ত উন্নত। কঙ্গোর আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক মানের সঙ্গে স্পুটনিক-আবিষ্কারক রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকগণের সাংস্কৃতিক মানের কোনও তুলনা হয় না। অনেক ভৌগোলিক মনে করেন যে, বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকমের সামাজিক পরিবেশ থাকিবার জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সাংস্কৃতিক পরিবেশের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের মতে এই পার্থক্যের কারণ সরকারের কর্মকুশলতা, লোকবসতির ঘনত্ব, জাতি, ধর্ম প্রভৃতির প্রভাব। সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতার ফলে বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির তারতম্য হইয়া থাকে।

(১) সরকারের কর্মকুশলতা—প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকিলেও যতক্ষণ পর্যন্ত সেই দেশের সরকার প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের প্রয়োজনে নিযুক্ত করিবার সুবন্দোবস্ত না করে, ততক্ষণ সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হওয়া কঠিন। সরকারের কর্মকুশলতা ও সদিচ্ছার উপর বর্তমান যুগে দেশের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। রাশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ জারের রাজত্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। কিন্তু জারের সময় সরকারের অকর্মণ্যতায় সেই দেশের কোনও উন্নতি হয় নাই। বিপ্লবের পর নূতন সরকার সমাজতান্ত্রিক পন্থায় সেই দেশের দ্রুত উন্নতি সাধন করিয়াছে। বর্তমানে রাশিয়া পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ। ইহা ছাড়া পরাধীন দেশ

কখনও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনে সক্ষম হয় না। কারণ সেখানকার সরকার দখলকারী সাম্রাজ্যবাদী দেশের উন্নতিসাধনের জন্যই সর্বদা সচেষ্ট থাকে। ভারত যখন পরাধীন ছিল, সেই সময় বৃটিশ সরকার সর্বদাই ভারতের সম্পদ শোষণ করিয়া বৃটেনের অর্থনৈতিক উন্নতিতে নিয়োজিত করিত। ইহার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন সম্ভবপর হয় নাই। স্বাধীনতার পর স্বাধীন সরকার বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মারফত দেশের উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করিতেছে। এইভাবে দেখা যায়, সরকারের কর্মকুশলতা ও সদিচ্ছা মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

(২) **লোকবসতি**—দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে জনসংখ্যার প্রভাব বিগুমান। জনবহুল দেশ মানুষের অভাব মিটাইবার জন্য সচেষ্ট হয় এবং দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করে। যে সকল দেশে আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা কম, সেখানে কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করিয়া এবং শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ ও আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম থাকিলে উন্নতি ব্যাহত নয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও লোকাভাবে অস্ট্রেলিয়া আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। 'শ্বেত অস্ট্রেলিয়া নীতি'র ফলে এখানকার লোকবসতি বৃদ্ধি পাইতেছে না; অন্যদিকে ভারত, চীন ও জাপান তাহাদের জনসম্পদকে কাজে লাগাইয়া দেশের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতেছে। বর্তমান যুগে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে লোক-সংখ্যার অভাবে সাধারণতঃ অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয় না। রাশিয়ার আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা কম; কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি প্রয়োগের ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অল্প লোকের সাহায্যে চাষ-আবাদ করা সম্ভব হইয়াছে।

(৩) **জাতি**—বিংশ শতাব্দীতে মানব-সভ্যতার যথেষ্ট অগ্রগতি হইলেও এখনও বহুস্থানে জাতি ও ধর্ম অর্থনৈতিক উন্নতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। পৃথিবীর মানুষকে সাধারণতঃ তিনটি জাতিতে বিভক্ত করা যায়—শ্বেতকায়, পীতকায় ও কৃষ্ণকায় জাতি। শ্বেতকায় জাতি বলিতে শ্বেতবর্ণের মানুষ ও আর্যগণকে বুঝায়; যথা, ইউরোপীয়, ভারতীয় ও উত্তর আমেরিকার অধিবাসিগণ। পীতকায় জাতি বলিতে প্রধানতঃ মঙ্গোলীয় জাতিকে বুঝায়। ইহাদের গায়ের রং হরিদ্রাভ এবং চেহারা খর্বকায়। চীন, জাপান, ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ এই জাতির অন্তর্ভুক্ত।

কৃষ্ণকায় জাতি বলিতে সাধারণতঃ নিরক্ষীয় অঞ্চলের কৃষ্ণকায় অধিবাসিগণকে বুঝায়। ইহাদের গায়ের রং অত্যন্ত কালো এবং দেহের গঠন অত্যন্ত শক্ত। আফ্রিকার নিগ্রোজাতীয় লোকেরা এই জাতির অন্তর্ভুক্ত।

অনেক ভৌগোলিক মনে করেন যে, শ্বেতকায় লোকেরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও পরিশ্রমী, এইজন্য ইহারা শিল্পে ও বাণিজ্যে অত্যন্ত উন্নত। বর্তমান পৃথিবীতে এইজন্য ইহারা প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। পীতকায় লোকেরাও অত্যন্ত কর্মঠ ও বুদ্ধিমান্। ইহার ফলে এই জাতির লোকেরাও কৃষিকার্য, শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিতেছে। এই সকল ভৌগোলিকদের মতে কৃষ্ণকায় লোকেরা শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারিলেও বুদ্ধিমত্তায় ততটা পারদর্শী নহে; ইহার জন্য কৃষ্ণকায়গণ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।

বর্তমান সভ্য জগতে অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে জাতিভেদ প্রথার প্রভাব অনেকেই স্বীকার করেন না। নৃতত্ত্বশাস্ত্রের পণ্ডিতগণও এই মতবাদকে সম্পূর্ণ মানিয়া লইতে পারেন নাই। মানুষের জন্মের স্থান-নির্ণয় আকস্মিক ঘটনা মাত্র। কোন লোক আফ্রিকায় কোন নিগ্রোর বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই মূর্খ হইবে, এই কথা কোন সৎ ও চিন্তাশীল ব্যক্তি কখনই স্বীকার করিবেন না। অনুন্নত কৃষ্ণকায় জাতিসমূহের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণ উহাদের বর্ণ বা জাতি নহে; এর মূল কারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতা এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ কর্তৃক ইহাদের সম্পদ-শোষণ। বৃটিশ রাজত্বে ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণ ছিল বৃটিশের শোষণ; অন্য যুক্তি বর্তমানে অচল। কঙ্গোর অনুন্নতির প্রধান কারণ বেলজিয়ানগণ কর্তৃক ঐ দেশের খনিজ সম্পদের শোষণ। বেলজিয়ামের লোক কঙ্গোর অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণ খুঁজিতে যাইয়া জাতিভেদ প্রথার দোহাই দিলেও বর্তমানে কেহই তাহা বিশ্বাস করিবে না।

(৪) **ধর্ম**—বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও অর্থনৈতিক জীবনে ধর্মের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। পৃথিবীতে প্রধানতঃ চারিটি ধর্ম বিদ্যমান—হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ ও খৃস্টধর্ম। হিন্দুধর্মাবলম্বিগণ গরুকে ভক্তি করে বলিয়া গো-মাংসের ব্যবসায়ে তাহারা উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। ভারত গবাদি পশুপালনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করিলেও, গো-মাংসের রপ্তানি-বাণিজ্যে এই দেশ অংশগ্রহণ করে না। হিন্দুধর্মে জাতিভেদ প্রথার কুসংস্কার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। ইসলাম

ধর্মে সুদগ্রহণ ও মদ্যপান নিষিদ্ধ বলিয়া মুসলমান-অধ্যুষিত দেশসমূহে ব্যাঙ্কিং ও দ্যশিল্প ভালোভাবে গড়িয়া ওঠে নাই। বৌদ্ধধর্মাবলম্বিগণ অহিংস বলিয়া এই ধর্মে মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম-প্রধান দেশে মাংসের ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ না করা স্বাভাবিক। খৃস্টধর্মে সামাজিক অনুশাসন কম থাকায় এই ধর্মাবলম্বিগণ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বর্তমান যুগে ধর্মের অনুশাসন ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে এবং ধর্মের প্রতিপত্তিও কমিয়া আসিতেছে। মার্ক্সীয় দর্শনের আবির্ভাবে পৃথিবীর বহু লাক ভগবানের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না এবং ধর্মীয় অনুশাসন মানিয়া চলে না। এইজন্য চীন ও জাপানের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী অধিবাসিগণ মাংসভক্ষণে পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। কাবুলিওয়ালারা ইসলাম-র্মাবলম্বী হইয়াও সুদের ব্যবসায়ে সিদ্ধহস্ত। বহু হিন্দু কুক্কুটমাংসে পরম তৃপ্তি াভ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বর্তমান যুগে ধর্মের অনুশাসন র্থনৈতিক উন্নতিতে বিশেষ ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। যাহারা ভারত ও ানের অনুন্নতির জন্য ধর্মের অনুশাসনকে দায়ী করিয়াছিল, তাহারা আজকের ান ও ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে তাকাইয়া দেখিলে তাহাদের ল বুঝিতে পারিবে। ভারত ও চানের বর্তমান অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির লে রহিয়াছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা—ধর্ম নহে।

পরিবেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামঞ্জস্য-বিধান (Direct and ndirect adjustment of Environment)—যুগে যুগে মানুষ প্রাকৃতিক রিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে, অথবা প্রকৃতিকে নিজের াংস্কৃতিক পরিবেশ দ্বারা পরিবর্তিত করিয়া নিজের প্রয়োজনে নিয়োজিত রিয়াছে। প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশেই সৃষ্টি হইয়াছে মানুষের জ্ঞান ও িচারবুদ্ধিসম্ভূত নানাবিধ আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের ফলেই প্রতিকূল বিবেশকে মানুষের অনুকূলে আনা হইয়াছে। একদিকে মানুষের সাংস্কৃতিক রিবেশ এইভাবে প্রকৃতিকে বশে আনিবার কার্যে নিয়োজিত হইয়াছে—খনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষভাবে; অন্যদিকে প্রতিকূল পরিবেশকে নুকূলে আনিবার জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে মানুষের সংস্কৃতি।

প্রাচীনকালে প্রাকৃতিক পরিবেশকে বশে আনিতে **প্রত্যক্ষভাবে** ানুষের সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠে। অত্যধিক শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা াইবার জন্য মানুষ বুদ্ধিবলে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছিল; কঠিন প্রস্তরকে ভাঙ্গিবার

জন্য মানুষের চেষ্টা ও বুদ্ধির ফলে সৃষ্টি হইয়াছিল কুঠার। ইহাই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সাংস্কৃতিক পরিবেশের সামঞ্জস্য-বিধানের বা খাপ খাওয়াইবার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সাংস্কৃতিক মানেরও উন্নতি হইয়াছে। এই যুগে মানুষকে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রত্যক্ষ সামঞ্জস্য-বিধান করিতে হয় নাই। বর্তমানের জটিল অবস্থার যুগে এই সামঞ্জস্য-বিধানও প্রত্যক্ষ না হইয়া **পরোক্ষভাবে** হইয়া থাকে। শিল্প-বিপ্লবের পর হইতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইতেছে। নূতন নূতন যন্ত্রপাতি-আবিষ্কারের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে আরও সুন্দরভাবে খাপ খাওয়াইবার চেষ্টাই লুক্কায়িত আছে। পূর্বে যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের জন্য সাধারণ ইস্পাত-দ্রব্য ব্যবহৃত হইত। ক্রমশঃ উচ্চতাপে অত্যধিক ধারালো অস্ত্রের প্রয়োজন হওয়ায় সৃষ্টি হইল টাংস্টেন-ইস্পাত ও কোবাল্ট-ইস্পাত। এই সকল আবিষ্কার মানুষের সাংস্কৃতিক মান-উন্নয়নের পরিচায়ক; ইহা প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনকে খাপ খাওয়াইবার পরোক্ষ সামঞ্জস্য-বিধান ছাড়া আর কিছুই নহে।

বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহাও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার জন্য মানুষেরই পরোক্ষ প্রচেষ্টা। আদিম যুগে মানুষ বন্যপশুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দলবদ্ধ হইয়াছিল। মানুষের এই দলবদ্ধতা প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রত্যক্ষ ফল। সমাজের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হইল বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; সর্বশেষে সৃষ্টি হইল রাষ্ট্র ও সরকার। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে যে 'গণতন্ত্র' (Democracy) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সংস্কৃতির পরোক্ষ সামঞ্জস্য-বিধান; আদিম কালের দলবদ্ধ মানুষের সংগঠন হইতে বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক সমাজগঠনের ইতিহাস আলোচনা করিলেই এই পরোক্ষ সামঞ্জস্য-বিধানের চরিত্রটি উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। রাশিয়া ও চীনের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও তৎকালীন পরিবেশ আলোচনা করিলেও এই পরোক্ষ সামঞ্জস্য-বিধানেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। এইভাবে দেখা যাইবে, মানুষের উন্নতি নির্ভর করে একদিকে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং অন্যদিকে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও জীবনমান রক্ষার প্রচেষ্টার উপর।

সংস্কৃতি স্থানান্তরের একটি উদাহরণ (An example of Culture Transfer)—প্রাচীন যুগ হইতেই মানুষ বিভিন্ন ভাগে দলবদ্ধ হইয়া পৃথক-ভাবে স্বীয় সংস্কৃতির সৃষ্টি করিত। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর সংস্কৃতির উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করিত। সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতা অনুসারে সাংস্কৃতিক পরিবেশের পার্থক্য পরিলক্ষিত হইত এবং এখনও হয়। কঙ্গোর প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর প্রতিষ্ঠিত তৎস্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নিশ্চয়ই মস্কোর স্পুটনিক-আবিষ্কারক সংস্কৃতির তুলনা করা যায় না। প্রাকৃতিক পরিবেশ এই পার্থক্যের জন্য বহুলাংশে দায়ী। অবশ্য এক অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের মানুষের মিলনের ফলে এক দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশের সংস্কৃতিকে কিছুটা প্রভাবিত করিয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্যের দরুন দুই অঞ্চলের সংস্কৃতিকে এক ছাঁচে ঢালা প্রায় অসম্ভব। কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুসারে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠে। সুতরাং একস্থানের সংস্কৃতিকে অন্যস্থানে জোরপূর্বক প্রয়োগ করিলে তাহার কুফল দেখা দিবে। বৃটিশ আমলে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হইবার ইতিহাসের দৃষ্টান্ত হইতেই সংস্কৃতি-স্থানান্তরের কুফলের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

ভারত প্রায় দুইশত বৎসর বৃটেনের দখলে ছিল। বৃটেনের সকল আইন-কানুন, কর ও শুল্ক-ব্যবস্থা এবং শাসন-ব্যবস্থা ভারতে প্রবর্তিত হইয়াছে। ভারতের উন্নতিতে স্থানীয় লোকের বিশেষ কোনও হাত ছিল না; ভারতের ভাগ্য লইয়া খেলা করিত বৃটেনের ভাগ্যনিয়ন্তাগণ। তাহারা বৃটেনের শিল্পোন্নত সংস্কৃতিকে ভারতের উপর সমভাবে চাপাইয়া দিল। কিন্তু এই দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে বৃটেনের প্রাকৃতিক পরিবেশের কোনও মিল নাই, বরঞ্চ উল্টো। যেমন:

বৃটেন	ভারত
১। আয়তন ক্ষুদ্র।	আয়তন অত্যন্ত বৃহৎ।
২। প্রধানতঃ শিল্পের প্রয়োজনীয়তা বেশী।	কৃষিকার্যের প্রয়োজনীয়তা বেশী।
৩। কৃষিকার্য-প্রসারের উপযোগী বিস্তীর্ণ এলাকা বিদ্যমান নাই।	কৃষিকার্য-প্রসারের জন্য স্থানের কোনও অভাব নাই।
৪। অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ দেশ।	মাঝারি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ

বৃটেন	ভারত
৫। প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষতঃ খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য।	প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষতঃ কৃষিজ সম্পদের প্রাচুর্য বেশী।
৬। জীবনমান অত্যন্ত উন্নত।	জীবনমান অত্যন্ত নিম্ন।
৭। পরিবহণের সুবন্দোবস্ত বিদ্যমান।	পরিবহণ-ব্যবস্থার অভাব।

এইভাবে দেখা যায় দুইটি দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পূর্ণ বিপরীত। বৃটেন তাহার সংস্কৃতি এই দেশে 'রপ্তানি' করার ফলে ভারতের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হইয়াছিল। এই দুইটি দেশে প্রায় একই শুল্ক-নীতি প্রবর্তিত ছিল। কিন্তু ভারত প্রধানতঃ চা ও পাট রপ্তানি করিত এবং বৃটেন ঐ সব দ্রব্য আমদানি করিত। সুতরাং এই দুই দেশের শুল্ক-নীতি কখনই এক হইতে পারে না। অবশ্য চা ও পাট সংক্রান্ত শুল্ক-নীতি বৃটেনের স্বার্থে এবং ভারতের অর্থনীতির প্রতিকূলে রচিত হইত। লোকবসতি সম্বন্ধেও এই দুই দেশে কখনও একই নীতি চলিতে পারে না। বৃটেনে অত্যধিক ঘনবসতি থাকিলেও শিল্পের তুলনায় শ্রমিকের অভাব কখনও কখনও অনুভূত হয়। সেইজন্য এই দেশে শ্রম লাঘব করিবার যন্ত্রপাতি (Labour saving devices) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ভারতে লোকসংখ্যা সম্পদের তুলনায় বেশী বলিয়া এইসব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইলে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া অর্থনীতি বিপর্যস্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রশ্নাবলী

1. What do you mean by Culture? What is the relation between Culture and the Machine?

উঃ—৬৪ পৃঃ—৬৫ পৃঃ হইতে সংস্কৃতির সংজ্ঞা লিখ এবং 'সংস্কৃতি ও যান্ত্রিক যুগ' (৬৭ পৃঃ—৬৮ পৃঃ) লিখ।

2. "Culture is a joint product of Man and Nature."—Elucidate

উঃ—'সংস্কৃতি—মানুষ ও প্রকৃতির যুগ্ম সৃষ্টি' (৬৫ পৃঃ—৬৭ পৃঃ) লিখ।

3. Explain how Culture has helped in the development of agriculture.

উঃ—'সংস্কৃতি ও কৃষিকার্য' (৬৮ পৃঃ—৭০ পৃঃ) লিখ।

4. 'Man is a product of Environment'—Explain this statement with reference to Natural and Cultural Environments.

উঃ—'প্রাকৃতিক পরিবেশ' (৭২ পৃঃ—৭৮ পৃঃ) এবং 'সাংস্কৃতিক পরিবেশ' (৭৮ পৃঃ—৮৩ পৃঃ) হইতে সংক্ষেপে লিখ।

5. Explain the classifications of Cultural Environment as suggested by Bernard.

উঃ—'সাংস্কৃতিক পরিবেশ' (৭৮ পৃঃ—৮০ পৃঃ) লিখ।

6. What do you mean by Direct and Indirect adjustment of Environment ? Explain, with an example, the effect of Culture transfer.

উঃ—'পরিবেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামঞ্জস্য-বিধান' (৮৩ পৃঃ—৮৪ পৃঃ) এবং 'সংস্কৃতির স্থানান্তরের একটি উদাহরণ' (৮৫ পৃঃ—৮৬ পৃঃ) লিখ।

7. Examine the correlation between physical and cultural environment on the one hand and man's economic activity and living standard on the other.

উঃ—'প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের ১ম ও ২য় প্যারাগ্রাফ (৭০ পৃঃ— ৭১ পৃঃ), 'সাংস্কৃতিক পরিবেশ' (৭৮ পৃঃ— ৮৩ পৃঃ) এবং 'পরিবেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামঞ্জস্য বিধান' (৮৩ পৃঃ— ৮৪ পৃঃ) সংক্ষেপে লিখ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৎস্য-চাষ
(Fisheries)

সমুদ্রের অর্থনৈতিক তাৎপর্য (Economic Significance of Sea)—পৃথিবীব্যাপী সাগর-মহাসাগরের অগাধ জলরাশি মানুষের খাদ্য, নানাবিধ কাঁচামাল ও শক্তির বিপুল ভাণ্ডার। পৃথিবীর সমস্ত কলকারখানায় যে পরিমাণ শক্তি ব্যবহৃত হয় তাহা অপেক্ষা বেশী সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা, স্রোত ও ঢেউ হইতে উৎপাদিত হইতে পারে। সমুদ্র হইতে শক্তি উৎপাদনের কারিগরী অসুবিধা হয়তো নিকট-ভবিষ্যতে দূর করা সম্ভব হইবে।

সমুদ্রজল হইতে নানাবিধ **খনিজ পদার্থ** উৎপাদনেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে। বহুদিন ধরিয়া সমুদ্রজল হইতে লবণ উৎপাদন করা হইতেছে। অধিক পরিমাণ সমুদ্রজল একসঙ্গে ব্যবহারের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য আজকাল সমুদ্র হইতে ম্যাগ্‌নেসিয়াম ও ব্রোমিন উৎপাদিত হইতেছে। সমুদ্রজল হইতে ব্রোমিন তৈয়ারীর প্রথম কারখানা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৪ সালে স্থাপিত হয়। সামুদ্রিক উদ্ভিদ্ হইতে আইয়োডিন ও পটাশ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে নিঃসন্দেহে জানা গিয়াছে যে, মহাসমুদ্রের তলদেশে তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং প্রায় সর্বপ্রকারের খনিজ সম্পদ বিপুল পরিমাণে স্তূপীকৃত এবং পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। একদিন হয়তো প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের জন্য মানুষকে ভূগর্ভ হইতে সমুদ্রগর্ভের উপরই অধিক নির্ভর করিতে হইবে।

সমুদ্রের সর্বপ্রাচীন ব্যবহার **মৎস্য** উৎপাদনের জন্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে মানুষের খাদ্যের একাংশ সমুদ্র হইতে সংগ্রহ করা হইতেছে। আজও সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চাউলভোজী জনসাধারণের আমিষজাতীয় খাদ্যের প্রধান উপকরণ মৎস্য। এই সকল দেশে মাংসের ব্যবহার কম। অধিক পশুমাংস-ব্যবহারকারী ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলিতেও দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় মৎস্যের স্থান রহিয়াছে। মেরু অঞ্চলের জনগণের সর্বপ্রধান খাদ্য সামুদ্রিক মৎস্য। সামুদ্রিক মৎস্যে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিবিধ খনিজ লবণ, ভিটামিন ডি ও আইয়োডিন পাওয়া যায়। সেইজন্য

সুষম পুষ্টিকর খাদ্যতালিকায় ইহা অবশ্য প্রয়োজনীয়। নরওয়ে, স্কটল্যাণ্ড, ব্রিটানি, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও লাব্রাডার উপকূল প্রভৃতি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ঊষর ও পর্বতময় বলিয়া কৃষি-উপযোগী ভূমি সামান্য। ফলে জনসংখ্যার একটি বড় অংশ **খাদ্যের উৎস** ও **কর্মসংস্থানের উপায়** হিসাবে সামুদ্রিক মৎস্য-শিকার, নৌ-চালনা ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে। মৎস্য শুধু খাদ্য নহে; ঔষধ, সার প্রভৃতিও সামুদ্রিক মৎস্য হইতে প্রস্তুত হয়। তিমি মাছের চামড়া ও তৈল, বিশেষ জাতীয় সিল মাছের ফার, মুক্তা, প্রবাল, স্পঞ্জ, শঙ্খ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সমুদ্র হইতে সংগ্রহ করা হয়। গ্লিসারিণ, সাবান, বার্নিস প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য তিমির তৈল ব্যবহার করা হয়।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে **যাতায়াত** ও **বাণিজ্যিক আদান-প্রদানে** সমুদ্রের স্থান অনন্য। বৃটেন, জাপান, আইস্‌ল্যাণ্ড, জাভা, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার ন্যায় পৃথিবীর বহু অঞ্চল, দেশ ও মহাদেশ জলভাগের দ্বারা অন্য সমস্ত অঞ্চল হইতে বিচ্ছিন্ন। স্বভাবতঃই এই সকল অঞ্চলের মানুষের পক্ষে বাণিজ্যিক লেনদেন এবং অন্যান্য দেশে যাতায়াতের জন্য স্থলপথের উপায় না থাকায় ও আকাশপথ ব্যয়বহুল হওয়ায় সমুদ্রপথই প্রধান অবলম্বন। নানাকারণে রেলপথ, রাজপথ ও আকাশপথের তুলনায় সমুদ্রপথে যাত্রী ও মাল পরিবহণের খরচ কম। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সকল রকম যাতায়াত-ব্যবস্থার মধ্যে সমুদ্রপথ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

বৃষ্টিপাত ও তুষারগলা জলে ধরণী প্রাণময় ও শস্যশ্যামল হইয়া উঠে, নদী-নালা পুষ্ট হয়। কিন্তু বৃষ্টি ও তুষার বাষ্পীভূত সমুদ্রজলেরই রূপান্তর। সুতরাং **জলবায়ুর** উপর সমুদ্রের প্রভাব অপরিসীম। সমুদ্রতীরস্থ অঞ্চল-গুলির ও সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপপুঞ্জের জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন, স্বাস্থ্যকর ও কঠোর পরিশ্রমের উপযোগী।

মৎস্য-চাষের শ্রেণীবিভাগ (Types of Fisheries)—পৃথিবীর মোট আয়তনের তিনভাগ জল ও একভাগ স্থল। জলভাগের অধিকাংশই সমুদ্র; বাকী অংশ নদী, নালা, খাল, বিল, হ্রদ ইত্যাদি। প্রাচীনকাল হইতে মানুষ জীবনধারণের জন্য এই সকল জলাশয় হইতে মৎস্য ও অন্যান্য জীব সংগ্রহ করিয়া আসিতেছে। বর্তমান যুগে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ হইলেও মৎস্য-চাষ, কৃষি, শিল্প, পশুপালন ইত্যাদির ন্যায় মানুষের অন্যতম অর্থনৈতিক কার্যকলাপ।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত লোকবসতিপূর্ণ সমুদ্রোপকূলে, হ্রদ, নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে মৎস্যশিকার করা হইয়া থাকে। কোন কোন অঞ্চলে মৎস্যশিকার করা হয় শিকারীর নিজের অথবা সীমাবদ্ধ **স্থানীয় অঞ্চলের প্রয়োজন** (Subsistence fishing) মিটাইবার জন্য। তুন্দ্রা অঞ্চলে, উত্তরে সরলবর্গীয় অরণ্য অঞ্চলের মেরু-প্রান্তে, দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ-প্রান্তে ইয়াগান, ওনা প্রভৃতি উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে, উষ্ণমণ্ডলের অধিকাংশ স্থানে প্রধানতঃ স্থানীয় অঞ্চলের ব্যবহারের জন্য মৎস্য শিকার করা হইয়া থাকে। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের বিভিন্ন স্থানেও অবসর সময়ে উপার্জন-বৃদ্ধির বা চিত্ত-বিনোদনের জন্য মৎস্যশিকার করা হয়। এইভাবে প্রতিবৎসর পৃথিবীতে মোট কি পরিমাণ মৎস্যশিকার করা হয় এবং তাহার মোট মূল্য কত তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব।

প্রধানতঃ আভ্যন্তরীণ ও বিদেশের বাজারে বিক্রয়ের জন্য যে মস্য-শিকার করা হয়, তাহাকে **বাণিজ্যিক মৎস্য-চাষ** (Commercial Fishing) বলে। স্থলভাগের অভ্যন্তরস্থ নদী-নালা, খাল-বিল, হ্রদ প্রভৃতির স্বাদুজলে যে মৎস্য-চাষ হইয়া থাকে, তাহাকে **স্বাদুজলের মৎস্য-চাষ** (**Fresh-water fishing**) বলা হয়। আবার সমুদ্রতীরে, গভীর সমুদ্রে ও সমুদ্র-চড়ায় যে মৎস্য-চাষ করা হয়, তাহা **সামুদ্রিক মৎস্য-চাষ** (Sea-fishing) নামে পরিচিত। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে সামুদ্রিক মৎস্য-চাষ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও সুসংগঠিত। পৃথিবীর মোট মৎস্য-উৎপাদনের তিন-চতুর্থাংশ সমুদ্র হইতে উত্তোলিত হয়।

বাণিজ্যিক মৎস্য-শিকারের বিভিন্ন পদ্ধতি (Diverse methods of Commercial Fishing)—কাষ্ঠ ও লৌহনির্মিত নানা আকৃতি ও গঠন-ভঙ্গীর ডিঙ্গা, নৌকা ও জাহাজে করিয়া মৎস্য-শিকার করা হয়। এই সকল জলযান দাঁড়, পাল, কয়লা বা তৈলের সাহায্যে চালানো হইয়া থাকে। মৎস্য-শিকারের পদ্ধতিও নানারকম। ইহাদের মধ্যে তিনটি প্রধান: (১) **ড্রিফ্‌ট্ নেট** (Drift net) প্রথায় নৌকা বা ট্রলারের সামনে জলের মধ্যে পর্দার মতো জাল ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। জলের উপরের স্তরে ভ্রমণকারী মৎস্য এই জালে ধরা পড়ে। হেরিং বা ম্যাকারেল জাতীয় মৎস্যের মতো যে সকল মৎস্য ঝাঁক বাঁধিয়া (Shoal fish) বেড়ায়, প্রধানতঃ সেইগুলি ধরিবার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। (২) **ট্রল নেট** (**Trawl net**) বা টানা-জাল

পদ্ধতি সমুদ্রের তলদেশে বিচরণকারী মৎস্য ধরিবার জন্য প্রয়োগ করা হয়। বড় থলিয়ার মতো জালে বিশেষ উপায়ে মুখ খোলা রাখিয়া সমুদ্রের তলদেশের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। স্বভাবতঃই অগভীর সমুদ্র ভিন্ন এই পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব নহে এবং মগ্ন পাহাড় বা ভাঙ্গা জাহাজ ডুবিয়া থাকিলে এই পদ্ধতিতে বিপদের সম্ভাবনাও আছে। (৩) **লং লাইন** (Long line) প্রথায় একটি লম্বা মোটা তার বা দড়ি হইতে অনেকগুলি বঁড়সি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। এই সকল বঁড়সিতে আধার (মাছের খাদ্য) গাঁথা থাকে। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের সমুদ্রোপকূলে এই পদ্ধতিতে কড্ মাছ ধরা হয়। এই তিনটি পদ্ধতি ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মৎস্য আহরণের জন্য আরও পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে।

বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রসমূহের উন্নতির কারণ (Factors of Commercial Development)—সামুদ্রিক মৎস্য-শিল্পের উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় কয়েকটি প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণের একত্র সমাবেশের ফলেই গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যক্ষেত্র গড়িয়া ওঠে।

(ক) প্রাকৃতিক কারণসমূহ (Physical Factors)—বিস্তীর্ণ অগভীর সমুদ্র ও মগ্ন চড়া, ভগ্ন তটরেখা, মৎস্যের খাদ্যের প্রাচুর্য, অনুকূল জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, ব্যবহারোপযোগী অরণ্যসম্পদের নৈকট্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণসমূহের একত্র সমাবেশ মৎস্য-শিল্পের উন্নতির মৌলিক কারণ। প্রাকৃতিক কারণসমূহ নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইল :—

(১) অগভীর সমুদ্র ও মগ্ন চড়া (Shallow Seas and Banks)—উত্তর আমেরিকা, উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, চীন, জাপান ও রাশিয়ার সমুদ্র-উপকূলে বিস্তীর্ণ মহীসোপান রহিয়াছে। এই সকল মহীসোপানের সমস্ত অংশে মৎস্য-শিকার না হইলেও বিশেষ করিয়া অগভীর সমুদ্রখাঁড়ি ও মগ্ন চড়া অঞ্চলে মৎস্য-চাষ বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। উত্তর আমেরিকার আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপকূলে এই ধরনের মগ্ন চড়ার মোট আয়তন প্রায় ৪০ হাজার বর্গ-কিলোমিটার। ইউরোপে উত্তর সাগর এবং আইস্ল্যাণ্ড, ফিরি দ্বীপপুঞ্জ (Faeroe Islands) ও লফোটেন দ্বীপপুঞ্জের (Lofoten Islands) সন্নিহিত সামুদ্রিক চড়ার মোট আয়তন প্রায় ১·২ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার। পূর্ব এশিয়ায় ৪৫ হাজার বর্গ-কিলোমিটারেরও অধিক

সামুদ্রিক চড়া রহিয়াছে। চড়াগুলির নরম, ঢালু উপরিভাগ মৎস্য ধরিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহাদের অনেকগুলি তীরভূমির নিকটেই অবস্থিত। উত্তর সাগরে অবস্থিত মৎস্যসমৃদ্ধ বিখ্যাত ডগার্স ব্যাঙ্ক (Doggers Bank) স্থলভাগ হইতে মাত্র ১৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্কের (Grand Bank) কেন্দ্রস্থল হইতে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের দূরত্ব ২৯০ কিলোমিটার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্নিহিত জর্জেস ব্যাঙ্ক (Georges Bank) হইতে বোস্টন বা পোর্টল্যাণ্ড বন্দরের দূরত্ব মাত্র ২৭০ কিলোমিটার।

(২) **সৈকতরেখা (The Coast-line)**—মৎস্য-শিল্পে সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলির ভগ্ন সৈকতরেখা এই শিল্পের উন্নতিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, জাপান ও রাশিয়ার তটরেখা ভগ্ন হওয়ায় অসংখ্য সমুদ্রখাঁড়ির সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল খাঁড়ি স্বাভাবিক বন্দর ও পোতাশ্রয় গড়িয়া উঠিবার পক্ষে অত্যন্ত- অনুকূল। ধৃত মৎস্য দেশ-বিদেশে পাঠাইবার জন্য, ঝড়-তুফানের সময় মৎস্যশিকারে নিযুক্ত নৌকা, জাহাজ প্রভৃতির নিরাপদ আশ্রয়-গ্রহণের জন্য ও অন্যান্য প্রয়োজনে মৎস্য-শিল্পের পক্ষে বন্দর ও পোতাশ্রয় একান্ত প্রয়োজন। কোন কোন মৎস্য নদীর মুখে ও অগভীর সমুদ্রখাঁড়িতে ডিম পাড়ে। ফলে ভগ্ন সমুদ্রতীরে এই সকল মৎস্য অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। দীর্ঘ সৈকতরেখা দেশের অধিকসংখ্যক মানুষকে সমুদ্রের সংস্পর্শে আনে। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের শতকরা ৯০ ভাগ অধিবাসী সমুদ্রতীরে বাস করে। লাব্রাডারের প্রায় সমস্ত এবং নরওয়ের জনসংখ্যার বৃহদংশ সমুদ্রতীরের অধিবাসী।

(৩) **জলের প্রকৃতি (Character of the Waters)**—প্রধান প্রধান মৎস্যক্ষেত্রগুলির জলের গভীরতা, প্রবাহ, তাপমাত্রা ইত্যাদি মৎস্যের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য এবং মৎস্যশিকারের সুবিধা ও পদ্ধতির উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পূর্বে বলা হইয়াছে, অগভীর সমুদ্রেই মৎস্যশিকার সম্ভব। মোটামুটিভাবে ২০০ মিটার পর্যন্ত গভীর জলে সুবিধাজনকভাবে মৎস্যশিকার করা যায়। অবশ্য কোথাও কোথাও অধিকতর গভীর জলেও মৎস্যশিকার করা হইয়া থাকে। ৬০০ মিটার গভীর সমুদ্রে হ্যালিবাট ধরা হয়। উত্তর আমেরিকা, উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, জাপান ও রাশিয়ার সমুদ্র-উপকূল ও সমুদ্র মধ্যে অবস্থিত মগ্ন চড়াগুলির গভীরতা অধিকাংশ স্থলেই মৎস্যচাষের উপযোগী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকটবর্তী জর্জেস ব্যাঙ্কে জলের গভীরতা

গড়ে ১৫ হইতে ৩০ মিটার। গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্কের অধিকাংশ স্থলেই জল ৯০ মিটারের কম গভীর। ইউরোপের ডগার্স ব্যাঙ্কে জলের গভীরতা ১৩ হইতে ৩০ মিটার। অগভীর জলে সূর্যের আলো ও উত্তাপ সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে।

চড়াগুলির উপর প্রতিনিয়ত বিভিন্ন তাপমাত্রা ও রাসায়নিক গুণ-বিশিষ্ট জলের স্রোত আসিয়া মিলিত হইতেছে। উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে শীতল লাব্রাডার স্রোত উপসাগরীয় স্রোতের সহিত মিলিত হইতেছে। উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত আটলান্টিক স্রোতের সহিত মিশিয়া উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের উপকূল ধরিয়া উত্তর নরওয়ে পর্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। ইহার তলদেশ দিয়া উত্তর হইতে আবার প্রবাহিত হইতেছে শীতল আর্কটিক স্রোত। অনুরূপভাবে এশিয়ার পূর্ব উপকূলে শীতল কাম্চাট্কা স্রোতের সহিত উষ্ণ জাপান স্রোতের মিলন ঘটিতেছে। ইহা ছাড়া এই সকল অঞ্চলের সমুদ্রে অসংখ্য নদী প্রচুর পরিমাণ জলরাশি আনিয়া ঢালিতেছে। এই জলে নাইট্রোজেন ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ থাকায় ইহা মৎস্য ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদের পুষ্টির পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

(৪) **প্ল্যাঙ্কটন (Plankton)**—মৎস্যের খাদ্য হিসাবে বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ, বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণীর ডিম ও লার্ভা এবং ক্ষুদ্র মৎস্য ব্যবহৃত হইলেও ইহার প্রধান খাদ্য প্ল্যাঙ্কটন। প্ল্যাঙ্কটন সমুদ্রজলে ভাসমান এক-প্রকার অতিক্ষুদ্র উদ্ভিদ (Phytoplankton) ও প্রাণী (Zooplankton)। সমুদ্রে কোথায় কি পরিমাণ প্ল্যাঙ্কটন পাওয়া যাইবে তাহা প্রধানতঃ সূর্যালোক, সমুদ্রস্রোত, উপরের জলের সহিত তলদেশের জলের মিশ্রণ, জলের রাসায়নিক উপাদান প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। উদ্ভিদজাতীয় প্ল্যাঙ্কটনের জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধির জন্য সূর্যকিরণ প্রয়োজন। ২০০ মিটার গভীর জল পর্যন্ত সূর্যের আলো প্রবেশ করিতে পারে। এইজন্য এইরূপ গভীরতার মধ্যে অধিক মৎস্য পাওয়া যায়। সমুদ্রোপকূলের নিকটেই সাধারণতঃ প্ল্যাঙ্কটনের বংশবৃদ্ধির হার অধিক। কারণ এখানে নদীগুলি প্ল্যাঙ্কটনের বৃদ্ধির সহায়ক বিভিন্ন খনিজ পদার্থ বিশেষ করিয়া নাইট্রেট ও ফস্ফেট জাতীয় লবণ বহন করিয়া আনে। তাহা ছাড়া এই সকল অঞ্চলে বিরুদ্ধাভিমুখী জলস্রোতের মিলনের ফলে প্রতিনিয়ত জল ওঠানামা করে বলিয়া প্রয়োজনীয় যথেষ্ট পরিমাণ খনিজ লবণ জলের উপরের স্তরে পাওয়া যায়। ইহার জন্য উষ্ণ ও

শীতল স্রোতের সঙ্গমস্থলে বিশেষ করিয়া মগ্ন চড়াগুলির উপর প্ল্যাঙ্কটনের প্রাচুর্য দেখা যায়। ফলে মৎস্যও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

(৫) নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু (Temperate Climate)—পৃথিবীর বৃহৎ মৎস্যক্ষেত্রগুলির শীতল জলবায়ু বোধহয় ইহাদের মৎস্য-শিল্পে উন্নতির প্রধান কারণ। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সমুদ্রের উষ্ণমণ্ডলের সমুদ্রের তুলনায় খাদ্যোপযোগী মৎস্য অনেক বেশী পাওয়া যায়। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের মৎস্য সুস্বাদু। শীতল জলবায়ুতে মৎস্য অধিকক্ষণ টাটকা থাকে। সুতরাং সমুদ্রে মৎস্য ধরিয়া ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার বা মৎস্য কাটিয়া লবণ মাখাইয়া কৌটায় ভর্তি করিবার বা শুকাইবার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। শীতকালে এই সকল অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবে যথেষ্ট পরিমাণ বরফ পাওয়া যায় বলিয়া মৎস্য-সংরক্ষণের খরচও কম। নীতিশীতোষ্ণ জলবায়ু প্ল্যাঙ্কটনের সংখ্যাবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। শীতল জলবায়ুর প্রভাবে এখানকার ধীবরগণ অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু হইয়া থাকে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সরল-বর্গীয় ও পর্ণমোচী বৃক্ষসমূহ ধীবরগণের মৎস্য ধরিবার নৌকা, ট্রলার ও জাহাজ নির্মাণে সাহায্য করে। মৎস্যক্ষেত্রগুলির উত্তরাংশে গ্রীষ্মকাল হ্রস্ব ও গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা কম হওয়ায় কৃষিকার্য সীমাবদ্ধ। দীর্ঘ শীতকালে তুষারপাত হয় বলিয়া এই সকল অঞ্চলে গৃহপালিত পশুর খাদ্য মজুত করিয়া রাখিতে হয়। ফলে পশুপালনও সীমাবদ্ধ। এই সকল কারণে এই অঞ্চল-গুলিতে খাদ্য হিসাবে মৎস্যের চাহিদা অনেক বেশী।

(৬) ভূ-প্রকৃতি (Character of the Land)—বৃহৎ মৎস্যক্ষেত্রগুলির সন্নিকটস্থ দেশসমূহের ভূ-প্রকৃতি কৃষিকার্য ও পশুপালনের উপযোগী নহে। নরওয়ের মোট আয়তনের শতকরা মাত্র ৪ ভাগ জমিতে কৃষিকার্য ও পশুপালন করা হয়। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের শতকরা '৫ ভাগ জমিতে কৃষিকার্য হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেইন রাজ্যের শতকরা ৭'৬ ভাগ জমিতে কৃষিকার্য ও ৮'২ ভাগ জমিতে পশুপালন করা হইয়া থাকে। কানাডার নোভাস্কোশিয়া ও নিউ ব্রান্সউইকের শতকরা ১১ ভাগ জমিতে কৃষিকার্য ও পশুপালন করা হইয়া থাকে। স্কটল্যাণ্ড ও জাপানে কৃষিকার্য হয় ঐ দেশগুলির মোট আয়তনের মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ জমিতে। ফলে এই সকল অঞ্চলের অধিবাসিগণের একাংশ খাদ্য ও জীবিকার জন্য সমুদ্রের উপর নির্ভর করিয়াছে।

প্ল্যাঙ্কটনের প্রাচুর্য, উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলন, প্রচুর সূর্যকিরণ, জলের লঘু আপেক্ষিক গুরুত্ব (Low specific gravity) ও সমুদ্রতলের অনুকূল গঠনের ফলে উত্তর আটলান্টিক ও উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের মৎস্যক্ষেত্রগুলিতে প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন জাতের মৎস্য আসে ও ডিম পড়ে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন জাতের **ডিম প্রসব** করিবার ক্ষমতা বিস্ময়কর। কড্, টারবট, প্লেইস বা হেক জাতের একটি মৎস্য বৎসরে ৫০ লক্ষ হইতে ১ কোটি ডিম পাড়ে। সোল, ম্যাকারেল বা হ্যালিবাট জাতের একটি মাছ ডিম পাড়ে বৎসরে ১ লক্ষ হইতে ১০ লক্ষ। অধিকাংশ জাতের মৎস্য আবার বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘোরাফেরা করে এবং সেই অনুযায়ী তাহাদের ধরিবার ব্যবস্থা হয়। সামুদ্রিক মৎস্য প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত: (১) অল্প জলে বসবাসকারী মৎস্য (Pelagic fish); ইহাদের অধিকাংশ ঝাঁক বাঁধিয়া চলে। (২) গভীর জলে বিচরণকারী মৎস্য (Demersal fish)। অগভীর সমুদ্রের মৎস্যের মধ্যে হেরিং ও ম্যাকারেল প্রধান। গভীর জলের মৎস্যের মধ্যে প্রধান হইল কড্। কি ধরনের মৎস্য ধরা হইবে, গভীর না অল্পজলের, তাহার উপর ধরিবার পদ্ধতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি নির্ভর করে। গভীর-জলের মৎস্য ধরিবার জাহাজগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতির এবং অধিকক্ষণ সমুদ্রে থাকিবার উপযোগী; এই সকল জাহাজ বৃহৎ জাল টানিবার ক্ষমতা-সম্পন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। অল্পজলের মৎস্য একসঙ্গে এক জাতেরই ধরা হয়; কিন্তু গভীরজলের মৎস্য একসঙ্গে বহু জাতের ধরা হইয়া থাকে।

(খ) অর্থনৈতিক কারণসমূহ (Economic Factors)—উল্লিখিত প্রাকৃতিক উপাদানগুলি পৃথিবীর বৃহৎ মৎস্যক্ষেত্রগুলির উন্নতির মৌলিক কারণ হইলেও বিভিন্ন অর্থনৈতিক কারণও এই সকল অঞ্চলের মৎস্যশিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করিয়াছে। কোটি কোটি টাকা **মূলধন** লইয়া গঠিত বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এই সকল অঞ্চলে মৎস্য-শিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান মৎস্য-শিকারের জন্য শুধু যন্ত্রচালিত জাহাজই নহে, এরোপ্লেন, জলের মধ্যে মৎস্যের অস্তিত্ব জানিবার ইলেকট্রনিক যন্ত্র, রেডিও, হিমায়ন যন্ত্র ইত্যাদি আধুনিক বৈজ্ঞানিক **যন্ত্রপাতি** ও সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার ফলে মৎস্য-শিল্প প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। গ্রীম্স্‌বি, হাল, লণ্ডন, ইয়ার-মাউথ, এবারডিন, সেণ্ট জন্স্, হ্যালিফাক্স,

বোস্টন, নিউ বেডফোর্ড, ভ্যাঙ্কুভার, লস্ এঞ্জেলস্, সান ডিয়েগো, মন্টিরে, বার্গেন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট **বন্দর** মৎস্য-শিল্পের বৃহৎ সুসংগঠিত কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। সমুদ্রতীরস্থ এই সকল কেন্দ্র হইতে অভ্যন্তরভাগের বাজারগুলিতে দ্রুত যাতায়াতের জন্য রেলপথ, রাজপথ ও জলপথের চমৎকার **পরিবহণ-ব্যবস্থা** রহিয়াছে। ধৃত মৎস্য মজুত রাখিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা-সমন্বিত বিরাট বিরাট গুদামঘর নির্মিত হইয়াছে। মৎস্য শুকাইবার, লবণ মাখাইবার, কৌটাভর্তি করিবার ও জমাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। কোনও মৎস্য যাহাতে নষ্ট না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মাছের কাঁটা, হাড় ও অন্যান্য অংশ হইতে কৃষি-সার তৈয়ারীর এবং মৎস্যের তৈল বাহির করিয়া সেই তৈল হইতে বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

বৃহৎ মৎস্যক্ষেত্রগুলির অনেক স্থানেই লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। জাপানে প্রতিবর্গ-কিলোমিটারে ২৫ জন লোক বাস করে। বেলজিয়ামে বাস করে ২৮০ জন, ইংল্যাণ্ড ও রোড আইল্যাণ্ডে বাস করে যথাক্রমে ৩০৫ ও ২৮৮ জন। এই সকল দেশের সমুদ্রোপকূলের অনেক জায়গায় লোকবসতি অপেক্ষাকৃত বেশী ঘন; ইহার জলে মৎস্যের **চাহিদা** অধিক। ধর্মীয় সংস্কারের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার ক্যাথলিক জনসাধারণের পক্ষে বৎসরের কোন কোন দিন মাংসাহার নিষিদ্ধ। জাপান ও চীনের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী জনসাধারণের অনেকে গোমাংস ও শূকরমাংস গ্রহণ করে না। ফলে ধর্মীয় কারণে এই সকল দেশে মৎস্যের চাহিদা অধিক। ঘন লোকবসতি, কৃষি ও পশুপালনের উপযোগী ভূমির অভাব ও শীতল জলবায়ুর একত্র সমাবেশ এই সকল অঞ্চলে মৎস্য অপেক্ষা মাংস অধিক ব্যয়সাপেক্ষ। স্বভাবতঃই দেহগঠনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় আমিষজাতীয় খাদ্যের জন্য জনসাধারণ অনেকাংশে মৎস্যের উপর নির্ভর করিয়াছে।

পৃথিবীর মৎস্যক্ষেত্রসমূহ (Fisheries of the World)—পৃথিবীর মৎস্যের মোট উৎপাদন প্রায় ২ কোটি ৮০ লক্ষ মেঃ টন। ইহার অধিকাংশই সামুদ্রিক মৎস্য। সমুদ্রোপকূলের দেশসমূহ সাধারণতঃ মৎস্যশিকারে উন্নতি লাভ করিয়াছে।

পৃথিবীর মৎস্য-উত্তোলন

(লক্ষ মেঃ টন)

জাপান		নরওয়ে	১৪
চীন	৩০	ভারত	১১
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	২৭	কানাডা	১০
রাশিয়া	২৬	বৃটেন	১০

পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে মৎস্য শিকার করা হইলেও বাণিজ্যিক হারে মৎস্য-চাষ প্রধানতঃ নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহে সামাবদ্ধ :

(ক) চীন ও জাপানের তীরবর্তী অঞ্চল—দক্ষিণ চীন হইতে উত্তর কামচাট্কা পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। ইহার মধ্যে জাপানের সমুদ্রোপকূল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। উষ্ণ কুরোসিও ও শীতল কিউরাইল স্রোতের মিলন, ভগ্ন উপকূল, খাদ্যোপযোগী মৎস্যের প্রাচুর্য প্রভৃতি কারণে এই অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। সাখালিন ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের চতুর্দিকে প্রচুর পরিমাণে হেরিং, ট্রাউট, স্যামন, কড্ ও কাঁকড়া পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এখান হইতে কৌটাভর্তি কাঁকড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হইত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে এই দুইটি অঞ্চল (সাখালিন ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ) রাশিয়ার অধীনে আসিয়াছে। পূর্ব সাইবেরিয়ার সমুদ্রোপকূলে ও নদীসমূহে প্রচুর স্যামন মৎস্য পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের মৎস্যক্ষেত্র ক্রমেই উত্তরদিকে সরিয়া যাইতেছে। জাপানের চতুর্দিকের সমুদ্রে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য পাওয়া যায় এবং এই দেশে মাংস-প্রদায়ী পশু নাই বলিলেই চলে। ফলে জাপানের অধিবাসিগণ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মৎস্য শিকার ও আহার করিয়া থাকে। জাপানের সমুদ্রে পিলকার্ড, ম্যাকারেল, হেরিং, কড্, পোলক, বোনিটো, টুনা, কাট্ল ফিস, ঝিনুক, চিংড়ি, কাঁকড়া, হাঙ্গর, এমনকি অক্টোপাস পর্যন্ত ধরা হয়। অখাদ্য মৎস্য নষ্ট না করিয়া সার প্রভৃতি তৈয়ারীর কাজে ব্যবহার করা হয়। চীন সামুদ্রিক মৎস্য-শিল্পে দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। দক্ষিণ চীন সাগর হইতে পীত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলে প্রচুর মৎস্য ধরা হয়।

(খ) উত্তর-পুর্ব আটলান্টিক উপকূল—স্পেনের উত্তর উপকূল হইতে শুরু করিয়া রাশিয়ার উত্তরে অবস্থিত শ্বেত সাগর (White Sea) পর্যন্ত

এই অঞ্চল বিস্তৃত। ইহা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৎস্যক্ষেত্র। প্রতিবৎসর গড়ে ৬০ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য এখানে ধরা হয়। ধৃত মৎস্যের মধ্যে কড্, হেরিং, হ্যাডক ও ম্যাকারেল প্রধান। উত্তর সাগরে সর্বাধিক পরিমাণে মৎস্য শিকার করা হয়। এই সাগরে অসংখ্য অগভীর চড়া (Bank) রহিয়াছে এবং চতুর্দিকে ঘন লোকবসতিপূর্ণ বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, জার্মানী, নরওয়ে ও সুইডেন অবস্থিত। উত্তর সাগরের ডগার্স ব্যাঙ্ক হইতে নরওয়ে ও বৃটেন সর্বাধিক মৎস্য শিকার করে। বৃটেনের গ্রীম্‌স্‌বি পৃথিবীর
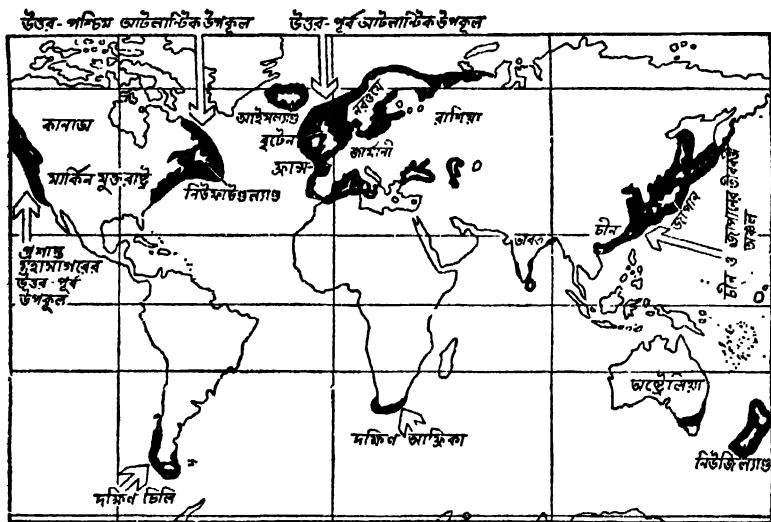
পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎস্যক্ষেত্রসমূহ

শ্রেষ্ঠ মৎস্যের বাজার। পৃথিবীর মধ্যে নরওয়ে ও আইস্‌ল্যাণ্ডের অর্থনীতি মৎস্যশিকার ও মৎস্য-ব্যবসায়ের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভরশীল। প্রায় ১,১৫,০০০ নরওয়েবাসী মৎস্যশিকারে নিযুক্ত। মাথা-পিছু মৎস্যশিকারে আইস্‌ল্যাণ্ড শ্রেষ্ঠ—বাৎসরিক প্রায় ৩,২০০ কিলোগ্রাম। এই দেশের মোট রপ্তানির শতকরা ৯৫ ভাগ মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য।

(গ) উত্তর-পশ্চিম আটলান্টিক উপকূল—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ক্যারোলিনা রাজ্যের হ্যাটেরাস অন্তরীপ (Cape Hatteras) হইতে আরম্ভ করিয়া লাব্রাডারের উত্তর উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চলের সমুদ্রে

মৎস্য আহরণের উপযোগী অসংখ্য অগভীর চড়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের উপকূলবর্তী গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক সর্ববৃহৎ। উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের সহিত শীতল লাব্রাডার স্রোতের মিলন হওয়ায় এখানে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে ধৃত মৎস্যের মধ্যে হ্যাড্ডক, রোজ ফিস, ফাউণ্ডার, কড্, হোয়াইটিং, হেরিং, হ্যালিবাট, পোলক এবং হেক প্রধান; চিংড়ি প্রভৃতি মৎস্যও এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঝিনুক, স্যাড ও ক্র্যাম ধরা হইয়া থাকে। আটলাণ্টিক উপকূলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মৎস্য-বন্দর বোস্টন, গ্লুসেস্টার, পোর্টল্যাণ্ড ও নিউ ইয়র্ক, কানাডার সেন্ট জন, হ্যালিফাক্স এবং লুনেনবার্গ মৎস্য-শিল্প ও মৎস্য-রপ্তানির জন্য বিখ্যাত।

(ঘ) প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পূর্ব উপকূল—উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যের উত্তরাংশ হইতে শুরু করিয়া বেরিং সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চলের মহীসোপান উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলের তুলনায় সংকীর্ণ। এখানে স্যামন, হ্যালিবাট, সার্ডিন, পিলকার্ড, টুনা, হেরিং, সোল, কড্ প্রভৃতি মাছ ধরা হয়। এই অঞ্চল হইতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবৎসর গড়ে ১·২ লক্ষ মেঃ টন এবং কানাডার বৃটিশ কলম্বিয়ায় ৬০ হাজার হইতে ৯০ হাজার মেঃ টন স্যামন মৎস্য ধরা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা হইতে প্রচুর পরিমাণে কৌটাভর্তি স্যামন বিদেশে রপ্তানি করা হয়। পৃথিবীর অর্ধেক হ্যালিবাট এই অঞ্চলের সমুদ্রে ধরা হয়। হ্যালিভার তৈল এখানকার গুরুত্বপূর্ণ উপজাত দ্রব্য। এখানে ঝিনুক-শিল্পও উন্নতি লাভ করিয়াছে। বেরিং সাগরে অবস্থিত প্রিবিলফ দ্বীপপুঞ্জ পৃথিবীর বৃহত্তম ফার-সিল (Fur-Seal) শিকারের ক্ষেত্র। এই অঞ্চলে কানাডার ভ্যাঙ্কুভার ও প্রিন্স রুপার্ট এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াট্‌ল্, লস্ এঞ্জেল্‌স্, সান ডিয়েগো ও মন্‌টিরে প্রধান মৎস্য-বন্দর। মন্‌টিরে পৃথিবীর সার্ডিন-রাজধানী নামে খ্যাত (Sardine Capital of the World)।

উল্লিখিত চারিটি উল্লেখযোগ্য মৎস্যক্ষেত্র ছাড়াও দক্ষিণ আমেরিকায় **চিলির** দক্ষিণাংশের সমুদ্রোপকূল, **দক্ষিণ আফ্রিকার** দক্ষিণাংশ ও দক্ষিণ **অস্ট্রেলিয়া** ও **নিউজিল্যাণ্ডের** সমুদ্রোপকূল উল্লেখযোগ্য মৎস্যক্ষেত্র।

পৃথিবীর প্রধান চারিটি মৎস্যক্ষেত্রে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক মৎস্যশিকারে নিযুক্ত। ইহা ছাড়া আরও বহুলোক মৎস্যশিকারের আনুষঙ্গিক শিল্পে (মৎস্য শিকারের জন্য প্রয়োজনীয় নৌকা ও জাহাজ-নির্মাণ ও মেরামত, মৎস্য-

শিকারের অন্যান্য সরঞ্জাম প্রস্তুত, মৎস্যবিক্রয়, কৌটাভর্তি ও গুদামজাত করা প্রভৃতি কার্যে) নিযুক্ত। প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান, রাশিয়া ও চীন, পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরে কানাডা (বিশেষ করিয়া লাব্রাডার ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড) ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (বিশেষ করিয়া নিউ ইংল্যাণ্ড রাজ্য-সমূহ) এবং পূর্ব আটলান্টিক মহাসাগরে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ মৎস্যশিকারে নিযুক্ত। বৃটেন, ফ্রান্স, নরওয়ে, জার্মানী ও পর্তুগাল হইতেও ধীবরগণ পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরে মৎস্য শিকার করিতে আসে।

ক্রান্তীয় মণ্ডলে মৎস্য-চাষ (Fishing in the Tropics)—উপরের আলোচনা হইতে ইহা লক্ষ্য করা যায় যে, গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রগুলি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। ক্রান্তীয় মণ্ডলের সমুদ্রে বাণিজ্যিক মৎস্য-চাষ উন্নতি লাভ করে নাই। ক্রান্তীয় মণ্ডলে মৎস্য-চাষ নিম্নলিখিত কারণে উন্নতি লাভ করে নাই :—

(ক) অগভীর সমুদ্রখাঁড়ি, মহীসোপান ও সমুদ্রচড়া মৎস্যের প্রধান বিচরণক্ষেত্র। ক্রান্তীয় মণ্ডলে মহীসোপান ও সমুদ্রচড়ার পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। ক্রান্তীয় মণ্ডলে অবস্থিত ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশের তীরভাগ বিশেষ ভগ্ন নহে। ইহার ফলে স্বাভাবিকভাবে বন্দর গড়িয়া উঠিবার সুযোগ কম এবং ইহা মৎস্যশিল্পের উন্নতিতেও বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।

(খ) মৎস্যের প্রধান খাদ্য প্ল্যাঙ্কটন। অগভীর সমুদ্রে, শীতল আবহাওয়ায়, উষ্ণ ও শীতল স্রোতের সঙ্গমস্থলে প্ল্যাঙ্কটনের বংশবৃদ্ধি ঘটে। ক্রান্তীয় মণ্ডলের সমুদ্রে এই সকল অনুকূল অবস্থা না থাকায় প্ল্যাঙ্কটনের পরিমাণ কম। ফলে মৎস্য ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের তুলনায় কম পাওয়া যায়।

(গ) ক্রান্তীয় মণ্ডলের সমুদ্রে বিচরণকারী অনেক জাতের মাছ খাদ্যোপ-যোগী নয়। তাহা ছাড়া এখানে এক জাতের মাছ একসঙ্গে অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায় না বলিয়া বাণিজ্যিক হারে মৎস্য-আহরণ অসুবিধাজনক।

(ঘ) ক্রান্তীয় মণ্ডলের উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু নানাদিক দিয়া মৎস্য-চাষের অনুকূল নয়। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় মাছ শীঘ্র পচিয়া যায়। ফলে সমুদ্রে মাছ ধরিয়া দূরবর্তী অঞ্চলে পাঠানো অসুবিধাজনক এবং মৎস্য-সংরক্ষণের খরচও বেশী। এইরূপ জলবায়ু কঠোর পরিশ্রমের অনুকূল নয়। ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলের সমুদ্র বর্ষাকালে অধিকাংশ দিন নৌকা, ছোট জাহাজ প্রভৃতি চলাচলের পক্ষে বিশেষ নিরাপদ নয়।

(ঙ) ক্রান্তীয় মণ্ডলের দেশগুলি অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান নিম্ন, ফলে মৎস্যের চাহিদা কম।

(চ) এই সকল দেশে মূলধনের সরবরাহ কম বলিয়া জাপান ও পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির ন্যায় মৎস্য-ব্যবসায়ের জন্য ব্যয়বহুল, আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত বৃহদাকার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। আফ্রিকা এমনকি ভারতবর্ষের মতো দেশেও মৎস্যশিকারের জন্য বিমানপোত, রেডিও ইলেকট্রনিক যন্ত্র প্রভৃতি ব্যবহারের কথা এখনও আমরা ভাবিতে পারি না। হিমায়ন যন্ত্রের ব্যবহারও প্রয়োজনানুরূপ প্রসার লাভ করে নাই।

(ছ) মৎস্যশিল্পের উন্নতির জন্য বন্দর অঞ্চল হইতে দেশের অভ্যন্তরভাগে যাতায়াতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রয়োজন, ক্রান্তীয় মণ্ডলের দেশগুলিতে যাতায়াত-ব্যবস্থা এখনও উন্নত নয়।

(জ) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের দেশগুলিতে মাছ খাদ্যহিসাবে ব্যবহার করা ছাড়াও অখাদ্য মাছ হইতে সার, তৈল, চামড়া প্রস্তুত করা হয়। মাছের তৈল হইতে নানাপ্রকার ঔষধ (যথা, কডলিভার অয়েল, শার্কলিভার অয়েল ইত্যাদি), সাবান, বার্নিস ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। মাছের কাঁটা, আঁইশ প্রভৃতিও বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ক্রান্তীয় মণ্ডলে ধৃত মৎস্যের এইরূপ সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পপ্রসার ঘটে নাই।

(ঝ) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের তুলনায় ক্রান্তীয় মণ্ডলের দেশগুলিতে মৎস্য-গবেষণার ব্যবস্থা অনুন্নত।

ক্রান্তীয় মণ্ডলের সমুদ্রে মৎস্য-চাষের উন্নতির জন্য ইদানীং কিছু কিছু চেষ্টা করা হইতেছে। ভারতবর্ষ ও সিংহল ইহার জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। ভারতে সরকারী উদ্যোগে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরিবার চেষ্টা হইয়াছে। সরকার ধীবরগণকে ঋণদান করিয়া, ধীবর সমবায় গঠন করিয়া এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মৎস্য-গবেষণাগার গড়িয়া তোলা হইয়াছে।

বাণিজ্য (Trade)—দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়া অধিকাংশ উৎপাদনকারী দেশ মৎস্য রপ্তানি করিতে পারে না। সেইজন্য মৎস্যের উৎপাদনের তুলনায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ অনেক কম। কানাডা, নরওয়ে, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আইস্ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ মৎস্য

রপ্তানি করে। আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে স্পেন, পর্তুগাল, ইটালি, জার্মানী ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মৎস্যচাষের ভবিষ্যৎ (The Future of the Fisheries)—অরণ্য-সম্পদের ন্যায় মৎস্যসম্পদও প্রবহমান সম্পদ (Flow Resource)। কোন অঞ্চলের মৎস্যসম্পদ ব্যবহার করিতে থাকিলে অরণ্যের ন্যায় স্বাভাবিকভাবে ধীরে ধীরে উহার পূরণ হইতে থাকে। কিন্তু এ পর্যন্ত মানুষ বিভিন্ন অঞ্চলের সমুদ্র হইতে যে হারে মৎস্য সংগ্রহ করিয়াছে, স্বাভাবিক ভাবে নূতন মৎস্যের সৃষ্টি তাহা অপেক্ষা কম হারে হইয়াছে। ফলে দীর্ঘদিন ব্যবহৃত সুপরিচিত মৎস্যক্ষেত্রগুলিতে মৎস্যের পরিমাণ ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। এই কারণে ধীবরগণকে মৎস্য সংগ্রহের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি করিবার জন্য, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান সংগ্রহের পরিমাণ বজায় রাখিবার জন্যও অপেক্ষাকৃত বেশী ও দক্ষ সাজ-সরঞ্জাম লইয়া দ্রুতগামী জাহাজেকরিয়া তীরভূমি হইতে আরও দূরে গভীরতর সমুদ্রে যাইতে হইতেছে। অবশ্য উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল এবং দক্ষিণ আমেরিকার চিলি ও আর্জেন্টিনার উপকূলের মৎস্যক্ষেত্রগুলি অপেক্ষাকৃত নূতন বলিয়া এই সকল অঞ্চলের উৎপাদন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইউরোপ, এশিয়া ও উত্তর আমেরিকায় এখনও বহু অব্যবহৃত মৎস্যক্ষেত্র রহিয়াছে। কিন্তু এইগুলি লোকালয় হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া এবং অত্যধিক শীতের জন্য বৎসরের অধিকাংশ সময় কার্যোপযোগী না হওয়ায় এই সকল ক্ষেত্রে মৎস্যশিকারের খরচ অনেক বেশী।

সম্প্রতি মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের প্রতি মানুষের দৃষ্টি কিছুটা আকৃষ্ট হইয়াছে। নরওয়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, বৃটেন, কানাডা ও রাশিয়ার বহু বৈজ্ঞানিক মৎস্যসম্পদের গবেষণায় নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতবর্ষেও মৎস্য-গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। কোথাও কোথাও মাছের ডিম হইতে কৃত্রিম উপায়ে পোনা জন্মাইয়া দেশের অভ্যন্তরভাগের বিভিন্ন জলাশয়ে ও সমুদ্র-উপকূলে উহা ছাড়িয়া দিয়া মৎস্যের চাষ করা হইতেছে। ঝিনুক ও অন্যান্য খোলস-বিশিষ্ট মৎস্যের (Shell-fish) চাষ কোন কোন দেশে নিয়মিতভাবে করা হইতেছে। কিন্তু মৎস্য-শিল্পের গুরুত্ব বজায় রাখিবার ও উহার শ্রীবৃদ্ধির জন্য আরও ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন জাতের মৎস্যের অভ্যাস ও জীবন-ইতিহাস পর্যবেক্ষণ, মৎস্যের ডিম ছাড়িবার ঋতুতে আইন করিয়া মৎস্য-শিকার নিষিদ্ধকরণ, চাহিদার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া

মৎস্য-শিকার, এবং মিহি জালের পরিবর্তে মোটা জালের প্রবর্তন ইত্যাদি ব্যবস্থা আশু গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই সকল ক্ষেত্রে কোন একটি দেশের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে না। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও যুক্তভাবে ব্যবস্থাগ্রহণের মধ্য দিয়া মৎস্য-সম্পদ সংরক্ষণের সমস্যাগুলির সমাধান করিতে হইবে। সুখের বিষয়, এইভাবে কিছু কিছু কাজ ইতিমধ্যে শুরু হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরে হ্যালিবাট মাছ সংরক্ষণের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক কমিশন ইহার উদাহরণ। ১৯৩৬, ১৯৪৩ ও ১৯৪৬ সালের উত্তর সাগর কন্‌ভেন্‌সনে (North Sea Convention) ইউরোপের দেশগুলি জালের বুনানি এবং ছোট মাছ না ধরা সম্পর্কে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

সর্বশেষে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের সহিত জটিল সমস্যাসমূহ জড়িত রহিয়াছে এবং এই ব্যাপারে মানুষের জ্ঞান এখনও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তবুও আমেরিকার বিশেষজ্ঞগণ বিশ্বাস করেন যে, মহাসমুদ্রে বিজ্ঞান-গবেষণার সুফল একমাত্র মৎস্যশিকারের ক্ষেত্রেই এত বিপুল হইতে পারে যে, খাদ্যের জন্য পৃথিবীর মৎস্য-আহরণ পাঁচগুণ বর্ধিত করিলেও এই সঞ্চয় কখনও ফুরাইয়া যাইবে না। বিশেষজ্ঞগণ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মৎস্য-বিচরণ সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানলাভের দ্বারা এবং মৎস্যের বংশবিস্তারের পক্ষে অনুকূল নূতন নূতন অঞ্চলে মৎস্য উৎপাদনের দ্বারা এবং আরও কিছু কিছু উপায়ে আমরা পূর্বোক্ত ফলাফল লাভ করিতে পারি।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the economic significance of sea.

উঃ—'সমুদ্রের অর্থনৈতিক তাৎপর্য' (৮৮ পৃঃ— ৮৯ পৃঃ) লিখ।

2. Describe the important sea-fisheries of the world.

উঃ—'পৃথিবীর মৎস্যক্ষেত্রসমূহ' (৯৬ পৃঃ— ১০০ পৃঃ) লিখ।

3. What are the different types of fisheries found in the world ?

উঃ—'মৎস্য-চাষের শ্রেণীবিভাগ' (৮৯ পৃঃ— ৯০ পৃঃ) লিখ।

4. Account for the location of the principal fishing grounds of the world and indicate their chief markets. Give a comparative idea of their total catch. [C. U. B. Com. 1956]

উঃ—'পৃথিবীর মৎস্যক্ষেত্রসমূহ' (৯৬ পৃঃ—১০০ পৃঃ) এবং 'বাণিজ্য' (১০১পৃঃ—১০২ পৃঃ) হইতে লিখ।

5. Account for the location of principal sea-fisheries in temperate seas and discuss the prospects of development of sea-fisheries in India.

উঃ—'বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রসমূহের উন্নতির কারণ' (৯১ পৃঃ—৯৬ পৃঃ) এবং ভারতের মৎস্য-চাষ সম্বন্ধে লিখ।

6. Locate the major fishing grounds of the world and give their characteristics. Explain why commercial fishing is undeveloped in tropical waters.

উঃ—'পৃথিবীর মৎস্যক্ষেত্রসমূহ' (৯৬ পৃঃ— ১০০ পৃঃ), 'বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রসমূহের উন্নতির কারণ' (৯১ পৃঃ— ৯৬ পৃঃ) এবং 'ক্রান্তীয় মণ্ডলে মৎস্য-চাষ' (১০০ পৃঃ— ১০১ পৃঃ) লিখ।

7. What are the physical factors favourable for the development of sea-fisheries? Describe the location of the chief marine fishing grounds of the world and discuss the modern methods of sea.fishing.

উঃ—'বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রসমূহের উন্নতির কারণ' অংশে 'প্রাকৃতিক কারণসমূহ' (৯১ পৃঃ— ৯৫ পৃঃ), 'পৃথিবীর মৎস্যক্ষেত্রসমূহ' (৯৬ পৃঃ— ১০০ পৃঃ) এবং 'বাণিজ্যিক মৎস্য-শিকারের বিভিন্ন পদ্ধতি' (৯০ পৃঃ— ৯১ পৃঃ) লিখ।

সপ্তম অধ্যায়

অরণ্য ও অরণ্যসম্পদ
(Forest and Forest Products)

মৃত্তিকা, জলবায়ু এবং ভূ-প্রকৃতির উপর উদ্ভিজ্জের সৃষ্টি নির্ভর করে। বহু উদ্ভিদ, বিশেষ করিয়া বৃক্ষের সমাহার বা একত্র সমাবেশকে অরণ্য বা বনভূমি বলে। পৃথিবীতে প্রায় ৪ কোটি বর্গ-কিলোমিটার পরিমিত ভূমি অরণ্য দ্বারা আবৃত। ইহার মধ্যে ২·৬ কোটি বর্গ-কিলোমিটার বনভূমি উৎপাদনশীল। অবশ্য বর্তমানে এই অরণ্যসম্পদের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার হয় না। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে এখনও পর্যন্ত অত্যন্ত আদিম পদ্ধতিতে বনভূমি ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; ফলে অপচয়ের পরিমাণ খুব বেশী।

প্রত্যক্ষ ব্যবহার (Direct Uses)—অরণ্যের প্রধান সম্পদ কাঠ। বিভিন্ন প্রকারের কাঠ অরণ্য হইতে সংগ্রহ করা হয়। পৃথিবীতে কাঠের মোট উৎপাদন ও ব্যবহার নিম্নে প্রদত্ত হইল :

ব্যবহার	কোটি মেঃ টন	শতকরা	ব্যবহার	কোটি মেঃ টন	শতকরা
নির্মাণ-কার্য	৪০	৩৩·০	রেয়ন	·৫	০·৪
কাগজ	৬	৫·০	জ্বালানি	৬৪	৫৪·০
রেলপথ	২·৫	২·০	অন্যান্য	৫	৪·০
খনি	২	১·৬	মোট ব্যবহার	১২০	১·০০০

পৃথিবীতে প্রতিবৎসর মোট যে পরিমাণ কাঠ ব্যবহৃত হয় তাহার শতকরা ৫৪ ভাগ হয় জ্বালানি হিসাবে। দুই-একটি অঞ্চল ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদিম পদ্ধতিতেই কাঠ জ্বালানো হয় এবং এইভাবে অপচয়ের পরিমাণ খুব বেশী। রেলের স্লিপার ও খনির ছাদের খুঁটি হিসাবে কাঠের ব্যবহার গুরুত্ব-পূর্ণ। কিন্তু কাঠের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগত ব্যবহার গৃহাদি নির্মাণের সরঞ্জাম হিসাবে। বাসগৃহ, কারখানা, ধর্মস্থান, সেতু প্রভৃতি নির্মাণের জন্য কাঠ ব্যবহার করা হয়। প্রতিবৎসর পৃথিবীতে মোট ব্যবহৃত কাঠের শতকরা ৩৩ ভাগ এইরূপ নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ক্রমেই বিভিন্ন ধাতু, সিমেন্ট, ইট প্রভৃতি নির্মাণকার্যে কাঠের স্থান দখল করিয়া লইতেছে। গৃহাদি

নির্মাণের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসাবে কাঠের গুরুত্ব বজায় রাখিতে হইলে প্রতিনিয়ত ইহার প্রয়োগ ও প্রস্তুতিকার্যে উন্নতি বিধান করিতে হইবে। সুখের বিষয় এইদিকে যথেষ্ট অগ্রগতি হই‍য়াছে। কাঠ সহনশীল করিবার জন্য রাসায়নিক পদার্থ ও বিদ্যুতের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করিয়া কাঠের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা যায়; এই ব্যাপারে ক্রিয়োসোট বহুদিন হইতেই ব্যবহৃত হইতেছে এবং উন্নততর রাসায়নিক সামগ্রী আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে। রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করিয়া অগ্নিরোধক কাঠ প্রস্তুতের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে; অবশ্য এখনও পর্যন্ত ইহার খরচ অত্যন্ত বেশী। কাঠের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা আয়তনগত অস্থায়িত্ব; ঋতুতে ঋতুতে কাঠের আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে; অনেকসময় বাঁকিয়া দুমড়াইয়া যায়। এই ত্রুটি দূর করিবারও বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাঠের গুঁড়া ও অব্যবহৃত অংশ হইতে কৃত্রিম কাঠ (Synthetic timber), প্লাস্টিক, সুরাসার, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, আলকাতরা প্রভৃতি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতে পারে। বর্তমানে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার উন্নতির ফলে কয়লা ও খনিজ তৈলের ন্যায় জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার না করিয়া কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করিয়া কাঠ হইতে অসংখ্য মূল্যবান্ দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হইতেছে।

শিল্পোন্নত দেশসমূহে কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজ-শিল্পে কাঠ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কাষ্ঠমণ্ড হইতে পূর্বে শুধু কাগজ প্রস্তুত হইত। এখন রেয়ন ও অনুরূপ দ্রব্যাদিও প্রস্তুত হইতেছে। মণ্ডশিল্পে (Pulp industry) কাঠের চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। কাঠ হইতে চিনি ও কৃষিসার উৎপাদন করাও সম্ভব। নিকট-ভবিষ্যতে হয়তো এই চিনি ব্যাপকভাবে মানুষ ও পশুর খাদ্য হিসাবে এবং সুরাসার উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হইবে।

কাঠ সর্বপ্রধান বনজ সম্পদ হইলেও আরও নানাপ্রকার সম্পদ অরণ্য হইতে সংগ্রহ করা হয়। বন্যপশুর মাংস, চামড়া, লোম, শিং ও দাঁত, মধু, মোম, লাক্ষা, রবার, তার্পিন তৈল, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফল, রেশমগুটি, কুইনাইন প্রভৃতি মূল্যবান্ সম্পদ অরণ্য হইতে সংগৃহীত হয়।

অরণ্যের পরোক্ষ ব্যবহার (Indirect Uses)—অরণ্যের গুরুত্ব শুধু প্রত্যক্ষ ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ নহে। জলবায়ু, জলস্রোত ও মৃত্তিকার উপরও অরণ্য প্রভাব বিস্তার করে। বনভূমি বায়ু ও মৃত্তিকায় আর্দ্রতা বৃদ্ধি করে;

বন্যা ও ঝড়ের বেগ-নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করিয়া জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে সাহায্য করে, ভূমিক্ষয় নিবারণ করে, মরুভূমির প্রসার রোধ করে এবং গৃহপালিত জীবজন্তুর খাদ্য সরবরাহ করে। অরণ্যের প্রাকৃতিক শোভায় ভ্রমণকারিগণ আকৃষ্ট হয়। অরণ্য বন্যপশুর আশ্রয়স্থল। কাঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদ আহরণ করিয়া বহুলোক জীবিকা অর্জন করে। অনেক দেশে অরণ্য সরকারী আয়ের অন্যতম উৎস।

মানবজাতির ভবিষ্যতের পক্ষে অরণ্যসম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ উপযুক্তভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে অরণ্য প্রয়োজনীয় অসংখ্য জিনিসের অক্ষয় উৎস। এই দিক দিয়া অরণ্যের সহিত মৃত্তিকার তুলনা করা যাইতে পারে। পৃথিবীতে যেদিন সমস্ত খনি নিঃশেষ হইয়া যাইবে সেদিনও অরণ্য মানুষের বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া যাইবে; কারণ অরণ্য প্রবহমান সম্পদ।

পৃথিবীর অরণ্যবলয়সমূহ (Forest-belts of the World)—জলবায়ু, মৃত্তিকা ও ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার বনভূমি দেখা যায়। কিন্তু বৃক্ষের আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ধারণে মৃত্তিকা ও ভূ-প্রকৃতি অপেক্ষা জলবায়ু অধিক গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ুর তারতম্য অনুযায়ী কোন অরণ্যের গাছের কাঠ নরম হয়, কোন অরণ্যের গাছের কাঠ শক্ত হয়; কোন অরণ্যের গাছের পাতা হয় বড়, আবার কোথাও গাছের পাতা হয় সরু ও ছোট। কোথাও অরণ্যের সমস্ত গাছের পাতা বৎসরের কোন নির্দিষ্ট ঋতুতে ঝরিয়া পড়ে, আবার কোন অরণ্যের সমস্ত পাতা কখনও একসঙ্গে ঝরিয়া পড়ে না; ফলে অরণ্য হয় চিরহরিৎ। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বনভূমিকে মোটামুটি-ভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; অর্থাৎ পৃথিবীতে নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান অরণ্যবলয় রহিয়াছে :

(ক) ক্রান্তীয় শক্তকাষ্ঠের অরণ্য
(Tropical Hardwood Forests)

উষ্ণমণ্ডলে সারাবৎসরব্যাপী প্রচুর বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে শক্তকাষ্ঠের গহন অরণ্য দেখা যায়। এই অরণ্যে মেহগনি, সেগুন, এবনি, সেইবা, রোজউড, সীডার, রবার, ব্রেজিল নাট প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। যে সকল স্থানে বৎসরে কোন সময়ে তাপমাত্রা ২০° সেঃ এর কম হয় না, বৃষ্টিপাত প্রচুর, প্রতি মাসেই কিছু-না-কিছু বৃষ্টিপাত হয় এবং প্রচুর সূর্যকিরণ ও গভীর মৃত্তিকা পাওয়া যায়,

সেই সকল স্থানেই এইজাতীয় অরণ্য দেখা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর অববাহিকায়, মধ্য আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, মালয়, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীন, সিংহল এবং ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল ও পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে বিস্তীর্ণ ক্রান্তীয় শক্তকাষ্ঠের অরণ্য পরিলক্ষিত হয়। মৃত্তিকায় সারাবৎসর প্রচুর রস থাকে বলিয়া অরণ্যের বৃক্ষাদি ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া জন্মে এবং সূর্যকিরণ পাইবার জন্য যেন পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া উপরের দিকে বাড়িতে থাকে। ফলে এই অরণ্যে ৩০ হইতে ৬০ মিটার পর্যন্ত উঁচু বৃক্ষ দেখা যায়। এই সকল গাছের কাষ্ঠ খুব শক্ত, গুঁড়ি মোটা ও শাখাপত্রহীন ; ইহাদের পাতা খুব বড় হয় এবং কখনও একসঙ্গে ঝরিয়া পড়ে না। অরণ্যের উপরের অংশ ঘন শাখাপ্রশাখা ও পত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়া চাঁদোয়ার মতো দেখায়। অনেক স্থানে অরণ্য এত ঘন যে, বৎসরের কোন সময়েই সূর্যকিরণ শাখাপত্রের আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। অরণ্যের মধ্যে বৃহদাকার বৃক্ষাদি অবলম্বন করিয়া মোটা মোটা লতা উপরের দিকে ওঠে, অর্কিড-জাতীয় পরগাছারও অভাব নাই। ব্রেজিলে এইজাতীয় অরণ্যকে 'সেল্‌ভা' (Selvas) বলে। অরণ্যের মধ্যে কীটপতঙ্গ, রংবেরঙের পাখী, সরীসৃপ ও বানরজাতীয় প্রাণী বেশী দেখা যায়। অরণ্যের অভ্যন্তরভাগের আবহাওয়া স্যাঁৎসেঁতে, উষ্ণ, গুমোট, অস্বাস্থ্যকর ও কঠোর পরিশ্রমের অনুপযোগী। এইজাতীয় অরণ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এক জায়গায় নানাজাতীয় বৃক্ষের একত্র সমাবেশ। সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্যের ন্যায় এই অরণ্যে কখনও একটা অঞ্চল জুড়িয়া শুধু একজাতীয় বৃক্ষ দেখা যায়।

উষ্ণমণ্ডলের যে সকল স্থানে বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত প্রচুর হইলেও উহা বৎসরের একটা নির্দিষ্ট ঋতুতে সীমাবদ্ধ, সেখানে চিরহরিৎ অরণ্যের পরিবর্তে শক্তকাষ্ঠের পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। বৃষ্টিহীন ঋতুতে গাছগুলি জলের খরচ বাঁচাইবার জন্য পত্রত্যাগ করে। দক্ষিণ আমেরিকার কুইব্রাকো (Quibracho), ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও ইন্দোচীনের সেগুন, ভারত-বর্ষের শাল, বাঁশ, আম প্রভৃতি এইজাতীয় অরণ্যের মূল্যবান্ বৃক্ষ। শিমুল, পলাশ, শিরীষ, মহুয়া, পাড়ুয়াক, বেত প্রভৃতি বৃক্ষও এইজাতীয় অরণ্যে দেখা যায়। উষ্ণমণ্ডলের যে সকল স্থানে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১০০ সেঃ মিঃ-এর কম সেই সকল স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বৃক্ষ-সমন্বিত তৃণভূমি বা স্তাভানা

(Savannah) দেখিতে পাওয়া যায়। আফ্রিকার সুদান, চাড্, রোডেসিয়া, কেনিয়া, ট্যাঙ্গানাইকা, এঙ্গোলা প্রভৃতি স্থানে, দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা, গায়না প্রভৃতি দেশে এবং মধ্য ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া এই তৃণভূমি দেখা যায়। উষ্ণমণ্ডলীয় উদ্ভিজ্জ ক্রমে ছোট ছোট ঝোপ ও কাঁটাগাছে পরিণত হইয়া মরুভূমির সহিত মিশিয়া যায়।

উপজাত দ্রব্য (By-products)—জাপোট গাছের (Zapote) রস হইতে প্রস্তুত চিকল (Chicle) মূল্যবান্ সম্পদ। ইহা হইতে চিউইং গাম
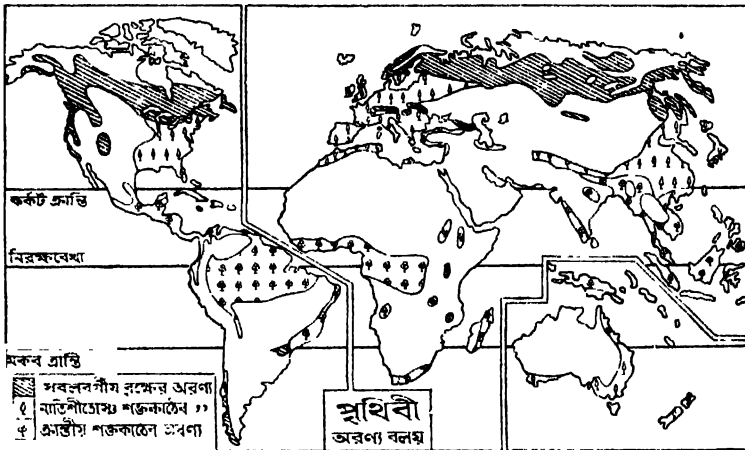
প্রস্তুত হয়। দক্ষিণ মেক্সিকো হইতে ব্রেজিল পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় চিরহরিৎ অরণ্যে ইহা সংগৃহীত হয়। এখানে নানাজাতীয় বাদাম সংগ্রহ করিয়া খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পশ্চিম আফ্রিকার অয়েল পাম হইতে তৈল প্রস্তুত হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের অরণ্যে বিশেষ করিয়া আমাজন ও কঙ্গো নদীর অববাহিকায় রবার সংগ্রহ করা হয়। ভারতবর্ষ, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে ক্রান্তীয় অরণ্য হইতে গোলমরিচ, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতি মসলা সংগৃহীত হয়। ভারত ও পাকিস্তানের বনভূমি হইতে লাক্ষা ও মোম সংগ্রহ করা হয়। লাক্ষা রপ্তানি করিয়া ভারত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। ক্রান্তীয় অরণ্যে কলা, আনারস, পেয়ারা, আম, জাম প্রভৃতি নানাবিধ সুস্বাদু পুষ্টিকর ফলের বৃক্ষ জন্মে। এই সকল ফল

সংগ্রহ করিয়া বহুলোক জীবিকা নির্বাহ করে। এই অরণ্য হইতে নানাবিধ মূল্যবান্ ঔষধ সংগ্রহ করা হয়। ইহার মধ্যে কর্পূর ও কুইনাইন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। টোকিলা পাম (Toquilla palm)-এর পাতা হইতে ইকুয়েডর, কলম্বিয়া এবং পানামা অঞ্চলে তন্তু বাহির করা হয়। বিখ্যাত পানামা টুপি-প্রস্তুতে এই তন্তু ব্যবহৃত হয়। চামড়া পাকা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বনজ দ্রব্যও এই অরণ্য হইতে সংগ্রহ করা হয়। ভেনেজুয়েলা ও ব্রেজিলের অরণ্য হইতে বালাটা (balata) সংগ্রহ করা হয়। ইহা সামুদ্রিক কেবল্-প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

কাষ্ঠশিল্প (Lumbering)—গৃহাদি নির্মাণের সাজ-সরঞ্জামের জন্য, নৌকা ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের জন্য এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহারের জন্য ক্রান্তীয় বনভূমির শক্তকাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। ক্যারিবিয়ান উপসাগরে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ ও জাভার ন্যায় কতিপয় অঞ্চলে মূল্যবান্ অরণ্যসম্পদ প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিলেও ক্রান্তীয় অরণ্যবলয়ের অধিকাংশ স্থানেই এখনও পর্যন্ত অরণ্যসম্পদকে বিশেষ প্রয়োজনে লাগানো যায় নাই। কারণ, সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য বা নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যের তুলনায় ক্রান্তীয় অরণ্যসম্পদ ব্যবহারের পক্ষে কয়েকটি **বাধা** রহিয়াছে। প্রথমতঃ, উষ্ণমণ্ডলের দেশগুলি সমৃদ্ধিশালী না হওয়ায় এখানে কাষ্ঠের চাহিদা কম। দ্বিতীয়তঃ, ক্রান্তীয় শক্তকাষ্ঠের অরণ্যে এক জায়গায় নানাপ্রকারের বৃক্ষ জন্মায়। ফলে কোন একজাতের অনেকগুলি বৃক্ষ সংগ্রহ করিতে হইলে অরণ্যের মধ্যে বহুদূর পরিভ্রমণ করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, অরণ্যের নীচের অংশ লতাগুল্মে সমাচ্ছন্ন বলিয়া ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করাও দুঃসাধ্য। চতুর্থতঃ, অধিকাংশ বৃক্ষ অত্যন্ত শক্ত ও ভারী। ফলে এই সকল কাষ্ঠ কাটা এবং কারখানা ও বন্দর অঞ্চলে লইয়া যাওয়া পরিশ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য। পঞ্চমতঃ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বনভূমি যাতায়াতের পথ ও ভোগকেন্দ্র হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। ষষ্ঠতঃ, অরণ্যের অভ্যন্তরভাগের আবহাওয়া স্যাঁৎসেঁতে, উষ্ণ, আর্দ্র ও অস্বাস্থ্যকর। নানা প্রকার বিষাক্ত কীটপতঙ্গ ও রোগ-জীবাণুর প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে। ফলে শ্রমশক্তি দুর্লভ ও অদক্ষ। এই সকল কারণে বৃক্ষচ্ছেদন ও কাষ্ঠ-উৎপাদন প্রধানতঃ সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে, নদী-প্রবাহের সন্নিকটে এবং শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহের সন্নিহিত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। উষ্ণমণ্ডলের অনেক স্থানে অরণ্য এত দুর্ভেদ্য ও কাষ্ঠ-উৎপাদন এত ব্যয়বহুল যে,

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অরণ্য হইতে কাষ্ঠ আমদানি করিয়া ব্যবহার করা অপেক্ষাকৃত লাভজনক। ব্রেজিলের মানাও (Manaos) শহরের প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সন্নিহিত চিরহরিৎ বনভূমি হইতে সংগ্রহ না করিয়া উত্তর আমেরিকার নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য হইতে আমদানি করা হয়। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও ক্রান্তীয় অরণ্য হইতে ক্রমশঃই অধিক পরিমাণে মেহগনি, সীডার, চন্দন, সেগুন, শাল, এবনি, রোজউড, গ্রান-হার্ট, নারা, গুইজো এবং অন্যান্য জাতের কাষ্ঠ উষ্ণমণ্ডল ও নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহে সরবরাহ করা হইতেছে। এই অঞ্চল হইতে প্রধানতঃ কাষ্ঠের গুঁড়ি চালান দেওয়া হয়। কোন কোন স্থানে আধুনিক করাতকল স্থাপন করিয়া, গুঁড়িগুলি চেরাই করিয়া কাষ্ঠের কড়ি, তক্তা ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া চালান দেওয়া হয়।

ক্রান্তীয় বনভূমির সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ কাষ্ঠ হইল মেহগনি। ক্যারিবিয়ান সাগরের তীরবর্তী দেশসমূহ, বিশেষ করিয়া বৃটিশ হণ্ডুরাস্ ও ডোমিনিকান রিপাবলিক, পশ্চিম আফ্রিকার সমুদ্রোপকূল, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হইতে এই কাষ্ঠ সংগ্রহ করা হয়। বাণিজ্যিক গুরুত্বের দিক দিয়া মেহগনির পরেই সীডারের স্থান। দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ এশিয়া, পশ্চিম আফ্রিকা এবং ক্যারিবিয়ান সাগরের দেশগুলি হইতে বিভিন্ন জাতের সীডার রপ্তানি করা হয়। সেগুন কাষ্ঠও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী অরণ্যের ওক্ কাষ্ঠের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে, জাহাজ-নির্মাণের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীন ও যবদ্বীপে (জাভা) সেগুন কাষ্ঠ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশের রপ্তানি-বাণিজ্যে সেগুন কাষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের নাতিশীতোষ্ণ শক্তকাষ্ঠের অরণ্য দ্রুত নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। নরম সরলবর্গীয় বৃক্ষ শক্তকাষ্ঠের স্থান পূরণ করিতে পারে না। ফলে এখনও পর্যন্ত প্রায়-অব্যবহৃত ক্রান্তীয় শক্তকাষ্ঠের বিস্তীর্ণ অরণ্য অঞ্চল ভবিষ্যতে নাতিশীতোষ্ণ শক্তকাষ্ঠের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অবশ্য ক্রান্তীয় শক্তকাষ্ঠের মূল্য অধিক বলিয়া গৃহাদি নির্মাণ, আসবাবপত্র তৈয়ারী ও অন্যান্য কাজে ক্রমশঃই ইহার পরিবর্তে ইস্পাত ও অন্যান্য সামগ্রী ব্যবহার করা হইতেছে।

(খ) সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য
(Coniferous Forests)

তুন্দ্রা অঞ্চলের দক্ষিণে ৫০° হইতে ৭০° অক্ষাংশের মধ্যে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। এই অঞ্চলে প্রচুর তুষারপাত হইয়া থাকে। যাহাতে গাছে তুষার জমিয়া থাকিতে না পারে সেইজন্য এইজাতীয় অরণ্যের গাছের মাথা উপরের দিকে ক্রমশঃ পিরামিডের মতো সরু হইয়া যায়। এখানকার গাছগুলির কাষ্ঠ নরম। প্রধান প্রধান বৃক্ষ হইল নানাজাতীয় পাইন, ফার, স্প্রুস ও লার্চ। মাঝে মাঝে অ্যাস্‌পেন, পপ্‌লার এবং বার্চ জাতীয় পর্ণমোচী বৃক্ষ দেখা যায়। সরলবর্গীয় অরণ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া একজাতীয় গাছের অবস্থান। রাশিয়ায় সরলবর্গায় বৃক্ষের অরণ্য 'তৈগা' (Taiga) নামে পরিচিত। এইজাতীয় অরণ্যের যে সকল স্থানে গ্রীষ্মকাল আর্দ্র ও গ্রাষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা ১৬° সেঃ-এর বেশী নহে সেখানে গাছগুলি ভালোভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তৈগার উত্তর অংশে ক্রমশঃ গাছের উচ্চতা ও বৃদ্ধির হার হ্রাস পাইতে থাকে এবং অরণ্য ফাঁকা হইয়া আসে। উত্তর অংশে একটা গাছের পূর্ণতাপ্রাপ্তির জন্য ২০০ বৎসর পর্যন্ত সময় লাগে। উত্তর গোলার্ধে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য মহাদেশগুলির পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত ধরিয়া দক্ষিণদিকে বহুদূর পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। উত্তর আমেরিকার পশ্চিমদিকে কোস্ট রেঞ্জ, সিয়েরা নেভাডা, ক্যাস্‌কেড এবং রকি পর্বতের মৃদু ও আর্দ্র জলবায়ুতে চমৎকার ডগলাস ফার, শ্বেত পাইন, রেডউড, পীত পাইন প্রভৃতি বৃক্ষের অরণ্য সৃষ্টি হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বপ্রান্তে, মধ্য ইউরোপে, মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলেও বেলেমাটিতে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে ভার্জিনিয়া হইতে টেক্সাস্ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অনুর্বর বেলেমাটিতে পাইনবৃক্ষের অরণ্য রহিয়াছে। এই ধরনের পাইনবন দক্ষিণ ফ্রান্সে, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উত্তরাংশে, ককেশাস্ পর্বতমালায়, দক্ষিণ চীন ও জাপানের পর্বতপৃষ্ঠে দেখিতে পাওয়া যায়।

এশিয়ার উত্তর অংশে সরলবর্গীয় বনাঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি বনভূমির সদ্ব্যবহারের অনুকূল নহে। এখানে নদীগুলি দক্ষিণদিক হইতে উত্থিত হইয়া উত্তরে মেরুসাগরে গিয়া পড়িয়াছে দীর্ঘ শীতকালে মেরুসাগর ও এই

নদীগুলি বরফে জমিয়া থাকে। বসন্তে যখন নদীগুলির দক্ষিণ অংশ গলিতে থাকে তখনও উত্তর অংশ বরফে জমাট-বাঁধা। ফলে নদীখাতে বাহির হইবার পথ না পাইয়া জলস্রোত কূল ছাপাইয়া চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িয়া বিরাট জলাভূমির সৃষ্টি করে। ইহার ফলে অনেক গাছ পচিয়া যায় এবং অরণ্যের সদ্ব্যবহারের পক্ষে বাধার সৃষ্টি হয়। সরলবর্গীয় বনভূমিতে শীত তীব্র বলিয়া মূল্যবান্ ঘন লোমওয়ালা জীবজন্তু দেখিতে পাওয়া যায়।

উপজাত দ্রব্য (By-products)—সরলবর্গীয় বনভূমি হইতে সংগৃহীত পাইনগাছের পীচ, আলকাতরা, তার্পিন তৈল প্রভৃতি নানাবিধ কার্যে ব্যবহৃত হয়। খেঁকশিয়াল, উইসেল, স্যাবল্, মিঙ্ক, মাস্ক্র্যাট প্রভৃতি প্রাণীর লোম (Fur) সংগ্রহ ও বিক্রয় সরলবর্গীয় অরণ্যের অন্যতম লাভজনক ব্যবসায়। ফার-প্রদায়ী পশু অনেক স্থানে দুর্লভ হওয়ায় কোথাও কোথাও (যেমন কানাডার দক্ষিণ অংশে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশে) এইজাতীয় পশুর চাষ হইতেছে।

কাষ্ঠশিল্প (Lumbering)—পৃথিবীতে মোট যে পরিমাণ কাষ্ঠ ব্যবহার করা হয় তাহার অর্ধেক আসে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য হইতে। পূর্বেই বলা হইয়াছে এই অরণ্যের গাছের কাষ্ঠ নরম। এই কাষ্ঠ জাহাজের মাস্তুল ও পাটাতন, আসবাবপত্র, দিয়াশলাই, প্যাকিং বাক্স, কাষ্ঠমণ্ড প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়। কাষ্ঠমণ্ড হইতে কাগজ, কৃত্রিম রেশম, সুরাসার ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। নরম কাষ্ঠের শিল্পগত ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব খুব বেশী।

সরলবর্গীয় অরণ্যবলয়ের অধিকাংশ স্থানেই কঠিন প্রাকৃতিক পরিবেশে কাষ্ঠ উৎপাদন করা হয়। এই সকল স্থানে লোকবসতি কম এবং কৃষিকার্য প্রসার লাভ করে নাই। তবে কৃষিকার্যের প্রতিকূল কয়েকটি প্রাকৃতিক অবস্থা কাষ্ঠশিল্পের পক্ষে সুবিধাজনক হইয়াছে। দীর্ঘ শীতকালে ভূমি তুষারে আবৃত থাকে। নদীগুলিও থাকে বরফে জমাট-বাঁধা। বসন্তে এই সকল অসংখ্য নদীর বরফ গলিয়া নূতন জলের জোয়ার আসে। ইহার ফলে কাষ্ঠ-পরিবহণের খুব সুবিধা হয়।

মাটিতে তুষার খুব পুরু হইয়া পড়িবার পূর্বেই শরৎকালে গাছগুলি কাটা হয়। কুইবেক, ফিনল্যাণ্ড এবং সুইডেনের মতো যে সকল স্থানে অরণ্যভূমির নিকট কৃষি-ভূমি রহিয়াছে সেখানে কৃষকেরা শরৎকাল হইতে কাঠুরিয়া বনিয়া

যায়। অন্যান্য স্থানে, যেমন ইউরোপীয় রাশিয়ার উত্তর-পূর্ব অংশে দূরবর্তী প্রদেশ হইতে শ্রমিক আমদানি করিতে হয় এবং এই সকল ক্ষেত্রে প্রভূত মূলধন বিনিয়োগ করিয়া বৃহদাকারে কাষ্ঠ উৎপাদন করা হয়। তুষারের উপর দিয়া ঘোড়া কিংবা ট্রাক্টরের সাহায্যে সহজেই কাষ্ঠের গুঁড়িগুলি টানিয়া আনিয়া বরফে জমাট-বাঁধা নদীর উপর জড়ো করা হয়। বসন্তে নদীর বরফ গলিতে আরম্ভ করিলে গুঁড়িগুলি ভাসাইয়া নদীতীরে অবস্থিত করাত-কলে অথবা মণ্ড তৈয়ারীর কারখানায় লইয়া আসা হয়। অনেক অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া সুইডেনে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া কাষ্ঠ ভাসাইয়া আনিবার জন্য জলপথগুলির উন্নতি বিধান করা হইয়াছে। ইহার জন্য অনেক জায়গায় খাল খনন করা হইয়াছে, জলপ্রপাত বন্ধ করা হইয়াছে এবং নদীর মধ্যের চড়া পরিষ্কার করা হইয়াছে।

উত্তর রাশিয়ার নদীগুলি মেরুসাগরে পতিত হইয়াছে। ফলে দক্ষিণদিকে নদীর উৎপত্তিস্থলে যখন বরফ গলিতে থাকে, উত্তরদিকে নিম্ন অববাহিকা তখনও বরফে জমাট-বাঁধা। স্বভাবতঃই জল বাহির হইবার পথ না পাইয়া দুই কূল ছাপাইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং উহার সঙ্গে ভাসমান কাষ্ঠের গুঁড়িগুলিও চতুর্দিকে ভাসিয়া যাইতে পারে। উত্তর আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে গাছের গুঁড়িগুলি খুব বড়, নদীগুলি অত্যন্ত খরস্রোতা এবং জলপ্রপাতের সংখ্যাও অধিক। ফলে জলপথে কাষ্ঠ ভাসাইয়া আনিবার সুবিধা নাই। বাধ্য হইয়াই হয় ডাঙ্কি এঞ্জিন ও বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে অথবা ক্যাটারপিলার ট্রাক্টর ও রেলপথের সাহায্যে কাষ্ঠ পরিবহণ করা হয়। বহুস্থানে কাষ্ঠ পরিবহণের জন্য বনভূমি হইতে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত রেল-লাইন বসানো হইয়াছে। এইভাবে সারাবৎসর কাষ্ঠ-উৎপাদন সম্ভব হয়।

(গ) নাতিশীতোষ্ণ শক্তকাষ্ঠের অরণ্য
(Temperate Hard-wood Forests)

তৈগার দক্ষিণে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাংশে, পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপ ও মধ্য চীনের সমভূমি ও মালভূমিতে নাতিশীতোষ্ণ শক্তকাষ্ঠের অরণ্য দেখা যায়। এই সকল অঞ্চলের গভীর মৃত্তিকা, বাৎসরিক ৬০ সেঃ মিঃ-এর অধিক বৃষ্টিপাত এবং বসন্ত ও গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাত এইজাতীয় অরণ্য-সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে। এই অরণ্যের গাছের কাঠ শক্ত হয় এবং

গাছের পাতা শীতের তুষারপাত শুরু হইবার পূর্বেই শরৎকালে ঝরিয়া পড়ে। সেইজন্য এই অরণ্যের অন্য নাম নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য (Temperate Deciduous forest)। কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ শক্তকাষ্ঠের অরণ্যবলয়ের বিভিন্ন অংশে মৃত্তিকা, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার পার্থক্য থাকায় অরণ্যের রূপেরও পার্থক্য দেখা যায়। কোথাও শুধু পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য, আবার কোথাও মিশ্র পর্ণমোচী ও সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-অঞ্চলে কোথাও গহন, কোথাও অপেক্ষাকৃত ফাঁকা পর্ণমোচী ও সরলবর্গীয় বৃক্ষের মিশ্র অরণ্য দেখা যায়; এই অরণ্যে প্রধান প্রধান বৃক্ষ হইল ওক্, হিকরি, চেস্টনাট, ম্যাপ্‌ল্, অ্যাস, এল্‌ম্, ওয়ালনাট, বীচ ইত্যাদি। ইহার উত্তরে বার্চ, বীচ, ম্যাপ্‌ল্, হেমলক ও স্প্রুসের মিশ্র অরণ্য দেখা যায় এবং ইহার দক্ষিণে আর্দ্র নিম্নভূমিতে টুপেলো, গাম এবং সাইপ্রেস জাতীয় পর্ণমোচী বৃক্ষের গভীর বনভূমি রহিয়াছে। নাতিশীতোষ্ণ শক্তকাষ্ঠের অরণ্যের মৃত্তিকা উর্বর এবং জলবায়ু কৃষির অনুকূল হওয়ায় অনেক স্থানে বনভূমি ধ্বংস করিয়া কৃষিক্ষেত্র ও পশুচারণক্ষেত্র রচনা করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের সমভূমি অঞ্চলের শক্তকাষ্ঠের বনভূমি কৃষিকার্যের তাগিদে প্রায় ধ্বংস করিয়া ফেলা হইয়াছে।

দক্ষিণ গোলার্ধে ৩০° অক্ষরেখার দক্ষিণে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, টাস্‌মেনিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের সমুদ্র-সন্নিকটস্থ শীতল ও আর্দ্র অঞ্চলে মিশ্র পর্ণমোচী ও সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য সৃষ্টি হইয়াছে। দক্ষিণ গোলার্ধে স্থলভাগ দক্ষিণদিকে ক্রমশঃ সংকীর্ণ হওয়ায় তৈগা বনভূমি দেখা যায় না বলিলেই চলে। ফলে সরলবর্গীয় অরণ্যের শতকরা ৮০ ভাগ উত্তর গোলার্ধে ২৫° হইতে ৬৫° অক্ষরেখার মধ্যে পৃথিবীর ঘন লোকবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলির ব্যবহার-সান্নিধ্যে অবস্থিত।

উপজাত দ্রব্য (By-products)—বাদাম, আখরোট, খুবানি প্রভৃতি ফল এই বনভূমি হইতে সংগ্রহ করা হয়। এই অরণ্যের কোন কোন স্থানে (যথা পর্তুগাল) ওক্ গাছের পুরু ছাল হইতে শিশি-বোতলের ছিপি (Cork) প্রস্তুত হয়। চামড়া পাকা করিবার দ্রব্যাদিও এই অরণ্য হইতে সংগ্রহ করা হয়।

কাষ্ঠশিল্প (Lumbering)—নাতিশীতোষ্ণ শক্তকাষ্ঠের অরণ্যের কাষ্ঠ আসবাবপত্র, জাহাজ, মোটর-গাড়ী ও রেলগাড়ী নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীর বাৎসরিক চেরাই-কাষ্ঠ (Timber) উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ এই অরণ্য হইতে পাওয়া যায়; শতকরা ৬৬ ভাগ পাওয়া যায় সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য হইতে এবং মাত্র ৯ ভাগ পাওয়া যায় ক্রান্তীয় শক্তকাষ্ঠের অরণ্য হইতে।

পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রেণীর অরণ্যের আয়তন

(লক্ষ হেক্টর)

মহাদেশ	সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য	নাতিশীতোষ্ণ শক্তকাষ্ঠের অরণ্য	ক্রান্তীয় শক্তকাষ্ঠের অরণ্য
এশিয়া	৩,৫৫৬	২,২৮৮	২,৫৪০
আফ্রিকা	২৮	৬৮	৩,০৯২
ইউরোপ	২,৩১৬	৭৮০	০
অস্ট্রেলেশিয়া	৬০	৬০	১,০১২
উত্তর আমেরিকা	৪,১৮৪	১,১৬০	৪৩২
দক্ষিণ আমেরিকা	৪৩৬	৪৬০	৭,৪৭৬
	১০,৫৮০ (৩৫%)	৪,৮১৬ (১৬%)	১৪,৫৫২ (৪৯%)

অরণ্য-সংরক্ষণ (Conservation of Forests)—দুর্ভাগ্যের বিষয় পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে অরণ্যসম্পদ হয় উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা হয় না, অথবা অপব্যবহার করা হয়; অথচ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষ বর্তমানে এমন জ্ঞান ও কারিগরী দক্ষতার অধিকারী হইয়াছে যাহার দ্বারা অরণ্য চিরকালের জন্য মানুষের অন্যতম বৃহত্তম সম্পদের উৎস হিসাবে গণ্য হইতে পারে। কিন্তু ইহা উপযুক্তভাবে ব্যবহার না করিলে শুধু যে এই মূল্যবান্ সম্পদ হইতে মানুষ বঞ্চিত হইবে তাহা নহে, বন্যা, ভূমিক্ষয় ইত্যাদির সৃষ্টি করিয়া ইহা ভবিষ্যতে বিপদেরও কারণ হইবে।

অরণ্যের অপব্যবহারের প্রধান কারণ মানুষের **অজ্ঞতা**। এতদিন পর্যন্ত মানুষ জানিত না যে, একই জমিতে যেমন বৎসরের পর বৎসর ধান বা গম উৎপাদন করা সম্ভব, তেমনি একই অরণ্য হইতে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া নিয়মিতভাবে অসংখ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব। বিশেষ করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার যে সকল অঞ্চলে হয় নাই বা কম হইয়াছে—যেমন আফ্রিকার নিরক্ষীয় বনাঞ্চলে—সেই সকল স্থানে অরণ্যের অপব্যবহার সর্বাপেক্ষা

বেশী। অনেক জায়গায় অরণ্য পোড়াইয়া চা-এর জমি প্রস্তুত করা হয়। একখণ্ড জমিতে কয়েক বৎসর কৃষিকার্যের পর ইহা ত্যাগ করিয়া আবার অরণ্য পোড়াইয়া নূতন জমি বাহির করা হয়। পরিত্যক্ত জমিতে আর নূতন অরণ্য গড়িয়া উঠে না ; উহা তৃণভূমিতে পরিণত হয় অথবা ছোট ছোট ঝোপঝাড়ে পূর্ণ হয়। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার ন্যায় উন্নত অঞ্চলেও অনেকসময় গাছ উপযুক্ত পরিণতি-প্রাপ্তির পূর্বেই কাটা হয়। অনেকসময় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন না করার জন্য বড় গাছ কাটিবার সময় আশেপাশের ছোট চারাগাছগুলি নষ্ট হইয়া যায়। আর পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে অরণ্য হইতে যে হারে বৃক্ষ কর্তন করা হয় সেই হারে নূতন বৃক্ষ রোপণ করা হয় না। **প্রাকৃতিক** কারণেও **অরণ্য ধ্বংস** হয়। দাবানল ইহার অন্যতম উদাহরণ। ঝড়েও অনেক গাছ নষ্ট হয়। পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণেও অরণ্য নষ্ট হইতে দেখা যায়, তবে প্রকৃতি অপেক্ষা মানুষ অরণ্যের অনেক বেশী হিংস্র শত্রু।

নিয়মিতভাবে অরণ্যজাত দ্রব্য পাইতে হইলে বনভূমি হইতে যে হারে বৃক্ষ সংগ্রহ করা হইবে সেই হারে নূতন বৃক্ষ রোপণ করিতে হইবে। কিন্তু একটি বৃক্ষ রোপণ করিবার পর তাহা ব্যবহারোপযোগী হইতে বহুদিন সময় লাগে। কানাডা বা সাইবেরিয়ার সরলবর্গীয় অরণ্যে একটি বৃক্ষের পূর্ণতা-প্রাপ্তির জন্য ১০০, ১৫০, এমনকি ২০০ বৎসর পর্যন্ত সময় লাগে এবং এতদিন ধরিয়া ইহার উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হয়। স্বভাবতঃই ব্যক্তিগত মালিকানায় মুনাফা অর্জনের জন্য যেখানে অরণ্য পরিচালিত হয় সেখানে ১৫০ বা ২০০ বৎসরের মেয়াদে অর্থ বিনিয়োগ করিতে কেহ উৎসাহিত হইবে না। এই সকল ক্ষেত্রে নূতন বৃক্ষরোপণ ও **অরণ্যরচনা** অবহেলিত হইতে বাধ্য। অরণ্য হইতে একসঙ্গে বহু জিনিস উৎপাদন করা হয়। ফলে বহু জিনিসের বাজারদরের সঙ্গে অরণ্যজাত দ্রব্যের উৎপাদনের সামঞ্জস্যবিধান করিতে হয়। এই ধরনের আরও অনেক অসুবিধা রহিয়াছে। এই সকল কারণে অরণ্যের ন্যায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সর্বার্থসাধক (Multi-purpose)-জাতীয় সম্পদ আদৌ ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকা উচিত কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই অরণ্যসম্পদ **রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ** হিসাবে পরিচালনার পক্ষে জনমত ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

অরণ্য হইতে বৃক্ষকর্তনের সহিত তাল রাখিয়া নূতন বৃক্ষরোপণ ছাড়াও

অরণ্যসম্পদ সংরক্ষণের জন্য যে-কোন দেশের অরণ্য-নীতিতে (Forest policy) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন :

(ক) দেশের সমস্ত জমি জরিপ করিয়া যে সকল জমিতে লাভজনকভাবে কৃষিকার্য বা পশুচারণ সম্ভব নয় সেখানে অরণ্য রচনা করিতে হইবে ;

(খ) কেবলমাত্র পূর্ণতাপ্রাপ্ত গাছই কাটা হইবে এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এমনভাবে কাটিতে হইবে যাহাতে আশেপাশের চারাগাছগুলি নষ্ট না হয় ;

(গ) দাবানলের আক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য অরণ্য হইতে শুক্‌না ডালপালা ও গাছ নিয়মিতভাবে সরাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অগ্নি-নিরোধের অন্যান্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করিতে হইবে ;

(ঘ) কীট-নাশক ও রোগ-প্রতিরোধক ঔষধপত্র প্রয়োগ করিয়া পোকা-মাকড় ও রোগের আক্রমণ বন্ধ করিতে হইবে ;

(ঙ) অনেকসময় জীবজন্তু ছোট চারা মুড়াইয়া খাইয়া ফেলে ; ইহা বন্ধ করিতে হইবে।

অরণ্যপ্রদেশে যাতায়াতের সুব্যবস্থা করিয়া কারখানা, শহর, বন্দর ইত্যাদি ভোগকেন্দ্রের সহিত অরণ্যের উত্তম সংযোগ-সাধন করিতে হইবে। পরিশেষে মনে রাখিতে হইবে যে, অরণ্য-সংরক্ষণের অর্থ অরণ্যসম্পদ ব্যবহারে সংকোচ-সাধন নহে, উপযুক্ত বুদ্ধিমত্তার সহিত ইহার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার।

কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজশিল্প
(Wood-pulp and Paper Industry)

আধুনিক কালে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত কাগজের শতকরা ৯০ ভাগ প্রস্তুত হয় নরম কাঠ হইতে। অধিকতর পরিমাণে কাঠের ব্যবহারের ফলে কাগজের উৎপাদন-খরচ ক্রমেই কমিয়াছে এবং ইহার ফলে অরণ্য-সম্পদ-সংরক্ষণের দিকে অধিকতর সচেতনতা দেখা দিয়াছে। কাগজ প্রস্তুতের পক্ষে নরম কাঠের সরলবর্গীয় বৃক্ষ (যথা, স্প্রুস, পীত পাইন, হেমলক ও ফার) সর্বাপেক্ষা উপযোগী। উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই অন্যান্য শ্রেণীর বৃক্ষ কাগজ-উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতেছে।

কাঠ হইতে মণ্ড প্রস্তুতের জন্য প্রধানতঃ দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় ; **(১) যান্ত্রিক পদ্ধতি (Mechanical method), (২) রাসায়নিক**

পদ্ধতি (Chemical method)। যান্ত্রিক পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত পুরাতন এবং নিউজপ্রিণ্টের ন্যায় সস্তা কাগজ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় মূল্যবান্ উৎকৃষ্টশ্রেণীর কাগজ প্রস্তুতের জন্য।

পৃথিবীর শতকরা ৯০ ভাগ কাগজ ও কাষ্ঠমণ্ড প্রস্তুত হয় ইউরোপে ও উত্তর আমেরিকার পূর্বাংশের মধ্যভাগে। উত্তর আমেরিকার হ্রদ অঞ্চল, আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী রাজ্যসমূহ ও কানাডার দক্ষিণ অংশে প্রভূত পরিমাণে কাষ্ঠমণ্ড প্রস্তুত হয়। এখানে কাষ্ঠমণ্ড-প্রস্তুতকারী কারখানাগুলি অরণ্যের কাছাকাছি অবস্থিত। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশের অরণ্য অঞ্চলেও কাষ্ঠমণ্ড-শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই দেশে মণ্ড-উৎপাদনের অর্ধাংশ এবং কাগজ-উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ দক্ষিণ অঞ্চল হইতে আসে।

উত্তর আমেরিকা অপেক্ষা ইউরোপের **মণ্ডশিল্প** (Pulp industry) অধিকতর সুপরিচালিত। সুইডেন, নরওয়ে ও ফিনল্যাণ্ডে এই শিল্প সর্বাধিক গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে। দেশের অভ্যন্তর হইতে সমুদ্রতীরে যাতায়াতের সহজ ব্যবস্থা থাকায় এই দেশগুলি অল্পখরচে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া নিকটবর্তী ইউরোপীয় দেশসমূহে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করিতে পারে। এখানে সরলবর্গীয় বৃক্ষের সুবিস্তীর্ণ অরণ্য হইতে নিয়মিতভাবে প্রচুর নরম কাষ্ঠ পাওয়া যায়। পার্বত্য ভূ-প্রকৃতি ও যথেষ্ট বৃষ্টি ও তুষারপাতের ফলে পরিষ্কার জল ও জলশক্তিরও কোন অভাব নাই। ফলে মণ্ড ও কাগজশিল্পের উন্নতিতে কোন বাধা হয় নাই। ইউরোপে মণ্ড প্রস্তুতের জন্য যান্ত্রিক পদ্ধতি অপেক্ষা রাসায়নিক পদ্ধতি অধিক ব্যবহার করা হয়। ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই কাগজের কলগুলি ভোগকেন্দ্রের কাছাকাছি, যেখানে যাতায়াত-ব্যবস্থা, নরমজল ও শক্তি-সরবরাহের সুবিধা রহিয়াছে, সেখানে গড়িয়া উঠিয়াছে।

উত্তর আমোরিকা ও ইউরোপের বাহিরে জাপান কাগজ ও মণ্ডশিল্পে সর্বাপেক্ষা উন্নত। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ইদানীং শিল্পোন্নতি ও শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মণ্ড ও কাগজশিল্পের উন্নতিরও সূচনা হইয়াছে।

কাগজের শ্রেণীর উপর আধুনিক কাগজ-শিল্পের অবস্থান নির্ভর, করে। নিউজপ্রিণ্ট-উৎপাদনকারী আধুনিক বৃহৎ কাগজকলগুলি অরণ্যের নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হয়। উৎকৃষ্টশ্রেণীর কাগজ-উৎপাদনকারী কারখানাগুলি ভোগকেন্দ্রের কাছাকাছি, যেখানে শক্তি ও কাঁচামাল পাইবার সুবিধা আছে,

সেখানে অবস্থিত হয়। মোড়কের কাগজ, কাগজের বোর্ড, টিসু কাগজ প্রভৃতির উৎপাদনের ক্ষুদ্রাকৃতি কারখানাগুলির অবস্থান সম্বন্ধে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম প্রয়োগ করা যায় না।

প্রশ্নাবলী

1. Give an account of the principal types of forests and their world distribution. Indicate the relationship between the climate and the development of forests.

উঃ—'পৃথিবীর অরণ্যবলয়সমূহ' (১০৭ পৃঃ—১১৬ পৃঃ) সংক্ষেপে লিখ।

2. Describe the economic potentialities of the tropical hard-wood forests.

উঃ—'ক্রান্তীয় শক্তকাষ্ঠের অরণ্য' (১০৭ পৃঃ—১১১ পৃঃ) লিখ।

3. Locate the principal soft-wood forest-belt of the world and describe the various commercial uses of the products of these forests.

উঃ—'সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য' (১১২ পৃঃ—১১৪ পৃঃ) লিখ।

4. Explain fully the concept of *conservation of resources* and indicate briefly the need for the conservation of forest resources and these utilization in some countries of the world.

উঃ—দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সম্পদ-সংরক্ষণ' এবং সপ্তম অধ্যায়ের 'অরণ্য-সংরক্ষণ' (১১৬ পৃঃ—১১৮ পৃঃ) লিখ।

5. Describe the region of soft-wood forests in the world and enumerate the geographical factors leading to the localisation of paper industry in their vicinity.

উঃ—'সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য' (১১২ পৃঃ—১১৪ পৃঃ) ও 'কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজশিল্প' (১১৮ পৃঃ—১২০ পৃঃ) লিখ।

6. Classify forests on the basis of climate and give their world distribution. Narrate the commercial uses of the products of temperate forests.

উঃ—'পৃথিবীর অরণ্যবলয়সমূহ' (১০৭ পৃঃ—১১৬ পৃঃ) হইতে এবং 'কাষ্ঠশিল্প' ও 'উপজাত দ্রব্য' (১১৩ পৃঃ—১১৪ পৃঃ এবং ১১৫ পৃঃ—১১৬ পৃঃ) হইতে লিখ।

অষ্টম অধ্যায়

পশুপালন

(The Pastoral Industry)

প্রাচীনকালে মানুষ বন্যপশু শিকার করিয়া জীবন ধারণ করিত। পশুর মাংস খাইয়া এবং চর্ম পরিধান করিয়া তাহারা দিন কাটাইত। সেই যুগের মানুষ পশুকে বশ করিয়া গৃহপালিত পশু হিসাবে পালন করিত না, কারণ তাহারা সর্বদাই একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলিয়া যাইত। ক্রমে ক্রমে সভ্যতার আলোকে আসিয়া মানুষ পশুপক্ষীকে পোষ মানাইবার বৈপ্লবিক পদ্ধতি আবিষ্কার করিল এবং পশুকে বিবিধ কার্যে নিয়োজিত করিতে শিখিল। ইহার পর জীবজন্তু হইতে দুগ্ধ, মাংস, চর্ম, চর্বি, শিং, হাড়, পশম প্রভৃতি দ্রব্য আহরণ করিতে লাগিল। এই সকল জিনিস মানুষের নানাবিধ কার্যে নিয়োজিত হইল। ক্রমশঃই গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিভিন্ন গৃহপালিত পশুর মধ্যে গবাদি পশু ও অশ্ব মানুষ প্রথমে পালন করিতে শিখে। প্রথমে গবাদি পশু ও অশ্ব বনে বাস করিত এবং মানুষ বনে এই সকল পশু শিকার করিয়া জীবন ধারণ করিত। ক্রমে অশ্বকে পোষ মানাইয়া ইহাতে চড়িয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে মানুষ ঘুরিয়া বেড়াইত ও পশু-শিকার করিত। যখন ইহারা গৃহে বাস করিতে শিখিল, তখন গবাদি পশুচারণ করিয়া দুগ্ধ ও মাংস মানুষের **খাদ্য** হিসাবে ব্যবহার করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের জীবনেও গো-পালনের বিচিত্র ইতিহাস পাওয়া যায়। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মেষ, ছাগল প্রভৃতি পালন করিয়া ইহাদের লোম হইতে পশম-শিল্প ও চর্ম হইতে চর্ম-শিল্প গড়িয়া তুলিল। ইহা ছাড়া জীবজন্তুর হাড়, শিং প্রভৃতি দ্রব্যও বিভিন্ন **শিল্পের কাঁচামাল** হিসাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। শীতপ্রধান দেশে পশম পরিধানের অন্যতম প্রধান বস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

প্রাচীন যুগ হইতেই পশু **পরিবহণের** অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এখনও ভারত ও ব্রহ্মদেশে হাতী ভার-বহনে নিযুক্ত হয়। অশ্বপৃষ্ঠে মালপত্র ও মানুষ বহন করা হয়; মরুভূমিতে উষ্ট্রই পরিবহণের প্রধান অবলম্বন। কলিকাতার মতো আধুনিক শহরেও গরু এবং মহিষের গাড়ীতে প্রচুর

মালপত্র প্রেরিত হয়। তুন্দ্রা ভূমিতে বল্গা-হরিণ ও কুকুর পরিবহণের প্রধান অঙ্গ।

বিভিন্ন শ্রমশিল্পে যে-কোন প্রকার **শক্তির** (Power) প্রয়োজন। বর্তমান যুগে কয়লা, খনিজ তৈল বা জলবিদ্যুৎ হইতেই অধিকাংশ শক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রাচীনকালে পশুশক্তির সাহায্যে অধিকাংশ কাজকর্ম করা হইত। এখনও বিভিন্ন কুটীরশিল্পে পশুশক্তি ব্যবহৃত হয়। ভারতের গ্রামাঞ্চলে তৈলের ঘানিতে ও ইক্ষু-পেষণযন্ত্রে এখনও গবাদি পশু ব্যবহৃত হয়। বহু দেশে কৃষিকার্যে গরু-মহিষাদির সাহায্যে লাঙ্গল চালানো হয়।

মানুষ শুধুমাত্র নিজের প্রয়োজনে পশুপালন আরম্ভ করিলেও, ক্রমশঃ পশুজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌বৃত্ত পশুজাত দ্রব্যাদির বাণিজ্য গড়িয়া ওঠে। পূর্বে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ উন্নত না থাকায় পশুজাত দ্রব্যাদির চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। কিন্তু ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের পর এবং উত্তর আমেরিকার অর্থনৈতিক উন্নতি আরম্ভ হইবার পর পশুজাত দ্রব্যাদির চাহিদা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ক্রমশঃ একদেশ হইতে অন্যদেশে পশুজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি হইতে থাকে। আন্তর্জাতিক চাহিদা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পশুপালনের অনুকূল জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলে বৃহদাকার বাণিজ্যিক পশুচারণ-ক্ষেত্র সৃষ্টি হইতে থাকে।

পৃথিবীর বাণিজ্যিক পশুচারণ-ক্ষেত্রসমূহ (Commercial Grazing Grounds of the World)—পশুপালনের জন্য বিশেষ প্রয়োজন তৃণভূমি, যেখানে পশুর প্রধান খাদ্য তৃণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তৃণভূমি পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায় না। যে সকল স্থানে তৃণভূমি জন্মাইবার উপযোগী জলবায়ু ও মৃত্তিকা বিদ্যমান, সেই সকল স্থানেই পশুপালন উন্নতি লাভ করে। পৃথিবীর দুইটি মণ্ডলে প্রধানতঃ বিস্তীর্ণ তৃণভূমি দেখা যায়—(ক) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমি এবং (খ) ক্রান্তীয় মণ্ডলের তৃণভূমি। স্বভাবতঃই এই দুইটি মণ্ডলে পশুপালন-শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। যে সকল তৃণভূমিতে দীর্ঘ তৃণ জন্মে, সেখানে গবাদি পশুপালন করা হয়। কারণ গরু, মহিষ প্রভৃতি পশু ইহাদের বৃহদাকার মুখে দীর্ঘকায় তৃণ খাইতে পারে। যেখানে ক্ষুদ্রকায় তৃণ দেখা যায়, সেখানে ছাগল, মেষ প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় পশু পালিত হয়।

(ক) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমি (Temperate grasslands) —নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি বিদ্যমান। এই তৃণভূমি জন্মিবার জন্য প্রায় ২০° সেঃ গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ এবং ২৫ সেঃ মিঃ হইতে ৭৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে দীর্ঘকায় তৃণ এবং কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ক্ষুদ্রকায় তৃণ জন্মে। এইজন্য নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমি বসন্তকালে নয়নতৃপ্তিকর সবুজ রং ধারণ করে, গ্রীষ্মকালে প্রখর রৌদ্রের উত্তাপে দগ্ধ হইয়া পিঙ্গলবর্ণ হইয়া যায় এবং শীতকালে তুষারাবৃত হইয়া শুভ্র বর্ণে শোভা পায়। বিভিন্ন দেশে এই তৃণভূমি বিভিন্ন নামে পরিচিত। রাশিয়ায় 'স্টেপ্‌স' (Steppes) নামে, উত্তর আমেরিকায় 'প্রেইরী' (Prairies) নামে, দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্বাংশে 'পম্পাস্' (Pampas) নামে, দক্ষিণ আফ্রিকায় 'ভেল্ড্' (Veldt) নামে এবং অস্ট্রেলিয়ায় 'ডাউন্‌স্' (Downs) নামে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বিভিন্ন তৃণভূমি পরিচিত। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের নিম্নলিখিত অঞ্চলের তৃণভূমিতে পশুপালন-শিল্প প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে :—

(১) **উত্তর আমেরিকার** পশ্চিমাংশে কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থলে এবং মেক্সিকোর উত্তরাংশে অবস্থিত 'প্রেইরী' তৃণভূমিতে এই মহাদেশের অধিকাংশ পশু পালিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভুট্টাবলয়ে প্রচুর ভুট্টা উৎপন্ন হওয়ায় ইহা পশুপালন-শিল্পের উন্নতির যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। বর্তমানে এই ভুট্টাবলয় উত্তর আমেরিকার শ্রেষ্ঠ পশুপালন-কেন্দ্র। প্রেইরী অঞ্চল ছাড়াও পশ্চিমাংশের ইণ্টারমনটেন মালভূমিতে বহুসংখ্যক পশু পালিত হয়।

উত্তর আমেরিকার তৃণভূমির অধিকাংশ স্থানে গবাদি পশু ও মেষ পালিত হয়। টেক্সাস্ অঞ্চলে অ্যাঙ্গোরা ছাগলও পালিত হয়। পশুখাদ্য হিসাবে এখানকার ভুট্টা ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া এখানে প্রচুর খড় উৎপন্ন হয়। বিস্তীর্ণ প্রেইরী অঞ্চলের **গবাদি পশু** প্রধানতঃ মাংসের জন্য ব্যবহৃত হয়। কারণ এখানে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের তৃণভূমিতে বা ভুট্টাক্ষেতে মাংস-প্রদায়ী গবাদি পশু ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বহুদিন পরে ইহাদের একবার তাড়াইয়া বধ্য-ভূমিতে আনিয়া কাটা হয়। ঘুরিয়া খাইবার ফলে ইহাদের দেহে মাংসের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যায়। প্রতিদিন বাসস্থানে ইহাদের ফিরিয়া আসিতে হয় না। কিন্তু দুগ্ধ-প্রদায়ী গবাদি পশুকে প্রত্যহ বাসস্থানে আসিয়া

দুগ্ধ দিতে হয় বলিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প পরিসরযুক্ত পশুচারণক্ষেত্রে ইহা পালিত হয়। জলসেচযুক্ত অঞ্চলে অল্প পরিসর স্থানে অধিক তৃণ ও শস্যাদি জন্মে বলিয়া ইহা দুগ্ধ-প্রদায়ী গবাদি পশুপালনের বিশেষ উপযোগী। এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে **মেষ** পালন করা হইয়া থাকে। পশ্চিমাংশের মেষপালনক্ষেত্র হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিন-চতুর্থাংশ পশম আসে। টেক্সাসের পশ্চিমাংশে ও মধ্যাংশে প্রচুর মেষ পালিত হয়। টেক্সাসে এই অঞ্চলের অধিকাংশ অ্যাঙ্গোরা ছাগল পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে পূর্বে পরিবহণের জন্য প্রচুর অশ্ব পাওয়া যাইত। বর্তমানে আধুনিক পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় অশ্বের সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। বর্তমানে এই অঞ্চলের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গো-পালনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান, মেষ-পালনে অষ্টম স্থান, শূকর-পালনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

(২) **দক্ষিণ আমেরিকার** নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির অন্তর্গত আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও দক্ষিণ ব্রেজিল বর্তমানে পশুপালনে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। এখানকার এই তৃণভূমির নাম 'পম্পাস্'। এই তৃণভূমি উচ্চশ্রেণীর গবাদি পশুপালনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পশ্চিমাংশে ৪৫ সেঃ মিঃ এবং পূর্বাংশে ১০০ সেঃ মিঃ। এই বৃষ্টিপাত তৃণ-উৎপাদনের উপযোগী। মৃদু জলবায়ুর দরুন প্রায় সারাবৎসর পশুপালন করা সম্ভব। শীতের সময় পশুর দেহে প্রচুর মাংসের সৃষ্টি হয় বলিয়া এখানকার মাংস-প্রদায়ী পশুর সংখ্যা অনেক বেশী। গো-মাংস-রপ্তানিতে এই অঞ্চলের আর্জেন্টিনা পৃথিবীতে প্রথম স্থান (৪৪%) অধিকার করে। স্থানীয় চাহিদা কম থাকায় অধিকাংশ মাংস রপ্তানি হইয়া থাকে। গমের রপ্তানি-মূল্য বৃদ্ধি পাইলে এখানকার লোক অনেকসময় তৃণভূমি পরিষ্কার করিয়া গমচাষ করে। এই অঞ্চলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মেরিণো মেষ পালিত হয়। এইজাতীয় মেষের গায়ে প্রচুর পশম পাওয়া যায়। মেষ-মাংস-রপ্তানিতে আর্জেন্টিনা পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান (২০%) অধিকার করে। উরুগুয়ের তিন-চতুর্থাংশ জমিতে গবাদি পশু ও মেষ পালিত হয়। এই দেশের মোট রপ্তানির দুই-তৃতীয়াংশ পশুজাত দ্রব্য। এই দেশের যই পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ব্রেজিলের দক্ষিণাংশে এই দেশের অধিকাংশ পশু পালিত হয়। উরুগুয়ে ও ব্রেজিলের পশু মাঝে মাঝে 'টেক্সাস্ জ্বরে' আক্রান্ত হয়। ইহার ফলে বহু পশু মারা যায়। বর্তমানে দক্ষিণ আমেরিকার এই সকল দেশের সরকার পশুপালনের

উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে ; ইহার ফলে এই অঞ্চলের পশুপালনের আরও উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে।

(২) **অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের** বিস্তীর্ণ তৃণভূমি পশুপালনের বিশেষ উপযোগী। আমদানিকারক দেশসমূহ বহুদূরে অবস্থিত হইলেও এই দুইটি দেশ পশুজাত দ্রব্যাদির রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। অস্ট্রেলিয়ার মোট রপ্তানির শতকরা ৬৫ ভাগ এবং নিউজিল্যাণ্ডের মোট রপ্তানির শতকরা ৮০ ভাগ পশুজাত দ্রব্য। অস্ট্রেলিয়ায় জনপ্রতি ১৫টি এবং নিউজিল্যাণ্ডে ২০টি মেষ আছে। অস্ট্রেলিয়া অপেক্ষা নিউজিল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক পরিবেশ পশুপালনের পক্ষে অধিক উপযোগী। অস্ট্রেলিয়ায় কোন কোন বৎসর বৃষ্টিপাতের অভাবে পশুপালনের অসুবিধা হয় ; কিন্তু নিউজিল্যাণ্ডে বৃষ্টিপাতের অভাব কখনই পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া পশুপালনের কোন অসুবিধা হয় না। ইহা ছাড়া নিউজিল্যাণ্ডে সারা-বৎসর তৃণভূমি সবুজ থাকায় খড় মজুত রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। ফলে এখানকার পশুজাত দ্রব্যের খরচ কিছুটা কম। এই অঞ্চলের মেষপালন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মেষপালনে অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। পশম-রপ্তানিতে পৃথিবীতে অস্ট্রেলিয়া প্রথম স্থান এবং নিউজিল্যাণ্ড দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। অস্ট্রেলিয়ায় ২৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত-রেখার পূর্বে অধিকাংশ পশু পালিত হইলেও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশেও পশুপালন-শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। আর্টেজিয়ান কূপ এই দেশের পশুপালনের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। পূর্বে অস্ট্রেলিয়ার বন্য কুকুর (ডিঙ্গো) বহু মেষ মারিয়া ফেলিত এবং বন্য খরগোশ মেষের খাদ্য তৃণ ও জল খাইয়া ফেলিত। এই সকল জন্তুর উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বেড়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া বহু খরগোশের শরীরে বিষাক্ত রোগের জীবাণু ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। এই সকল জীবাণুযুক্ত খরগোশ অন্যান্য খরগোশের সঙ্গে মিশিয়া রোগ ছড়ায়, ফলে লক্ষ লক্ষ খরগোশ মরিয়া যায়। এই জীবাণু সহ্য করিবার শক্তি খরগোশ অর্জন করিলে পুনরায় মেষপালনের অসুবিধা দেখা দিতে পারে। ডিঙ্গো মারিয়া আনিলে পুরস্কার পাইবার ব্যবস্থা থাকায় বহু ডিঙ্গো শিকারীর কবলে পড়িয়াছে। এই সকল অসুবিধা দূর হইবার ফলে বর্তমানে পশুপালনে এই অঞ্চল পৃথিবীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

(৪) **দক্ষিণ আফ্রিকার** 'ভেল্ড্' তৃণভূমি পশুপালনে উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইউরোপীয়গণ আসিবার পূর্বে এই তৃণভূমিতে বন্যপশু ঘুরিয়া বেড়াইত এবং স্থানীয় বাসিন্দারা ইহা শিকার করিত। এই অঞ্চলে ২৫ সেঃ মিঃ হইতে ৭৫ সেঃ মিঃ পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া দীর্ঘ ও ক্ষুদ্র উভয় প্রকার তৃণ জন্মে। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকাংশ তৃণভূমির উচ্চতা ৯০০ মিটার হইতে ১,৮০০ মিটার। এই সকল মালভূমির উচ্চ অংশে শীতকালে বরফ পড়ে বলিয়া বৎসরে প্রায় এক শত দিন পশুপালনে খুবই অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এখানকার মেষপালন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ মেষ উচ্চশ্রেণীর মেরিণো-জাতীয়। পশম-উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। এই দেশের বৃষ্টিবহুল স্থানে গবাদি পশুপালন করা হয়। কিন্তু এখানকার গোমাংস নিম্নশ্রেণীর। ইহা ছাড়া কোন কোন স্থানে ছাগল পালিত হয়।

(৫) উত্তর-পশ্চিম **ইউরোপের** ডেনমার্ক, বৃটেন, হল্যাণ্ড ও জার্মানী এবং পূর্ব ইউরোপের রাশিয়া, হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ডের তৃণভূমিতে প্রচুর গরু ও মেষ পালিত হয়। পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ দুগ্ধ-সংক্রান্ত (Dairy) শিল্পে পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। কারণ এই সকল দেশসমূহে গবাদি পশুর সংখ্যাই বেশী। **রাশিয়ার** স্টেপ্‌স্ তৃণভূমি এবং বৃটেনের ইয়র্কশায়ার মেষপালনে খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছে। রাশিয়া বর্তমানে মেষপালনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান এবং গবাদি পশুপালনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এই দেশের অল্প বৃষ্টিপাত তৃণভূমি-সৃষ্টির পক্ষে খুবই উপযোগী। রাশিয়ার বিভিন্ন কৃষি-খামারেও বহু পশু পালিত হয়। বিপ্লবের পরে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই দেশে বিভিন্ন পশুর সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে নানাবিধ পশুজাত দ্রব্য-উৎপাদনেও এই দেশ পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে।

(খ) ক্রান্তীয় মণ্ডলের তৃণভূমি (Tropical Grasslauds)—ক্রান্তীয় মণ্ডলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল অপেক্ষা বেশী—৫০ সেঃ মিঃ হইতে ১৬০ সেঃ মিঃ। ইহার ফলে অধিকাংশ স্থানে দীর্ঘকায় তৃণ পরিলক্ষিত হয়। এইজাতীয় তৃণ গবাদি পশুপালনের উপযোগী বলিয়া মেষ অপেক্ষা গবাদি পশু ক্রান্তীয় অঞ্চলে অধিক পরিলক্ষিত হয়। এই অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বেশী বৃষ্টিপাত হইলেও অত্যধিক তাপমাত্রায় বৃষ্টিপাতের জল শুকাইয়া জলীয়

বাষ্পে পরিণত হয়। অধিক তাপমাত্রা ও আর্দ্র জলবায়ুর জন্য এখানকার তৃণ পুষ্টিকর হয় না বলিয়া গবাদি পশু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হয় না। ইহা ছাড়া নানাবিধ ক্রান্তীয় ব্যাধির জন্য এখানকার বহু পশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সাপ এবং বন্যপশুও এখানকার বহু পশুর মৃত্যুর কারণ। বর্তমানে এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য বিভিন্ন দেশে পশু-চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার ফলে পশু-মৃত্যুর হার অনেক কমিয়াছে। তাপমাত্রা বেশী বলিয়া এখানকার মেষের পশম খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হয় না। বর্তমানে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সঙ্গে গো-মাংসের রপ্তানি-বাণিজ্যে ক্রান্তীয় অঞ্চল প্রতিযোগিতায় পারিয়া ওঠে না। উপযুক্ত ও পুষ্টিকর পশুখাদ্য-উৎপাদন, পরিবহণের সুব্যবস্থা, পশুরোগ নিবারণের ব্যবস্থা, উচ্চশ্রেণীর পশু দ্বারা প্রজননের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে এই অঞ্চল পশুপালনে আরও উন্নতি লাভ করিবে। ক্রান্তীয় মণ্ডলের নিম্নলিখিত অঞ্চলে পশুপালন বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে :—

(১) **আফ্রিকার স্যাভানা অঞ্চলে** পশুপালন উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই মহাদেশের এক-তৃতীয়াংশে স্যাভানা ঘাস জন্মে। এখানকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬০ সেঃ মিঃ হইতে ১২৫ সেঃ মিঃ। নাইজেরিয়া, সুদান, উগাণ্ডা, কেনিয়া, রোডেসিয়া, ট্যাঙ্গানাইকা, অ্যাঙ্গোলা প্রভৃতি দেশ স্যাভানা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। ইউরোপীয়গণ এই মহাদেশে আসিবার পূর্বেই স্থানীয় অধিবাসিগণ পশুপালনে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। দীর্ঘকায় তৃণ থাকায় এবং তাপমাত্রা অধিক বলিয়া গরু এখানকার প্রধান গৃহপালিত পশু। স্যাভানা অঞ্চলে মাংস-প্রদায়ী গরুর সংখ্যাই বেশী। ইউরোপীয়গণ আসিবার পর হইতে কোন কোন অঞ্চলে দুগ্ধ-প্রদায়ী গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ছাগল, শূকর ও মেষ পালিত হয়। জিরাফ ও জেব্রা এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য তৃণভোজী পশু। এখানকার তৃণভোজী পশুর মাংসের উপর নির্ভরশীল নেকড়ে বাঘ, বন্য শৃগাল, সিংহ, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু স্থানীয় বনে বাস করে। অনেকসময় ইহারা গরু ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু খাইয়া ফেলে।

(২) **দক্ষিণ আমেরিকার** ক্রান্তীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে প্রধানতঃ গরু পালিত হয়। এখানকার স্যাভানা ঘাস গরুর উৎকৃষ্ট খাদ্য। এই মহাদেশের পশুপালনক্ষেত্রসমূহ সমুদ্রের নিকটবর্তী বলিয়া পরিবহণের বিশেষ অসুবিধা হয় না। আফ্রিকার মতো বন্যপশুর ভয় এখানে নাই। কিন্তু

ইউরোপীয়গণ আসিবার পূর্বে এই অঞ্চলে গরু পালিত হইত না। এই অঞ্চলে কয়েকটি বিখ্যাত পশুচারণক্ষেত্র বিদ্যমান ; তন্মধ্যে কলম্বিয়া 'বলিভার স্যাভানা', ভেনেজুয়েলার 'ল্লানোস্', ব্রেজিলের 'ক্যাম্পোস্', উত্তর আর্জেন্টিনা ও পশ্চিম প্যারাগুয়ের 'চাকো' তৃণভূমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার নদীসমূহে প্রায়ই বন্যা হয় ; পশুখাদ্যের সঙ্গে মিশাইবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ লবণ এখানে পাওয়া যায় না ; বিভিন্ন ক্রান্তীয় রোগে বহু পশু ভোগে এবং মারা যায় ; কোন কোন বৎসর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যথেষ্ট হয় না। এই সকল কারণে এখানকার পশু উৎকৃষ্টশ্রেণীর হয় না এবং রপ্তানি-বাণিজ্যে এই অঞ্চলের গোমাংস নিকৃষ্টশ্রেণীর বলিয়া পরিচিত। ক্রান্তীয় অঞ্চলভুক্ত পেরুর দক্ষিণাংশে সমুদ্রবায়ুর জন্য মৃদু জলবায়ু থাকায় আণ্ডিজ পর্বতের পাদদেশে প্রচুর মেষ পালিত হয়। এখানকার মেষ বহুলাংশে স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

(৩) **অস্ট্রেলিয়ার** উত্তরাংশের ও উত্তর-পশ্চিমাংশের ক্রান্তীয় জলবায়ুতে প্রচুর গবাদি পশু পালিত হয়। ২৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত-রেখার পূর্বাংশে অধিকাংশ পশু পালিত হয়। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে পূর্বাংশে ক্রমশঃ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০ সেঃ মিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে যতই পূর্বদিকে যাওয়া যায়, ততই পশুপালনের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। জল সরবরাহের উন্নতি সাধন করিয়া, উচ্চশ্রেণীর ষাঁড় আনিয়া প্রজননের ব্যবস্থা করিয়া, খরগোশের উৎপাত বন্ধ করিয়া এখানকার পশুপালন-শিল্পের উন্নতি সাধন করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রমিকের অভাব এই অঞ্চলের প্রধান সমস্যা। ইহার সমাধান না হইলে এখানকার পশুপালন-শিল্পের অগ্রগতি অব্যাহত থাকিবে কিনা সন্দেহ।

(৪) **ভারতের** ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রচুর গবাদি পশু ও মেষ পালিত হয়। গবাদি পশুর সংখ্যায় ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। নদী-উপত্যকায় এখানকার অধিকাংশ গবাদি পশু পালিত হয়। ভারতের হিন্দুগণ গো-মাংস ভক্ষণ না করায় মাংসের ব্যবসায়ে এই দেশ বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। ক্রান্তীয় ব্যাধি, পশুখাদ্যের অভাব, গো-প্রজননের সুবন্দোবস্তের অভাব ও ব্যবসায়-ভিত্তিক পশুপালন না হওয়ায় এই দেশে গাভী-প্রতি দুগ্ধের পরিমাণ অত্যন্ত কম। নিউজিল্যাণ্ডে সমগ্র দুগ্ধদানকালে (কয়েক মাসে) গাভী-প্রতি প্রায় ৩ মেট্রিক টন দুগ্ধ পাওয়া

যায় ; ভারতে পাওয়া যায় মাত্র ·৮ মেট্রিক টন। জনসাধারণ গরীব বলিয়া ভারতে দুগ্ধের চাহিদা অত্যন্ত কম—বাৎসরিক জন-প্রতি ·১৫ কিলোগ্রাম মাত্র। কৃষিকার্যে লাঙ্গল-টানা ও গাড়ী-চালানো, সেচের জন্য জল-তোলা, তেলের ঘানি-চালানো প্রভৃতি কার্যেও এখানকার গবাদি পশু ব্যবহৃত হয়। ধর্মের অনুশাসনের জন্য গোমাংস-রপ্তানিতে উন্নতি লাভ না করিলেও চর্ম-রপ্তানিতে এই দেশ পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে।

পশু ও পশুজাত দ্রব্য
(Animal and Animal-Products)

গবাদি পশু (Cattle)

প্রাচীনকাল হইতেই গবাদি পশু পালিত হইয়া থাকে। আফ্রিকার দেশ-সমূহে গবাদি পশুর সাহায্যে বিনিময় প্রথা কার্যকরী করা হইত। চীন ও ভারতে প্রাচীনকাল হইতে গরু ও মহিষ কৃষিকার্যে লাঙ্গল চালাইবার জন্য ও ভারবহনের জন্য নিযুক্ত হইত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ক্রমশঃ গবাদি পশুপালন উন্নতি লাভ করে। গবাদি পশু প্রধানতঃ তিনভাবে **ব্যবহার** করা হয়—ভারবহন ও ভূমিকর্ষণে, গো-মাংস ও চর্ম প্রস্তুতে এবং দুগ্ধ-উৎপাদনে। গবাদি পশুর গোময়ও মানুষের প্রয়োজনে আসে ; উৎকৃষ্ট সার হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হয়। এইজন্য ভারতের হিন্দুগণ গরুকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে এবং গোমাংস ভক্ষণ করা পাপ বলিয়া মনে করে। ইহার ফলে ভারতে গো-মাংসের ব্যবসায় উন্নতি লাভ করে নাই। গো-দুগ্ধ হইতে ঘি, মাখন, পনীর প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। অনুন্নত দেশে এখনও গরু ও মহিষের গাড়ীতে মালপত্র প্রেরিত হয় এবং গ্রামাঞ্চলে গরুর গাড়ীতে মানুষ একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করে। গবাদি পশুর চর্ম অত্যন্ত মূল্যবান্ ; ইহা প্রধানতঃ জুতা ও অন্যান্য চর্মদ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। গরু ও মহিষের হাড় সার হিসাবে ব্যবহৃত হয় ; ইহাদের শিং ও খুর হইতে নানাবিধ কারুকার্যখচিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়।

মাংস-প্রদায়ী গবাদি পশু প্রধানতঃ বিস্তীর্ণ দীর্ঘকায় তৃণযুক্ত অঞ্চলে পালিত হয়। ইহাদের জন্য খুব বেশী যত্ন নেওয়া প্রয়োজন হয় না ; বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে বা ভুট্টাক্ষেতে ছাড়িয়া দিলেই হয়। মাংসের প্রয়োজনের সময়

ইহাদের তৃণভূমি হইতে বধ্যভূমিতে লইয়া আসিতে হয়। কিন্তু **দুগ্ধ-প্রদায়ী** গবাদি পশুকে অত্যন্ত যত্নের সহিত পালন করিতে হয়। অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান দিয়া দুগ্ধের পরিমাণ বাড়াইতে হয়। প্রতিদিন দুইবার দুগ্ধ দোহন করিতে হয়। দুগ্ধ-প্রদায়ী গবাদি পশুপালনক্ষেত্রের নিকটেই সাধারণতঃ দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্প উন্নতি লাভ করে।

গবাদি পশুপালন অঞ্চল (Cattle-rearing areas)—গবাদি পশু-পালনের জন্য বিস্তীর্ণ তৃণভূমি প্রয়োজন। দীর্ঘকায় তৃণ ইহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কোন কোন অঞ্চলে ভুট্টা, যব, রাই, যই প্রভৃতি গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। খড়, ভুষি, খইল প্রভৃতি ইহাদের আনুষঙ্গিক খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ বিস্তার্ণ তৃণভূমি অঞ্চলেই অধিকাংশ গবাদি পশু পালিত হয়। অধিক তাপযুক্ত ক্রান্তীয় অঞ্চলে এবং শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গবাদি পশুপালন উন্নতি লাভ করিয়াছে। অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে গবাদি পশুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী।

পৃথিবীর গবাদি পশুর সংখ্যা (১৯৬৩-৬৪)

মোট সংখ্যা—৯৫ কোটি

দেশ	সংখ্যা	দেশ	সংখ্যা
ভারত	১৭ কোটি ৫৬ লক্ষ	চীন	৪ কোটি ৪৫ লক্ষ
মঃ যুক্তরাষ্ট্র	৯ „ ৯৫ „	আর্জেন্টিনা	৪ „ ৪০ „
রাশিয়া	৮ „ ২০ „	ফ্রান্স	২ „ ০৫ „
ব্রেজিল	৭ „ ৬২ „	পঃ জার্মানী	১ „ ৩৩ „

ভারত—পৃথিবীতে গবাদি পশুপালনে প্রথম স্থান অধিকার করিলেও গো-মাংস উৎপাদন ও রপ্তানিতে এবং দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পে এই দেশ বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। হিন্দুরা গো-মাংস ভক্ষণ করা এবং গো-মাংসের ব্যবসায় করা ধর্মবিগর্হিত কাজ বলিয়া মনে করে। এইজন্য মাংস-রপ্তানিতে এই দেশ বিশেষ কোন অংশগ্রহণ করে না। বহু গরু ভূমিকর্ষণে ও ভারবহনে নিযুক্ত হয় বলিয়া এবং গাভা-প্রতি দুগ্ধ-উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত কম বলিয়া উদ্‌বৃত্ত দুগ্ধ বেশী পরিমাণে না পাওয়ায় দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্প উন্নতি লাভ করে নাই। ভারতে গো-পালনের জন্য উপযুক্ত জলবায়ু থাকায় গবাদি পশুর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী। অধিকাংশ গবাদি পশু গৃহপালিত পশু হিসাবে পালিত হয়; বৃহদাকার বাণিজ্যিক পশুচারণক্ষেত্রের সংখ্যা খুব কম। মধ্যপ্রদেশ,

মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যে অধিকাংশ গবাদি পশু পালিত হয়। অন্যান্য রাজ্যেও অল্পবিস্তর গবাদি পশু পাওয়া যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—গবাদি পশুপালনে এই দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বিস্তীর্ণ প্রেইরী তৃণভূমি ও ভুট্টাক্ষেত প্রধানতঃ গোপালনের জন্য ব্যবহৃত হয় (১২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পূর্বাঞ্চলে ভুট্টাবলয়ে প্রধানতঃ দুগ্ধের জন্য এবং পশ্চিমাঞ্চলের তৃণভূমিতে প্রধানতঃ মাংসের জন্য গবাদি পশু পালিত হয়। স্থানীয় চাহিদা অত্যন্ত বেশী বলিয়া গো-মাংস রপ্তানি করা এই দেশের পক্ষে সম্ভব নহে। চিকাগো, সেণ্ট লুই, সেণ্ট পল্‌স্ প্রভৃতি এই দেশের মাংস ও দুগ্ধ-ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। **কানাডার** বিস্তীর্ণ প্রেইরী তৃণভূমিতে গবাদি পশু পালিত হয়। এই দেশ দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পেও বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

রাশিয়া—বর্তমানে এই দেশ গো-পালনে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। স্টেপ্‌স্ অঞ্চলে অধিকাংশ গবাদি পশু পালিত হয়। রাষ্ট্রীয় ও যৌথ কৃষি-খামারেও পশুপালনের সুবন্দোবস্ত আছে। পঞ্চবার্ষিকী
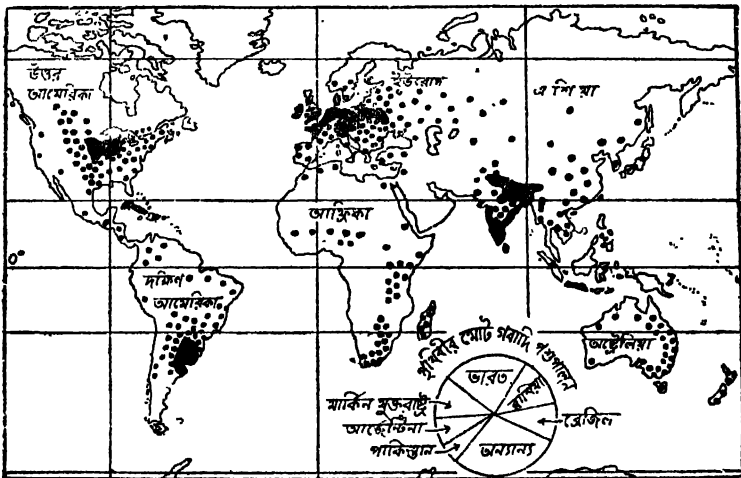
পরিকল্পনার মারফত পশুপালন-শিল্পের প্রভূত উন্নতিসাধন করা হইয়াছে। ভুট্টা ও অন্যান্য পশুখাদ্য এই দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বর্তমানে মোট পশুখাদ্য-উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৪·৮ কোটি মেঃ টন। এখানকার গবাদি পশু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর বলিয়া গাভী-প্রতি ২,৭০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত দুগ্ধ

পাওয়া যায়। মাংস ও চর্ম-উৎপাদন এবং দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পের উন্নতির জন্য এই দেশের গবাদি পশু ব্যবহৃত হয়।

দক্ষিণ আমেরিকা—এই মহাদেশের ব্রেজিল গবাদি পশুপালনে পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের পম্পাস্, উত্তর আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়ের চাকো, ভেনেজুয়েলার ল্লানোস্, কলম্বিয়ার বলিভার স্যাভানা তৃণভূমি গবাদি পশুপালনের জন্য বিখ্যাত (১২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অধিকাংশ পশু মাংসের জন্য ব্যবহৃত হয় ; স্থানীয় চাহিদা অনেক কম। সেইজন্য আর্জেন্টিনা গো-মাংস (Beef)-রপ্তানিতে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

ইউরোপের দেশসমূহের মধ্যে ফ্রান্স, জার্মানী, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বৃটেন, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশ গো-পালনে উন্নতি লাভ করিয়াছে। বিস্তৃত তৃণভূমি না থাকায় অল্প জায়গার মধ্যে এখানে পশুপালনের বন্দোবস্ত করিতে হয়। সেইজন্য এই সকল দেশে সাধারণতঃ দুগ্ধ-প্রদায়ী গবাদি পশু পালিত হয়। ডেনমার্ক দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির রপ্তানিতে পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। অন্যান্য দেশেও দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। পশ্চিম ইউরোপের মাংস-প্রদায়ী গবাদি পশুর সংখ্যা অল্প হইলেও, ইহা অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর বলিয়া পশু-প্রতি অধিক মাংস পাওয়া যায়।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের স্যাভানা অঞ্চলে অধিকাংশ গবাদি পশু পালিত হয় (১২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশের ক্রান্তীয় অঞ্চলে এই দেশের প্রায় অর্ধেক গবাদি পশু পাওয়া গেলেও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় প্রচুর গবাদি পশু পাওয়া যায়। স্থানীয় চাহিদা কম থাকায় গো-মাংস ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির রপ্তানিতে এই দেশ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। এই দেশের তিন-চতুর্থাংশ গবাদি পশু মাংসের জন্য এবং এক-চতুর্থাংশ দুগ্ধের জন্য পালিত হইয়া থাকে।

নিউজিল্যাণ্ডের তৃণভূমি অঞ্চলেও গবাদি পশু পালিত হয়। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়া উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গরু পালিত হয়। এই দেশে গাভী-প্রতি দুগ্ধের পরিমাণ বৎসরে প্রায় ৩,০০০ কিলোগ্রাম।

বাণিজ্য (Trade)—পূর্বে একদেশ হইতে অন্যদেশে মাংস রপ্তানি করা কষ্টকর ছিল ; কারণ ইহা গরমে পচিয়া যাইত। হিমায়ন যন্ত্রের আবিষ্কারের পরে মাংস রপ্তানির উন্নতি হইয়াছে। গো-পালনে ভারত শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার

করিলেও ধর্মের নিষেধ থাকায় **গো-মাংস রপ্তানি** করিতে পারে না। গো-পালনে আর্জেন্টিনার স্থান অনেক নীচে হইলেও স্থানীয় চাহিদা কম থাকায় এই দেশ গো-মাংস-রপ্তানিতে প্রথম স্থান অধিকার করে। রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় হিমশীতল প্রকোষ্ঠযুক্ত জাহাজ আমদানিকারক দেশসমূহ সরবরাহ করে। পশুপালন কেন্দ্র হইতে গবাদি পশু বিভিন্ন বন্দরে অবস্থিত বধ্যভূমিতে আনা হয়। সেখান হইতে সরাসরি জাহাজে গো-মাংস ভর্তি করা হয়। গো-মাংস আর্জেন্টিনার অন্যতম প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য। গো-মাংস-রপ্তানিতে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় স্থ্যান অধিকার করে। ব্রেজিল, উরুগুয়ে, নিউজিল্যাণ্ড, কানাডা প্রভৃতি দেশও প্রচুর পরিমাণে গো-মাংস রপ্তানি করে।

গো-মাংসের বাণিজ্য (শতকরা অংশ)

রপ্তানিকারক দেশ		আমদানিকারক দেশ	
আর্জেন্টিনা	৪৪%	বৃটেন	৬৬%
অস্ট্রেলিয়া	১২%	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৬·৫%
নিউজিল্যাণ্ড	১১%	বেলজিয়াম	৩%
উরুগুয়ে	১১%	ইটালি	৩%
কানাডা	৭·৫%	স্পেন	৩%
ব্রেজিল	২·৫%		

আমদানিকারক দেশসমূহের মধ্যে বৃটেন প্রথম স্থান অধিকার করে। বৃটেনের মানুষ অত্যধিক মাংস খায় বলিয়া এবং স্থানীয় উৎপাদন কম হওয়ায় এই দেশকে প্রচুর **গো-মাংস আমদানি** করিতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর গবাদি পশুপালন করিলেও স্থানীয় চাহিদা অত্যন্ত বেশী হওয়ায় এই দেশ গো-মাংস-আমদানিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ইহা ছাড়া ইটালি, স্পেন, বেলজিয়াম, জার্মানী গো-মাংস আমদানি করিয়া থাকে। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহে উচ্চশ্রেণীর গবাদি পশু পাওয়া যায় বলিয়া এই সকল দেশ হইতে গবাদি পশু অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহে প্রজননের জন্য রপ্তানি হইয়া থাকে; দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির বাণিজ্য সম্বন্ধে (পরে ১৩৬ পৃঃ) আলোচনা করা হইয়াছে।

গবাদি পশুর **চর্ম (Hides)** মানুষের নানাবিধ (জুতা, ব্যাগ প্রভৃতি) প্রয়োজনে আসে। এইজন্য চর্মের বহির্বাণিজ্য বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

ভারত গো-মাংস-রপ্তানিতে অংশগ্রহণ না করিলেও মৃত গবাদি পশুর চর্ম-রপ্তানিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। সকল প্রকার (দুগ্ধ-প্রদায়ী' মাংস-প্রদায়ী, ভারবহনকারী) গবাদি পশু হইতেই চর্ম সংগ্রহ করা হয়। আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশও প্রচুর পরিমাণে চর্ম রপ্তানি করে। বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানী চর্মের প্রধান আমদানিকারক।

দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্প (Dairy Industry)—গবাদি পশুর সংখ্যা বেশী থাকিলেই কোন দেশ দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। কারণ গাভী হইতে যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ না পাওয়া গেলে এই শিল্পের উন্নতি-সাধন সম্ভব নহে। গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ প্রভৃতি পশু হইতে দুগ্ধ পাওয়া গেলেও পৃথিবীর অধিকাংশ দুগ্ধ গরু ও মহিষ হইতে পাওয়া যায়। দুগ্ধ হইতে ঘি, মাখন ও পনীর উৎপন্ন হয়। দুগ্ধ-প্রদায়ী গবাদি পশুপালনের জন্য এবং দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য নিম্নলিখিত **প্রাকৃতিক** ও **অর্থনৈতিক অবস্থা** বিশেষ প্রয়োজন :—(১) গ্রীষ্মকালে পরিমিত বৃষ্টিপাত একান্ত প্রয়োজন। মাঝারি বৃষ্টিপাতে দীর্ঘ ও পুষ্টিকর তৃণ জন্মায়। (২) মৃদু শীতকাল থাকিলে গবাদি পশু সারাবৎসর বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে চরিয়া বেড়াইতে পারে। (৩) গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ অপেক্ষাকৃত শীতল হইলে গবাদি পশু হইতে দুগ্ধ উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায়। (৪) তৃণভূমি ও অন্যান্য পশুখাদ্যের জন্য আর্দ্র দো-আঁশ মৃত্তিকা প্রয়োজন। (৫) দুগ্ধ দ্রুত চলিয়া যায় বলিয়া, ইহা দ্রুত প্রেরণের জন্য পরিবহণের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা থাকা দরকার। (৬) বন্ধুর ভূ-প্রকৃতিতে কৃষিকার্য সম্ভব নয় বলিয়া অন্যান্য পরিবেশ অনুকূল থাকিলে এই শিল্প উন্নতি লাভ করিতে পারে। (৭) জনবহুল দেশে শ্রমিকের অভাব না থাকায় এবং চাহিদা বেশী বলিয়া এই শিল্প সহজে উন্নতি লাভ করে।

এই সকল প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা স্বভাবতঃই নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে দেখা যায় বলিয়া এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পে উন্নতি লাভ করিয়াছে। আধুনিক সভ্যতার যুগে শহরাঞ্চলে গবাদি পশুর দুগ্ধ, মাখন সরাসরি পাওয়া কষ্টকর। সেইজন্য বর্তমানে গুঁড়া দুগ্ধ, ঘনীভূত দুগ্ধ, ঘি, পনীর প্রভৃতির উপর মানুষ অধিক নির্ভর করে। এই সকল দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রধানতঃ পৃথিবীর চারিটি অঞ্চলে এই শিল্প সুশৃঙ্খলভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে :—উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ, উত্তর আমেরিকার হ্রদ

অঞ্চলের দক্ষিণ ও পূর্বদিকের স্থানসমূহ, রাশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ড অঞ্চল।

উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের জার্মানী, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বৃটেন, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। গাভী-প্রতি দুগ্ধের পরিমাণ এই অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বেশী। দুগ্ধ-উৎপাদনে এই অঞ্চলের জার্মানী পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। মাখন-উৎপাদনে ডেনমার্ক পৃথিবীতে প্রথম স্থান এবং জার্মানী চতুর্থ স্থান অধিকার করে। পনীর-উৎপাদনে হল্যাণ্ড পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এখানকার এক একটি দেশ কোন একটি দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। ডেনমার্কের মাখন এবং হল্যাণ্ডের পনীর জগদ্বিখ্যাত। এই দুইটি দেশের জনসংখ্যা কম বলিয়া রপ্তানি-বাণিজ্যে ইহারা পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। ডেনমার্কে প্রায় ৯,০০০ সমবায় প্রতিষ্ঠানের মারফত দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্প চালিত হয়। এখানকার সমবায় প্রথা অত্যন্ত কার্যকরী। দেশের মোট দুগ্ধের শতকরা ৮০ ভাগ মাখন-উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। ডেনমার্কের মোট রপ্তানির তিন-চতুর্থাংশ দুগ্ধজাত দ্রব্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভুট্টাবলয়ের পূর্বদিকে দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্প সুন্দরভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দেশ পৃথিবীতে দুগ্ধ-উৎপাদনে দ্বিতীয়, পনীর-উৎপাদনে প্রথম এবং মাখন-উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। হ্রদ অঞ্চলের শহরগুলি দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পের কেন্দ্রস্থল। কানাডার প্রেইরী অঞ্চলেও এই শিল্পের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

অস্ট্রেলিয়া ও **নিউজিল্যাণ্ড** দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। এখানকার গাভী-প্রতি দুগ্ধ-উৎপাদন অত্যন্ত বেশী। স্থানীয় চাহিদা কম থাকায় অধিকাংশ ঘনীভূত ও গুঁড়া দুগ্ধ, মাখন ও পনীর বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। এইজন্য সমুদ্রপ্রান্তের বন্দরসমূহের নিকটেই অধিকাংশ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। স্থানীয় সরকার দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনে ও রপ্তানিতে যথেষ্ট সহায়তা করে।

রাশিয়ায় সম্প্রতি দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারে অত্যন্ত যত্নের সহিত গবাদি পশু পালিত হয়। এই দেশে গড়ে গাভী-প্রতি ১,৯১৩ কিলোগ্রাম দুগ্ধ পাওয়া যায়। রাষ্ট্রীয় খামারে গাভী-প্রতি ২,৭০০ কিলোগ্রাম দুগ্ধ পাওয়া যায়। বর্তমানে দুগ্ধ-উৎপাদনে এই দেশ

পৃথিবীতে প্রথম এবং মাখন-উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পনীর-উৎপাদনেও এই দেশ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে।

ইহা ছাড়া চীন, ইটালি, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশও দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদনে উন্নতি লাভ করিয়াছে।

দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির ডৎপাদন (১৯৬৩)

(লক্ষ মেঃ টন)

	দুগ্ধ	মাখন	পনীর		দুগ্ধ	মাখন	পনীর
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৭২৮	৭·০	৭·১	নিউজিল্যাণ্ড	৫৪	২·১	১·০
রাশিয়া	৬৪২	৯·৪	২·৫	বৃটেন	১২৬	·৬	১·১
অস্ট্রেলিয়া	৬৮	২·৩	·৬	আর্জেন্টিনা	৪৪	·৫	১·৪
কানাডা	৮৮	১·৭	·৬	ডেনমার্ক	৫৪	১ ৭	১·১
পূর্ব জার্মানী	৫৯	১·৭	·১৮	হল্যাণ্ড	৭২	১·০	২·২
পশ্চিম জার্মানী	২০১	৪·৫	১·৬	ফ্রান্স	২৪২	২·৭	৪·৮

বাণিজ্য (Trade)—দুগ্ধ-রপ্তানিকারক দেশসমূহের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, হল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, কানাডা ও নিউজিল্যাণ্ড বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃটেন, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, জাপান, মালয়, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি প্রধান আমদানিকারক দেশ। বিভিন্নভাবে দুগ্ধ রপ্তানি হয়: গুঁড়া দুগ্ধ, ঘনীভূত দুগ্ধ হিসাবে প্রধানতঃ ইহা রপ্তানি হয়। নিকটবর্তী দেশে টাটকা দুগ্ধও রপ্তানি হইয়া থাকে। মাখন-রপ্তানিকারক দেশসমূহের মধ্যে নিউজিল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া, হল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃটেন, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড অধিকাংশ মাখন আমদানি করে। পনীর-রপ্তানিকারক দেশসমূহের মধ্যে নিউজিল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, হল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও ডেনমার্ক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃটেন, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, আলজেরিয়া প্রভৃতি দেশ প্রধানতঃ পনীর আমদানি করে।

মেষ (Sheep)

পশুপালন-শিল্পে গবাদি পশুর পরেই মেষের স্থান। প্রধানতঃ মাংস (Mutton) ও পশমের (Wool) জন্য মেষ পালিত হয়। কোন কোন স্থানে মেষ হইতে অল্প পরিমাণে দুগ্ধও পাওয়া যায়। শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পশমী বস্ত্র প্রয়োজন। সেইজন্য শীতপ্রধান দেশে অধিকাংশ পশম এবং পশমী বস্ত্র উৎপন্ন হয়।

মেষপালনের ভৌগোলিক অবস্থা (Geographical Conditions for Sheep-grazing)—মেষ ক্ষুদ্রকায় তৃণ খাইয়া প্রধানতঃ জীবন ধারণ করে। সেইজন্য নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমি মেষপালনের উপযোগী। কারণ এখানকার অল্প বৃষ্টিপাতে ক্ষুদ্রকায় তৃণভূমির সৃষ্টি হয়। মোটামুটি ১০° সেঃ হইতে ২৫° সেঃ উত্তাপ, ২৫ সেঃ মিঃ হইতে ৭৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত এবং পাহাড়ের উঁচু-নীচু জমি মেষপালনের পক্ষে উৎকৃষ্ট। শীতল ও শুষ্ক স্থানে মেষের গায়ে পশমের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অত্যধিক শীতল আবহাওয়া মেষের পশম নষ্ট করিয়া ফেলে। সেইজন্য উত্তর গোলার্ধ অপেক্ষা দক্ষিণ গোলার্ধে পশম-প্রদায়ী মেষের সংখ্যা অনেক বেশী।

মেষপালন অঞ্চল (Sheep-rearing areas)—ব্যবহার অনুসারে মেষকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—মাংস-প্রদায়ী মেষ এবং পশম-প্রদায়ী মেষ।

পৃথিবীর মেষপালন অঞ্চল (১৯৬৩)

মোট সংখ্যা—৯৯ কোটি

দেশ	কোটি	লক্ষ	দেশ	কোটি	লক্ষ
অস্ট্রেলিয়া	১৫ কোটি	২৭ লক্ষ	নিউজিল্যাণ্ড	৪ কোটি	৮৪ লক্ষ
রাশিয়া	১৩ "	৩০ "	ভারত	৪ "	৩
চীন	৬ "	৮ "	দক্ষিণ আফ্রিকা	৩ "	৭৮
আর্জেন্টিনা	৪ "	৯০ "	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩ "	৩০

মাংস-প্রদায়ী মেষপালনের জন্য তৃণবহুল বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রয়োজন
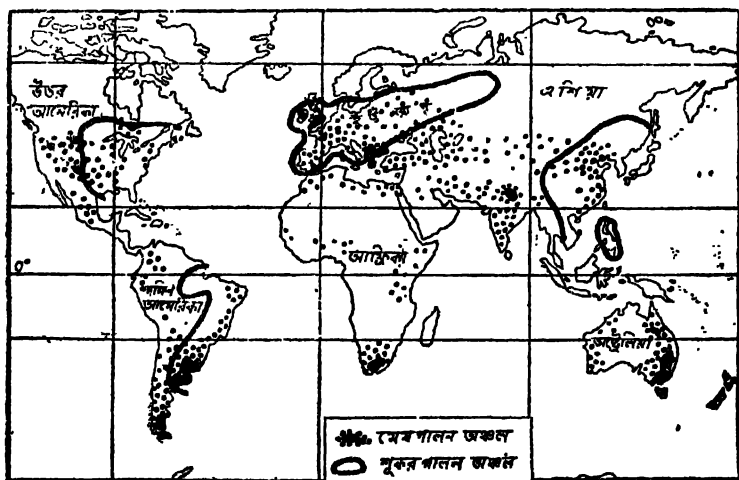
অধিক তৃণ ভক্ষণ করিলে মেদ বেশী হয় বলিয়া তৃণবহুল স্থানের মেষ হইতে

অধিক পরিমাণে মাংস পাওয়া যায়। মেষ-মাংস-উৎপাদনে রাশিয়া শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। চীন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা, ভারত, বৃটেন, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশেও প্রচুর মেষ-মাংস উৎপন্ন হয়।

মেষ-মাংস ও মেষশাবক (মাংসের জন্য) রপ্তানিতে নিউজিল্যাণ্ড প্রথম (৬৩%), আর্জেন্টিনা দ্বিতীয় (২০%) এবং অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় (১২%) স্থান অধিকার করে। রাশিয়া ও চীন প্রচুর পরিমাণে মেষ-মাংস উৎপন্ন করিলেও স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়া ইহাদের পক্ষে রপ্তানি-বাণিজ্যে অংশ-গ্রহণ করা সম্ভব নহে। আমদানিকারক দেশসমূহের মধ্যে বৃটেন প্রথম স্থান (৯৫%) অধিকার করে।

পশম (Wool)—পশম-প্রদায়ী মেষ হইতে উৎপন্ন পশম **তিন প্রকার**। আফ্রিকার উদ্ভূত 'মেরিণো' মেষের পশম সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এইজাতীয় মেষ বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, নিউজিল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে প্রভৃতি দেশেও পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মিশ্র-জাতির মেষ হইতে দীর্ঘ-আঁশযুক্ত পশম পাওয়া যায়। নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, পেরু প্রভৃতি দেশে এইজাতীয় পশম পাওয়া যায়। এশিয়া, রাশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় কর্কশ স্থূল পশমযুক্ত মেষ পালিত হয়। ইহাদের পশম নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

পশম-উৎপাদনকারী অঞ্চল (Wool-producing areas)—দক্ষিণ গোলার্ধের জলবায়ু পশম-প্রদায়ী মেষপালনের বিশেষ উপযোগী। এখানে অত্যধিক শীতল জলবায়ু না থাকায় মেষের পশম নষ্ট হইতে পারে না।

অস্ট্রেলিয়া	৮ লক্ষ	৯ হাজার	মেঃ টন		আর্জেন্টিনা	২ লক্ষ	১ হাজার	মেঃ টন
রাশিয়া	৩ „	৫০ „	„		দঃ আফ্রিকা	১ „	৪৪ „	„
নিউজিল্যাণ্ড	২ „	১৬ „	„		মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	১ „	২০ „	„

Source—F. A. O. Monthly Bulletin, March, 1965.

অস্ট্রেলিয়া মেষপালনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এখানকার অধিকাংশ মেষ পশমের জন্য প্রতিপালন করা হয় বলিয়া পশম-উৎপাদনে ও রপ্তানিতে এই দেশ শ্রেষ্ঠ স্থান অরিকার করে। দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ২৫-৭৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে

অধিকাংশ মেষ পালিত হয় (১২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এখানকার অধিকাংশ পশম বৃটেনে প্রেরিত হয়। **নিউজিল্যাণ্ড** পশম-উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এখানকার মৃদু জলবায়ু ও বিস্তীর্ণ তৃণভূমি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মেষপালনের সহায়ক। দক্ষিণাংশের পার্বত্য অঞ্চলে 'মেরিণো' মেষ, উত্তরাংশে 'রোমনে' মেষ এবং ক্যান্টারবেরী সমভূমিতে মিশ্রজাতীয় মেষ পালিত হয়। পশমের রপ্তানি-বাণিজ্যেও এই দেশ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

রাশিয়া ক্রমশঃই মেষপালনে উন্নতি লাভ করিতেছে। পূর্বে এই দেশে পশমের পরিমাণ অত্যন্ত কম ছিল কিন্তু বর্তমানে এই দেশ পশম-উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই দেশের পশম অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইলেও অত্যধিক শীতের জন্য এখানে স্থানীয় পশমের প্রচুর চাহিদা বিদ্যমান। স্টেপ্‌স্ অঞ্চলে অধিকাংশ পশম-প্রদায়ী মেষ পালিত হয়। সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ১৯৬৫ সালে এই দেশের পশম-উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ৫'৪ লক্ষ মেঃ টনে দাঁড়াইবে।

আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের নীতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পম্পাস্ তৃণভূমিতে ৫০-১০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে প্রচুর পশম-প্রদায়ী মেষ পালিত হয় (১২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এখানকার পশম খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর না হইলেও, অধিকাংশ পশম পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে সহজেই রপ্তানি হইয়া থাকে। **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের** উত্তর-পশ্চিমাংশের পার্বত্য অঞ্চলে অধিকাংশ পশম-প্রদায়ী মেষ পালিত হয়। অত্যধিক শীতের জন্য এখানকার পশম খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হয় না। বর্তমানে মিশ্র-প্রজননের সাহায্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পশম উৎপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে। স্থানীয় চাহিদা বেশী বলিয়া বিদেশ হইতে প্রচুর পশম আমদানি করা হয়। **দক্ষিণ আফ্রিকার** উচ্চ ভেল্ড্ তৃণভূমিতে ৫০-১০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে পশম-প্রদায়ী মেষ পালিত হয়। উচ্চশ্রেণীর বৃটিশ ও মেরিণো মেষ দ্বারা প্রজননের ফলে এখানকার পশম অত্যন্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হইয়া থাকে। এই দেশের অধিকাংশ পশম বৃটেনে প্রেরিত হয়। ভারত ও চীনের পশম নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া ইহা প্রধানতঃ কার্পেট প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া বৃটেন, স্পেন, উরুগুয়ে, চিলি, পেরু, কানাডা প্রভৃতি দেশেও পশম উৎপন্ন হয়।

বাণিজ্য (Trade)—অধিকাংশ পশমবয়ন-শিল্প উত্তর গোলার্ধের শিল্প-প্রধান দেশসমূহে অবস্থিত। কিন্তু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অধিকাংশ পশম উৎপন্ন

হয় দক্ষিণ গোলার্ধের দেশসমূহে। দক্ষিণ গোলার্ধের পশম-উৎপাদনকারী দেশসমূহে লোকসংখ্যা কম এবং ইহারা এখনও পশমবয়ন-শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। এইজন্য পশমের মোট রপ্তানির শতকরা ৯৮ ভাগ দক্ষিণ গোলার্ধের দেশসমূহ হইতে আসে। আমদানিকারক দেশ-সমূহ সম্পূর্ণতঃ উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত।

রপ্তানিকারক দেশসমূহ		আমদানিকারক দেশসমূহ	
অস্ট্রেলিয়া	৩৯০	বৃটেন	১৭৬
নিউজিল্যাণ্ড	১৮২	জাপান	১১৪
আর্জেন্টিনা	৮৯	ফ্রান্স	১০৫
দক্ষিণ আফ্রিকা	৬৮	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১০৩
উরুগুয়ে	২৬	ইটালি	৮০

মেষ হইতে প্রধানতঃ পশম উৎপন্ন হইলেও, অন্যান্য জন্তুর লোম হইতেও পশম পাওয়া যায়। চীনদেশে ছাগল ও উটের লোম হইতে, রাশিয়ার তুর্কিস্তানে উটের লোম হইতে, দক্ষিণ আফ্রিকায় অ্যাঙ্গোরা ছাগলের লোম হইতে, কাশ্মীর ও তিব্বতে ছাগলের লোম হইতে পশম উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ আমেরিকার ভাইকুলা নামক একপ্রকার বন্যজন্তুর লোম হইতে সূক্ষ্ম পশম উৎপন্ন হয়, এই মহাদেশের আণ্ডিজ পর্বতের পাদদেশে আলপাকা, লামা প্রভৃতি জন্তুর লোম হইতে পশম উৎপন্ন হয়।

শূকর (Pig)

মাংস ও চর্বির জন্য প্রধানতঃ শূকর পালন করা হয়। নিকৃষ্ট জিনিস ও আবর্জনা খাইয়া শূকর বাঁচিতে পারে বলিয়া এবং প্রায় সকল প্রকার জল-বায়ুতে শূকর বাস করিতে পারায়, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে কমবেশী শূকর দেখা যায়। ভুট্টা খাইলে শূকরের চর্বি ও মাংস বৃদ্ধি পায় বলিয়া ভুট্টা অঞ্চলে শূকরপালন খুবই লাভজনক। শূকর একবারে অনেকগুলি বাচ্চা দেয় বলিয়া শূকর-মাংস উৎপাদনের খরচ অনেক কম।

শূকর-পালন অঞ্চল (Pig-rearing areas)—চীনদেশে সর্বাপেক্ষা বেশী (১৮ কোটি) শূকর পাওয়া যায়। শূকরের মাংস চীনাদের উৎকৃষ্ট খাদ্য

এই দেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই কমবেশী শূকর পালিত হয়। **রাশিয়া** শূকর-পালনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান (৭ কোটি) অধিকার করে। ইউরোপীয় রাশিয়ায় প্রায় সর্বত্রই শূকর পালিত হয়। আলজেরিয়া হইতে পাকিস্তান পর্যন্ত মুসলমানপ্রধান দেশে শূকরপালন হয় না। কারণ ইস্‌লাম ধর্ম অনুসারে মুসলমানগণ মনুষ্য-পুরীষ-খাদক শূকরের মাংস খাইতে পারে না। **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের** ভুট্টাবলয়ে প্রচুর শূকর (৫·৭ কোটি) পাওয়া যায়। শূকরপালনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় স্থান অধিকার করে। শূকরের মাংস ও চর্বি টিনবন্দী করিয়া প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। আইওয়া ও মিসৌরী রাজ্য শূকরপালনের জন্য বিখ্যাত। চিকাগো বন্দর শূকর-মাংস ও চর্বি রপ্তানির শ্রেষ্ঠ বন্দর। বর্তমানে জাহাজের হিমপ্রকোষ্ঠে তাজা মাংস বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা সহজ। **পশ্চিম ইউরোপের** দেশসমূহের মধ্যে ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, জার্মানী, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশ শূকরপালনে উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই সকল দেশের উৎপন্ন মাংস স্থানীয় চাহিদা মিটাইতে ব্যয় হয়। **দক্ষিণ আমেরিকার** ব্রেজিল ও আর্জেন্টিনায় প্রচুর শূকর পাওয়া যায়; এখানকার মেষের তুলনায় শূকরের সংখ্যা অনেক কম।

শূকরের মাংস (Pork, Bacon, Ham) ও চর্বি (Lard) **রপ্তানিতে** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। কানাডা, ডেনমার্ক, আয়ারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশও শূকরের মাংস রপ্তানি করে। **আমদানি**কারক দেশসমূহের মধ্যে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উপজাত দ্রব্য (By-products)—পশুচর্মের সাহায্যে চর্মশিল্প বিভিন্ন দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে। গরু, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতি বৃহদাকার জন্তুর চর্মকে **স্থূল** চর্ম (Hides) এবং ছাগল, মেষ প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় জন্তুর চর্মকে সূক্ষ্ম চর্ম (Skin) বলে। গরু ও মহিষের চর্মই পশুচর্মের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সম্বন্ধে পূর্বে (১৩৩ পৃষ্ঠা) আলোচনা করা হইয়াছে। ব্যবসায়িক চর্মের মধ্যে হাঙ্গর, খেঁকশিয়াল, বানর, সাপ প্রভৃতির চর্মও অন্তর্ভুক্ত। ভারত, চীন, ব্রেজিল ও মেক্সিকোতে ছাগ-চর্ম এবং অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে মেষের চর্ম পাওয়া যায়।

বিভিন্ন পশুর হাড় হইতে বোতাম, চিরুনী ও নানাবিধ কারুকার্য-খচিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বিভিন্ন পশু হইতে সূক্ষ্ম

কোমল লোম (Fur) পাওয়া যায়। শীতপ্রধান দেশে ইহার আদর সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্নাবলী

1. Describe briefly the principal commercial grazing grounds of the world and indicate their future potentialities.

উঃ—'পৃথিবীর বাণিজ্যিক পশুচারণ-ক্ষেত্রসমূহ' (১২২ পৃঃ—১২৯ পৃঃ) সংক্ষেপে লিখ।

2. Describe the world distribution of cattle. What do you know about the beef-trade in the present-day world.

উঃ—'গবাদি পশুপালন অঞ্চল' ও 'গো-মাংসের বাণিজ্য' (১৩০ পৃঃ—১৩৪ পৃঃ) লিখ।

3. What are the geographical and economic conditions for the development of Dairy industry ? Mention the countries which have specialised in this industry.

উঃ—'দুগ্ধ-সংক্রান্ত শিল্প' (১৩৪ পৃঃ—১৩৬ পৃঃ) লিখ।

4. What are the conditions of success in the production of commercial wool ? Describe the principal wool-producing countries of the world and indicate the nature of world trade in wool.

উঃ—'মেষ' হইতে 'মেষপালনের ভৌগোলিক অবস্থা' (১৩৭ পৃঃ) লিখ এবং 'পশম-উৎপাদনকারী অঞ্চল' ও 'বাণিজ্য' (১৩৮ পৃঃ—১৪০ পৃঃ) লিখ।

5. What are the geographical conditions under which commercial sheep-grazing has developed ? Explain why the woollen industry has not developed in the three southern continents that are principal producers of wool.

উঃ—'মেষপালনের ভৌগোলিক অবস্থা' (১৩৭ পৃঃ) এবং 'শ্রমশিল্প' অধ্যায়ের 'পশমবয়ন-শিল্প' হইতে লিখ।

6. Discuss the factors responsible for the concentration of wool and silk production in certain regions of the world. Explain why a few countries predominate in their exports.

উঃ—'মেষপালনের ভৌগোলিক অবস্থা' (১৩৭ পৃঃ), 'পশম-উৎপাদনকারী অঞ্চল' (১৩৮ পৃঃ—১৩৯ পৃঃ), 'বাণিজ্য' (১৩৯পৃঃ—১৪০ পৃঃ) এবং 'কৃষিকার্য' অধ্যায়ের 'রেশম' হইতে 'চাষের উপযোগী অবস্থা', ('আমদানি রপ্তানি-বাণিজ্য)' লিখ। শুধুমাত্র ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চল ভিন্ন তুঁতগাছের চাষ সম্ভবপর নয় এবং প্রচুর সুলভ শ্রমিক রেশম উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন। সেইজন্যই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুলভ-শ্রমিক অঞ্চলে ইহার উৎপাদন বেশী এবং রপ্তানি-বাণিজ্যে এই সকল দেশ প্রভাব বিস্তার করে।

নবম অধ্যায়

খনিজ সম্পদ
(Minerals)

সাগর, মহাসাগর ও অরণ্যের ন্যায় খনিজ সম্পদও প্রকৃতির দান। বর্তমান পৃথিবীতে উৎপাদনকার্য পরিচালিত হয় প্রধানতঃ যন্ত্রের সাহায্যে এবং যন্ত্র চালিত হয় শক্তির দ্বারা। এই শক্তির বৃহদংশ পাওয়া যায় কয়লা, খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ন্যায় খনিজ পদার্থ হইতে। পারমাণবিক শক্তি-উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতিও খনিজ পদার্থ।

যে যন্ত্রের সাহায্যে কলকারখানা চলিতেছে তাহা লৌহ বা ঐরূপ কোন ধাতুর দ্বারা নির্মিত। কারখানার বাড়ী তৈয়ারীর জন্য এবং রেল-লাইন, রেল-ইঞ্জিন, রেলের কামরা ও মালগাড়ী, মোটর-গাড়ী, জাহাজ, স্টীমার, বিমানপোত প্রভৃতি বিভিন্ন যানবাহন-নির্মাণের জন্য লৌহ, তাম্র, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি খনিজ পদার্থ অবশ্য প্রয়োজনীয়। এইগুলি চালনার জন্যও কয়লা ও খনিজ তৈল দরকার। এককথায় খনিজ পদার্থ ছাড়া কৃষি, শিল্প, যাতায়াত-ব্যবস্থা বা অন্য যে-কোন কার্যে শক্তি-চালিত যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব নয়। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা খনিজ সম্পদের উপর ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং এই ভিত্তির প্রধান দুইটি স্তম্ভ হইল লৌহ ও কয়লা।

শিল্প-বিপ্লবের পর হইতে আজপর্যন্ত অভূতপূর্ব পরিমাণে বিভিন্ন প্রকারের খনিজ পদার্থ পৃথিবীতে উত্তোলিত হইয়াছে। খনিজ পদার্থ প্রধানতঃ প্রয়োজন শিল্পে ও যাতায়াত-ব্যবস্থায়। ফলে শিল্পের তেজা-মন্দার সঙ্গে সঙ্গে খনিজ পদার্থের উৎপাদনেও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেখা যায় পৃথিবীতে খনিজ সম্পদের উৎপাদন ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে।

খনিজ পদার্থ **সঞ্চিত সম্পদ**; অর্থাৎ পৃথিবীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ খনিজ সম্পদ সঞ্চিত রহিয়াছে। মানুষ ইচ্ছামতো ঐ সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে না। তাই যতই বিভিন্ন খনিজ পদার্থ উত্তোলন ও ব্যবহার করা হইতেছে ততই উহার পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে। এইভাবে

এমন একদিন আসিবে যখন ব্যবহারোপযোগী খনিজ পদার্থ পৃথিবীতে আর পাওয়া যাইবে না।

স্বভাবতঃই প্রথমে সহজলভ্য ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর খনিজ পদার্থ উৎপাদন করা হয়। ইহা নিঃশেষ হইলে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর ও আয়াসলভ্য খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে উৎপাদন-খরচও ক্রমে বৃদ্ধি পায়। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি (Law of Diminishing Returns) খনিজ পদার্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজ্য। অবশ্য খনিজ পদার্থের নূতন সঞ্চয় আবিষ্কারের দ্বারা বা খনি হইতে উত্তোলনের নূতন পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিয়া **উৎপাদন-খরচ**-বৃদ্ধি সাময়িকভাবে ঠেকাইয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু শেষপর্যন্ত উহা দেখা দিবেই।

খনিজ পদার্থের **বণ্টন** পৃথিবীর সর্বত্র সমান নহে। কোন দেশে কোন খনিজ পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত রহিয়াছে। অন্য কতকগুলি দেশে ঐ পদার্থ হয়তো মোটেই নাই বা অল্প আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, বৃটেন, জার্মানী ও ভারতে প্রচুর পরিমাণে কয়লা রহিয়াছে। কিন্তু ডেনমার্ক, সুইজারল্যাণ্ড ও সুইডেনে কয়লা পাওয়া যায় না বলিলেই হয়।

কোন দেশে খনিজ পদার্থের উত্তোলন সেই দেশে উহার অস্তিত্বের উপরই শুধু নির্ভর করে না। খনিজ সম্পদের **আবিষ্কার** ও উৎপাদন মানুষের দ্বারা মানুষের প্রয়োজনে হইয়া থাকে। সুতরাং কোন দেশে খনিজ শিল্পের উন্নতি সেই দেশের অধিবাসিবৃন্দের শিক্ষা, কারিগরী জ্ঞানের উন্নতি, পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা ও উদ্যোগের উপর নির্ভর করে। অনুমান করা হয়, আফ্রিকা মহাদেশে প্রচুর পরিমাণ খনিজ সম্পদ সঞ্চিত আছে। কিন্তু আজপর্যন্ত ইহার উৎপাদন খুব সামান্যই হইয়াছে। যেটুকু হইয়াছে তাহাও ইউরোপের অধিবাসিবৃন্দের উদ্যোগে। এইভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ খনিজ সম্পদের উৎপাদন অল্প কয়েকটি জাতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ১৯৩৯ সালে পৃথিবীতে মোট যত মূল্যের খনিজ পদার্থ উৎপাদিত হইয়াছিল তাহার শতকরা ২৯ ভাগ আসিয়াছিল বৃটেন ও বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে, শতকরা প্রায় ৩৪ ভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে, ১০ ভাগ রাশিয়া হইতে এবং ৭ ভাগেরও বেশী জার্মানী হইতে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে খনিজ পদার্থ প্রধানতঃ নিয়োজিত হয় শিল্প ও যাতায়াত-ব্যবস্থায়। সেইজন্য পৃথিবীর উৎপাদিত খনিজ সম্পদের অধিকাংশ

শিল্পোন্নত দেশগুলি ভোগ করিয়া থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী-কালের একটি হিসাবে দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, জার্মানী, জাপান, ফ্রান্স, ইটালি ও বেলজিয়াম এই আটটি দেশ পৃথিবীর মোট উৎপাদিত খনিজ সম্পদের শতকরা ৮৫ ভাগ ভোগ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে রাশিয়া ব্যতীত আর সকলেই প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদের জন্য ক্রমেই অধিক পরিমাণে বিদেশের উপর নির্ভর করিতেছে।

পৃথিবীর কোন দেশই প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম খনিজ সম্পদে **স্বাবলম্বী নহে**। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধিশালী দেশও ক্রোমাইট, ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, টিন, টাংস্টেন, পটাশ, অ্যান্টিমনি প্রভৃতি খনিজ পদার্থের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল। ৭০ হইতে ৮০ রকমের খনিজ পদার্থ আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে খনিজ সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও ইহা গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান, দেশরক্ষা ও সামরিক শক্তি বহুল পরিমাণে খনিজ সম্পদের উপর নির্ভর করে। তাই খনিজ সম্পদের উপর কর্তৃত্বের প্রতিযোগিতা ও খনিজ সম্পদ সরবরাহে নিশ্চয়তা বিধানের প্রচেষ্টা বহু আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংঘাত ও জটিলতার অন্যতম কারণ। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি ও বর্তমানে কঙ্গোর রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিলে ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে।

খনিজ সম্পদের মোহ মানুষ কখনই ত্যাগ করিতে পারে না। ইউরোপের সভ্যমানুষ অস্ট্রেলিয়া যাইতে ঘৃণাবোধ করিত। কিন্তু যখনই সেখানে স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইল, সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি হইতে দলে দলে মানুষ অস্ট্রেলিয়ায় ছুটিয়া চলিল। তাহারা স্থানীয় সরকার গঠন করিয়া স্বর্ণ আহরণ করিতে শুরু করিল এবং 'শ্বেত অস্ট্রেলিয়া নীতি' (White Australia Policy) অনুসারে ঐ দেশে এশিয়ার কৃষ্ণকায় লোকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিল। আলাস্কার তুষারাবৃত অঞ্চলে স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইবার পরেই সেখানে দলে দলে লোক আসিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণখনি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি হইতে লোকজন যাইয়া সেখানে বসতি স্থাপন করিয়া সম্পদ আহরণ করিতে শুরু করে। মধ্যপ্রাচ্যের তৈলখনি-সমূহের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং দেখা

যাইতেছে যে, উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির উন্নতির মূলে রহিয়াছে তাহাদের নিজেদের এবং পরদেশের খনিজ সম্পদ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে প্রথমে বৃটেনে এবং ক্রমশঃ উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশে ও উত্তর আমেরিকায় কৃষি, শিল্প ও পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ক্রমবর্ধমান হারে প্রচুর পরিমাণে খনিজ সম্পদ ব্যবহৃত হইতেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ক্রমেই অধিক পরিমাণে খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও ব্যবহার করা হইতেছে। পৃথিবীতে খনিজ সম্পদের পরিমাণ নির্দিষ্ট। অথচ অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য উহা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এইজন্য খনিজ সম্পদের উপযুক্ত উন্নয়ন ও সংরক্ষণে পৃথিবীর সকল দেশের সমবেতভাবে তৎপর হওয়া উচিত।

খনিজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ নির্ভর করে শিলার গঠনের ও ব্যবহারের উপর। কোন কোন খনিজ দ্রব্য প্রাণী বা উদ্ভিজ্জ হইতে উদ্ভূত হয়। যেমন, গাছপালা বহুদিন মাটির নীচে থাকিলে কয়লায় পরিণত হয় এবং প্রাণীর হাড় ভূগর্ভে থাকিলে খড়িজাতীয় খনিজে পরিণত হয়। এইভাবে দেখা যাইবে যে, ভূগর্ভে বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থ বিদ্যমান। এইগুলিকে সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করা যায়—**ধাতব খনিজ, অ-ধাতব খনিজ** ও **খনিজ জ্বালানি**। এই তিনপ্রকার খনিজ দ্রব্যকে আবার বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১৪৭ পৃষ্ঠার বিভাগ দ্রষ্টব্য)।

প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবহারে নিযুক্ত খনিজ পদার্থসমূহ (Minerals of Direct Economic Use)—কয়েকটি খনিজ পদার্থ শিলা-দেহের অংশ হিসাবে ভূ-প্রকৃতি-নির্ধারণে, ভূমিক্ষয়-নিবারণে ও মৃত্তিকার গুণাগুণ-নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। আবার কোন কোন খনিজ পদার্থ শিলাদেহ ও ভূ-প্রকৃতি-গঠনে অংশগ্রহণ করিলেও মানুষের নিকট তাহাদের গুরুত্বের প্রধান কারণ হইল বিভিন্ন শিল্পকার্যে তাহাদের ব্যবহার। শেষোক্ত খনিজ পদার্থগুলি খনি হইতে উত্তোলন করিয়া বিশেষ কোন পরিবর্তন না করিয়াই শিল্পকার্যে ব্যবহার করা হয়। এই সকল খনিজ পদার্থের মধ্যে প্রধান হইল লবণ, গন্ধক, নাইট্রেট, ফস্‌ফেট ও পটাশ। ১৪৮ পৃষ্ঠায় ইহাদের সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হইল :

খনিজ সম্পদ (Minerals)

- ধাতব খনিজ (Metallic minerals)
  - লৌহবর্গীয় ধাতব খনিজ (Ferrous Metals)
    লৌহ।
  - লৌহসঙ্কর-ধাতব খনিজ (Ferro-alloy Metals)
    ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, ক্রোমিয়াম, মলিবডেনাম, ভ্যানাডিয়াম, টাংস্টেন প্রভৃতি।
  - অ-লৌহবর্গীয় ধাতব খনিজ (Non-Ferrous Metals)
    তাম্র, টিন, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, সীসা প্রভৃতি এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম প্রভৃতি মূল্যবান্ খনিজ।
- খনিজ জ্বালানি (Fuels)
  কয়লা, খনিজ তৈল, গ্যাস, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি।
- অ-ধাতব খনিজ (Non-Metallic minerals)
  - গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত খনিজ (Structural Minerals)
    চুনাপাথর, মার্বেল প্রভৃতি।
  - রসায়ন-শিল্পে ব্যবহৃত খনিজ (Minerals used Chemically)
    লবণ, সাল্‌ফার, পটাশ, ডোলোমাইট প্রভৃতি।
  - অন্যান্য অ-ধাতব খনিজ (Other non-metallic Minerals)
    অভ্র, গ্রাফাইট প্রভৃতি।

লবণ (Salt)

অল্পমাত্রায় লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। কিন্তু অধিক পরিমাণে লবণ পাওয়া যায় সমুদ্রজল ও লবণহ্রদগুলি হইতে এবং ভূগর্ভে সঞ্চিত স্তরীভূত লবণ হইতে। খনিজ লবণ আমাদের দেশে সৈন্ধব (Rock salt) নামে পরিচিত। সমুদ্র ও লবণহ্রদের জল শুকাইয়া যথেষ্ট পরিমাণে লবণ উৎপাদন করা হইলেও সর্বাধিক পরিমাণে বাণিজ্যিক লবণ সংগ্রহ করা হয় খনি হইতে।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic importance)—মানুষের জীবন-ধারণের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকায় বায়ু ও জলের পরেই লবণের স্থান। রাসায়নিক শিল্পে একটি অপরিহার্য কাঁচামাল হিসাবে প্রচুর পরিমাণ লবণ ব্যবহৃত হয়। ইদানীং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত লবণের শতকরা ৬০ হইতে ৬৫ ভাগই রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত হইতেছে। কস্টিক সোডা, সোডা অ্যাশ, ব্লিচিং পাউডার, তরল ক্লোরিণ, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতি উৎপাদনে লবণ ব্যবহার করা হয়। এই সকল রাসায়নিক দ্রব্য বস্ত্র, রেয়ন, সেলুলোজ, কাগজ, সাবান, ঔষধ, রবার, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি শিল্পে ব্যবহার করা হয়। পশুর খাদ্য হিসাবেও লবণ ব্যবহৃত হয়। মৎস্য ও মাংস-সংরক্ষণে, চর্মশিল্পে, জল-পরিশোধনে ও আরও বহু কার্যে লবণ প্রয়োজন হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing areas)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা অধিক লবণ পাওয়া যায়। এই দেশের মিচিগান, নিউ ইয়র্ক, ওহিও, লুইসিয়ানা, টেক্সাস্‌ ও ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যে বেশীর ভাগ লবণ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া রাশিয়া, বৃটেন, ভারত, চীন, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালি, পোল্যাণ্ড, কানাডা, স্পেন ও জাপানে প্রচুর পরিমাণে লবণ উৎপাদিত হয়।

পৃথিবীর গড় বাৎসরিক লবণের উৎপাদন প্রায় ৫ কোটি মেট্রিক টন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩২·৬%, রাশিয়া ১০·৮%, বৃটেন ৮·২%, চীন ৬·১%, ভারত ৫·৩%, পশ্চিম জার্মানী ৫·৩% ও ফ্রান্স ৪·৭% লবণ উৎপাদন করিয়া থাকে। অধিকাংশ দেশের লবণ স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় বলিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লবণের স্থান নগণ্য।

গন্ধক (Sulphur)

শিল্পের প্রয়োজনে যে গন্ধক ব্যবহার করা হয় তাহা হয় বিশুদ্ধ অবস্থায় (Native sulphur) পাওয়া যায়, অথবা লৌহের ন্যায় কোন ধাতুর সহিত যৌগিক অবস্থায় পাওয়া যায়। শেষোক্ত শ্রেণীর গন্ধককে সাধারণভাবে পাইরাইট (Pyrite) বলা হয়। বহুক্ষেত্রে প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ অবস্থায় যে গন্ধক পাওয়া যায় তাহা পাইরাইট অপেক্ষা অনেক বেশী কার্যোপযোগী। অবশ্য লৌহ, তাম্র, দস্তা প্রভৃতির ধাতুর সহিত যৌগিক অবস্থায় যে গন্ধক পাওয়া যায় তাহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ গন্ধক নিষ্কাশন করা হইয়া থাকে। বাণিজ্যিক হারে উৎপাদনের উপযোগী বিশুদ্ধ অবস্থায় গন্ধক পৃথিবীতে অল্প কয়েকটি অঞ্চলেই মাত্র পাওয়া যায়। যে সকল দেশে পাইরাইট হইতে তাম্র, দস্তা প্রভৃতি ধাতুর নিষ্কাশন-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার অধিকাংশ দেশেই ইহার সহিত গন্ধক উৎপাদনেরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

শিল্পগত গুরুত্ব (Industrial importance)—গন্ধকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড-উৎপাদনে। সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল। শর্করা-শিল্পে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক ব্যবহার করা হয়। বিস্ফোরক-উৎপাদনেও ইহা ব্যবহৃত হয়। রবার-শিল্পে, দিয়াশলাই-শিল্পে, কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজ-উৎপাদনে, ঔষধ ও কীটনাশক দ্রব্য-প্রস্তুতে, সার-উৎপাদনে এবং রং, তৈল ও বার্নিশ উৎপাদনে গন্ধক ব্যবহার করা হয়। ইহা ছাড়া নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনের জন্যও ইহার প্রয়োজন হয়। মোট কথা, প্রায় প্রত্যেক শিল্পেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে গন্ধকের ব্যবহার রহিয়াছে। লৌহ ও কয়লার ন্যায় গন্ধক আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার অন্যতম স্তম্ভ।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing areas)—বিশুদ্ধ গন্ধক (Native sulphur)-উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান প্রথম। গড়ে প্রতিবৎসর ৫০ লক্ষ মেঃ টনের অধিক বিশুদ্ধ গন্ধক এই দেশে উৎপাদিত হয় এবং ইহার শতকরা ৯৮ ভাগ উৎপাদিত হয় টেক্সাস্ ও লুইসিয়ানা রাজ্যের মেক্সিকো উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে। ইটালি, জাপান, মেক্সিকো এবং চিলিও গুরুত্বপূর্ণ গন্ধক-উৎপাদনকারী দেশ। রাশিয়ায় বর্তমানে প্রচুর গন্ধক উৎপন্ন হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৬২ লক্ষ মেঃ টন	জাপান	২.২ লক্ষ মেঃ টন
ইটালি	৩৩ „ „		মোট ৬৮ লক্ষ মেঃ টন

গন্ধকের উৎপাদন অল্প কয়েকটি দেশে সীমাবদ্ধ হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইহা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গন্ধকের শ্রেষ্ঠ রপ্তানিকারক। এই দেশের মোট উৎপন্ন গন্ধকের শতকরা ২৫ ভাগ কানাডা, বৃটেন, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন খনিজ সার
(Commercial Mineral Fertilizers)

গত দুইশত বৎসরে পৃথিবীতে কৃষির অভাবনীয় উন্নতি ঘটিয়াছে ; বৃটেনে হেক্টর-প্রতি গমের ফলন তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, নরওয়ে ও সুইডেনের দক্ষিণাংশ এবং জার্মানী হেক্টর-প্রতি উৎপাদন-বৃদ্ধিতে বৃটেনকে অনুসরণ করিয়াছে। একদিন মৃত্তিকার উর্বরাশক্তি ক্রমাগত হ্রাস পাইয়া সমগ্র পৃথিবী বন্ধ্যা হইয়া যাইবে বলিয়া মানুষের মনে আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। আজ মৃত্তিকার উৎপাদন-ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া তো দূরের কথা, বরং উহা অভাবনীয় হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই উন্নতির বহু কারণ রহিয়াছে। উন্নত কর্ষণ-পদ্ধতি, নূতন ফসলের চাষ, উন্নত বীজ, শস্যাবর্তন, যন্ত্রপাতির প্রয়োগ প্রভৃতি বহু উপাদান কৃষির এই উন্নতির মূলে রহিয়াছে। কিন্তু কৃষির উন্নতির জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্বের অধিকারী হইল খনিজ সারের ব্যবহার।

কৃষিক্ষেত্রের খনিজ সারের হেক্টর-প্রতি সর্বাধিক ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, জার্মানী, বৃটেনের পূর্বাংশ, নরওয়ে ও সুইডেনের দক্ষিণাংশ এবং ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বাংশে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সার-উৎপাদনশিল্প অন্যতম বৃহৎ শিল্প। সার-উৎপাদন ও ব্যবহার উত্তরে মেইন হইতে দক্ষিণে ফ্লোরিডা পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বার্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইদানীং অবশ্য প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী রাজ্যসমূহে এবং মিসৌরী উপত্যকার প্রেইরী অঞ্চলেও খনিজ সারের প্রচলন বিস্তার লাভ করিতেছে। ভারতে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর হইতে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্যের

উৎপাদন-বৃদ্ধির তাগিদে খনিজ সারের প্রয়োগ শুরু হইয়াছে এবং দেশের বিভিন্ন অংশে সার উৎপাদনের জন্য কারখানা স্থাপিত হইতেছে।

কৃষিকার্যে যে সকল খনিজ সার ব্যবহার করা হয় তাহাদের প্রধান তিনটি উপাদান হইল নাইট্রোজেন-ঘটিত লবণ বা নাইট্রেট্স্ (Nitrates), ফস্ফরাস-ঘটিত লবণ বা ফস্ফেটস (Phosphates) এবং পটাশ (Potash)।

নাইট্রোজেন-ঘটিত লবণ বা নাইট্রেট (Nitrate)—সার প্রস্তুতের জন্য যে সকল পদার্থের প্রয়োজন হয় নাইট্রোজেন তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্। অধিকাংশ নাইট্রোজেন সার প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইলেও, ইহা বিস্ফোরক দ্রব্য, রং ও ঔষধপত্র ইত্যাদি প্রস্তুতেও ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন উৎস হইতে নাইট্রোজেন পাওয়া সম্ভব হইলেও বাণিজ্যিক হারে সার উৎপাদনের জন্য যে নাইট্রোজেন ব্যবহার করা হয় তাহা হয় বায়ুমণ্ডল হইতে অথবা খনিজ নাইট্রেট হইতে সংগ্রহ করা হয়। ব্লাস্ট ফার্নের্স্ ও কোক চুল্লীর উপজাত-দ্রব্য হইতেও নাইট্রোজেন সংগ্রহ করা হয়। বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহের খরচ অধিক।

অল্প পরিমাণ নাইট্রেট ক্যালিফোর্ণিয়ার ডেথ্ ভ্যালি এবং অন্য কোন কোন মরুভূমিতে পাওয়া গেলেও বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে পৃথিবীতে চিলি নাইট্রেটের একমাত্র উৎস। আণ্ডিজ পর্বত ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত উত্তর চিলির মরুভূমিতে ৭২০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৮০ কিলোমিটার প্রশস্ত অঞ্চল ব্যাপিয়া নাইট্রেট সঞ্চিত রহিয়াছে। ইহাই পৃথিবীর বৃহত্তম নাইট্রেট-খনি এবং এখানকার সঞ্চয়ের পরিমাণও সর্বাধিক। এই খনিজ নাইট্রেট উত্তর চিলির বৃষ্টিহীন মরু অঞ্চলকে শিল্পকেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে। চিলি হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে নাইট্রেট রপ্তানি করা হয়। বর্তমানে শিল্পোন্নত দেশসমূহে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নাইট্রোজেনের উৎপাদন ক্রমেই বৃদ্ধি পাওয়ায় চিলির নাইট্রেট-শিল্পের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

ফস্ফেট (Phosphate)—ফস্ফেট শিলা প্রধানতঃ চুনঘটিত ফস্ফেট (Phosphates of lime)। ইহার ফস্ফরাস ও চুন কৃষি-সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ফস্ফেট প্রধানতঃ সার হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে ইহা গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীতে **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র** প্রধান ফস্ফেট-উৎপাদনকারী দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট উৎপাদনের শতকরা ৬৭ হইতে ৭৫ ভাগ ফ্লোরিডায় পাওয়া

যায়। ইহা ছাড়া টেনেসি, উটা, ইডাহো, মন্‌টানা এবং উইওমিং রাজ্যেও ফস্‌ফেট পাওয়া যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই উত্তর আফ্রিকার দেশগুলি, বিশেষ করিয়া মরক্কো ও টিউনিসিয়া প্রধান ফস্‌ফেট-উৎপাদনকারী অঞ্চল। মিশর ও আলজেরিয়াতেও ফস্‌ফেট পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত নরু (Nauru) ও সাগর দ্বীপ (Ocean island) এবং রাশিয়ায় ফস্‌ফেট পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর আফ্রিকার দেশগুলি এবং নরু ও সাগর দ্বীপ ফস্‌ফেট রপ্তানি করিয়া থাকে। আমদানি করে প্রধানতঃ পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ, জাপান ও কানাডা।

পটাশ (Potash)—লবণজাতীয় যে সকল পদার্থের মধ্যে পটাসিয়াম (Potassium) পাওয়া যায় তাহাদিগকে পটাশ বলে। কোথাও কোথাও পটাশ বিভিন্ন পাললিক শিলা হইতে সংগ্রহ করা হয়। আবার কোথাও কোথাও ইহা সমুদ্র বা হ্রদের জল হইতে সংগ্রহ করা হয়।

বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ও ঔষধ প্রস্তুতে, রং, কাগজ প্রভৃতি উৎপাদনে পটাশ **ব্যবহার** করা হয়। অবশ্য ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হয় কৃষি-সার হিসাবে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্মানীতে প্রথম সার হিসাবে পটাশের গুরুত্ব ও ব্যবহার আবিষ্কৃত হয়। ক্রমে ইহার ব্যবহার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কৃষিকার্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে জার্মানী দ্বিধাবিভক্ত হওয়ায় বর্তমানে **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র** পটাশ-উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যের সিয়ার্‌লেস্‌ হ্রদ (Searles Lake) ও নিউ মেক্সিকো রাজ্যের কার্লস্‌ব্যাড্‌ খনি (Carlsbad field) প্রধান পটাশ-উৎপাদনকারী অঞ্চল। টেক্সাস, উইওমিং এবং উটা রাজ্যেও পটাশ পাওয়া যায়। **জার্মানীতে** হার্‌জ (Harz) পর্বতের পার্শ্বদেশে পটাশের খনি রহিয়াছে। ইহা উত্তর-পশ্চিমে হ্যানোভারের নিম্নভূমি ও দক্ষিণ-পশ্চিমে থুরিঙ্গিনা পর্যন্ত ৬৫,০০০ বর্গ-কিলোমিটার স্থান জুড়িয়া বিস্তৃত রহিয়াছে। **ফ্রান্সে** রাইন উপত্যকার উত্তরাংশে মুলহাউসের নিকটে ১৭৫ বর্গ-কিলোমিটার স্থান জুড়িয়া পটাশ পাওয়া যায়। জার্মানী ও ফ্রান্স হইতে পটাশ বৃটেন, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনে রপ্তানি করা হয়। রাশিয়া এবং স্পেনেও প্রভূত পরিমাণ পটাশ রহিয়াছে।

লৌহ আকরিক
(Iron-ore)

শিল্পগত গুরুত্ব (Industrial importance)—লৌহ আকরিক হইতে লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। আধুনিক শিল্প-অর্থনীতি প্রধানতঃ স্থানগত বিশেষীকরণ ও আন্তর্জাতিক বিনিময় ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু স্থানগত বিশেষীকরণ ও বিনিময় উন্নত যাতায়াত ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা ব্যতীত কখনই সম্ভব নহে। যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন কোটি কোটি টন লৌহ ও ইস্পাত যাহার সাহায্যে রেল-লাইন, সেতু, রেলের ইঞ্জিন, চাকা ও কামরা, রেলস্টেশন, জাহাজ, মোটর-গাড়ী, মোটর-বাস্, মোটর-ট্রাক, টেলিগ্রাফের থাম ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়।

আধুনিক সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক। শহরের অসংখ্য বাসগৃহ, অফিসগৃহ ও কারখানার কাঠামো ইস্পাত-নির্মিত। কারখানায় ব্যবহৃত ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতি ইস্পাত-নির্মিত, অফিস ও গৃহে ব্যবহৃত সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র, পাখা, হিমায়ন যন্ত্র প্রভৃতি বহুলাংশে ইস্পাতের তৈয়ারী।

কৃষিকার্যও ক্রমেই বেশী করিয়া লৌহ ও ইস্পাতের উপর নির্ভরশীল হইতেছে। জমি তৈয়ার, বীজবপন, ফসল-কাটা, ঝাড়াই ও ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য ইস্পাতের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হইতেছে। কৃষিজ দ্রব্য ক্ষেত হইতে বাজারে, একদেশ হইতে অন্যদেশে প্রেরণের জন্য লৌহ-নির্মিত যানবাহনই ব্যবহার করা হয়। কৌটাভর্তি খাদ্যের রেওয়াজ দিন দিনই বাড়িতেছে। রাং-এর প্রলেপ-লাগানো লৌহের পাতের দ্বারা এই সকল কৌটা নির্মিত হয়। সর্বত্রই আমরা কোন-না-কোন ভাবে লৌহ দেখিতে পাই। এত ব্যাপকভাবে আর কোন জিনিস মানুষ ব্যবহার করে না।

একথা অনস্বীকার্য যে, অসংখ্য জিনিসের সমবায়ে ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর আধুনিক জটিল যন্ত্রসভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। কার্বন ছাড়া লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন সম্ভব নয়। বিভিন্ন শ্রেণীর ইস্পাত উৎপাদনের জন্য নিকেল, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি ধাতু ইস্পাতের সহিত মিশাইতে হইবে। কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও বিদ্যুতের ন্যায় শক্তি ব্যতীত ইস্পাতের কোন মূল্যই নাই। আবার লৌহ ব্যতীত কি করিয়া কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ সম্ভব? তবুও আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় অসংখ্য উপাদানের মধ্যে অন্ততঃ **পরিমাণ ও ব্যবহারে ব্যাপকতার**

দিক দিয়া লৌহ অনন্য। পৃথিবীতে লৌহ ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রকারের ধাতু মোট যে পরিমাণ ব্যবহৃত হয় এক কাঁচা লৌহের (Pig iron) ব্যবহার তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী—প্রায় ৭ গুণ।

লৌহের এই গুরুত্বের কারণ ইহার কয়েকটি **বিশেষ গুণ** যাহা আর কোন ধাতুতে সম-পরিমাণে নাই। অন্য যে-কোন ধাতুর তুলনায় ইস্পাতের **স্থিতিস্থাপকতা অধিক**। তাহার ফলে ইহা অনেক বেশী চাপ সহ্য করিতে পারে। যন্ত্রপাতি, বাড়ী, সেতু প্রভৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রে এই গুণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লৌহের দ্বিতীয় গুণ ইহার **কাঠিন্য**। তৃতীয়তঃ, ইহা **নমনীয়**। চতুর্থতঃ, লৌহ অপেক্ষাকৃত সহজে অন্য ধাতুর সহিত মিশাইয়া বিভিন্ন গুণের **মিশ্রধাতু** প্রস্তুত করা যায়। ইহার ফলে অনেক বেশী কাজে ইস্পাতের প্রয়োগ সম্ভব হইয়াছে এবং নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু লৌহের সর্বাপেক্ষা বড় গুণ অন্য ধাতুর তুলনায় ইহার **উৎপাদন-খরচ খুব সামান্য**।

লৌহ আকরিকের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Iron-ore)—পৃথিবীতে লৌহ আকরিক ব্যাপকভাবে সঞ্চিত রহিয়াছে। কিন্তু কোনস্থানে ইহা লাভজনকভাবে উত্তোলন করা সম্ভব কিনা তাহা নির্ভর করে কি পরিমাণ লৌহ আকরিক একস্থানে রহিয়াছে, ইহার রাসায়নিক গঠন কিরূপ, ইহাতে খাঁটি লৌহের অংশ কত এবং অন্যান্য অবস্থার উপর। হেমাটাইট, ম্যাগ্‌নেটাইট, লিমোনাইট ও সিডেরাইট এই চার প্রকারের লৌহ আকরিকই প্রধান। **হেমাটাইট** (Hematite, Fe_2O_3) আকরিকে ধাতব লৌহের পরিমাণ পুঁথিগতভাবে শতকরা ৭০ ভাগ; ইহার রং লাল। সকল প্রকার লৌহ আকরিকের মধ্যে হেমাটাইট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইহা ব্যাপকভাবে পাওয়া যায় এবং ইহা হইতে ধাতব লৌহ নিষ্কাশন করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। **ম্যাগ্‌নেটাইটের** (Magnetite, Fe_3O_4) রং কালো এবং ইহাতে খাঁটি লৌহের পরিমাণ পুঁথিগতভাবে শতকরা ৭২.৪০ভাগ। বিশুদ্ধ **লিমোনাইট** (Limonite, $2Fe_2O_3$ $3H_2O$) ও **সিডেরাইট** (Siderite, $FeCO_3$) আকরিকে ঐরূপ ধাতব লৌহের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৫৯.৮ ও ৪৮ ভাগ। লিমোনাইটের রং হলুদ অথবা বাদামী এবং সিডেরাইট ধূসরবর্ণের হয়। খনি হইতে যে লৌহ আকরিক উত্তোলন করা হয় তাহাতে যৌগিক লৌহ (Iron Compound) ছাড়াও অন্যান্য ধাতব ও অধাতব পদার্থ মিশিয়া থাকে। এই সকল বিজাতীয় পদর্থের (Impurities)

মধ্যে অ্যালুমিনা, ম্যাগ্‌নেসিয়া, সিলিকা, চুন, গন্ধক, তাম্র, টাইটেনিয়াম, আর্সেনিক এবং ফস্‌ফরাস থাকিতে পারে। সাধারণতঃ সিলিকার পরিমাণই সবচেয়ে বেশী থাকে। টাইটেনিয়াম, আর্সেনিক, তামা ও ফস্‌ফরাস লৌহকে দুর্বল করিয়া ফেলে। সেইজন্য ইহাদের অস্তিত্বের ফলে লৌহ আকরিকের গুণের হানি ঘটে। যে সকল লৌহ আকরিকে ধাতব লৌহের পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগেরও কম, বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া তাহা ব্যবহার করা হয় না। লৌহ আকরিকে ধাতব লৌহের পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগের কম থাকিলেই সাধারণতঃ ব্লাস্ট ফার্নেসে ব্যবহারের পূর্বে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাহাতে ধাতব লৌহের ভাগ বাড়াইয়া লইবার ব্যবস্থা করা হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing areas)—পৃথিবীর **সঞ্চিত লৌহ-ভাণ্ডারের** (Iron ore reserves) এ পর্যন্ত যে সকল হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য একটি হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর মোট সঞ্চিত লৌহভাণ্ডারের পরিমাণ ৬,৯৮১ কোটি টন।

পৃথিবীর সঞ্চিত লৌহভাণ্ডার (কোটি টন)

চীন	১,২০০	ভারত	৬২২
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১,০৪৫	কিউবা	৩১৫
ফ্রান্স	৮১৭	সুইডেন	২২০
ব্রেজিল	৭০০	রাশিয়া	২০৭*
বৃটেন	৫৯৭	জার্মানী	১৩২
নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড	৪০০	লুক্সেমবার্গ	২৭

সঞ্চিত লৌহভাণ্ডারের পরিমাণের উপর প্রকৃত উত্তোলন সবসময় নির্ভর করে না। বহুদেশে সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ বেশী হইলেও উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য নাও হইতে পারে; যেমন, ব্রেজিল, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ইত্যাদি। বর্তমানে শিল্পোন্নত দেশসমূহে লৌহ আকরিক উৎপাদনের পরিমাণ বেশী।

* রাশিয়া দাবি করে যে, পৃথিবীর শতকরা ৪১ ভাগ সঞ্চিত লৌহভাণ্ডার সেই দেশে বিদ্যমান।

পৃথিবীর লৌহ আকরিক-উৎপাদন—৪৯'৭ কোটি মেঃ টন

রাশিয়া	১৪'৬০ কোটি মেঃ টন	সুইডেন	২'৬৯ কোটি মেঃ টন
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	৮'২৬ „	বৃটেন	১'৬৫ „
ফ্রান্স	৬'০৯ „	ভারত	১'৪৯ ,
চীন	৩'১০ „	ভেনেজুয়েলা	১'৫৭ „
কানাডা	৩'৬২ „	ব্রেজিল	১'০৭ „

Source—U. N. O. Monthly Bulletin, April, 1965 (চীন বাদে)।

রাশিয়া (U. S. S. R.)—বর্তমানে লৌহ আকরিক-উৎপাদনে রাশিয়া পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। এদেশে সঞ্চিত লৌহভাণ্ডারের পরিমাণও যথেষ্ট। এই দেশের লৌহ আকরিকে ধাতব লৌহের পরিমাণ গড়ে শতকরা ৪৫ হইতে ৫৮ ভাগ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এই দেশের মোট লৌহ আকরিক উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগ পাওয়া যাইত ইউরোপীয় রাশিয়ার দক্ষিণাংশে অবস্থিত **ক্রিভয় রগ** হইতে। কার্চ উপদ্বীপেও লৌহ পাওয়া যায়। ডোনেৎস্ পর্যঙ্কের কয়লাখনি ইহার নিকটেই অবস্থিত। এই কয়লা ও লৌহের সাহায্যে উভয় অঞ্চলেই লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইউরাল অঞ্চলের ম্যাগ্‌নেট পর্বত গুরুত্বপূর্ণ লৌহ আকরিক উৎপাদনকারী অঞ্চল। এখান হইতে ম্যাগ্‌নিটোগর্স্কের ইস্পাতশিল্পে লৌহ আকরিক সরবরাহ করা হয়। দক্ষিণ ইউরালের ওর্‌স্ক, মধ্য রাশিয়ার কুর্‌স্ক, উত্তর রাশিয়ার মুর্‌মান্‌স্ক ও সাইবেরিয়ার কুজবাজ অঞ্চলেও প্রচুর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.)—কিছুদিন পূর্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লৌহ আকরিক-উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করিত; কিন্তু বর্তমানে এই দেশ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। যুক্তরাষ্ট্রের বহু অঞ্চলে লৌহ আকরিক উৎপাদিত হইলেও এই দেশের মোট বাৎসরিক উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী মাত্র দুইটি অঞ্চল হইতে পাওয়া যায়: (ক) হ্রদ অঞ্চল ও (খ) আলাবামা অঞ্চল।

(ক) হ্রদ অঞ্চল (The Lake Region)—সুপিরিয়র হ্রদের পশ্চিমে তিনটি (ভারমিলিয়ন, মেসাবি ও কুইনা) ও দক্ষিণে তিনটি (মারকোয়েট, গোজেবিক ও মেনোমিনি) মোট এই ছয়টি লৌহ পাহাড় (Iron range)

হইতে লৌহ আকরিক উত্তোলিত হয়। অবশ্য এই ছয়টি অঞ্চলের মধ্যে **মেসাবি** সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র এই অঞ্চল হইতেই যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। ইহা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লৌহখনি অঞ্চল। এখানে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া ৬০ মিটারের কিছু কম পুরু লৌহস্তর রহিয়াছে এবং এই স্তর ভূমির উপরিভাগের খুব নিকটেই অবস্থিত। এখানকার লৌহ আকরিক উচ্চশ্রেণীর হেমাটাইট-জাতীয়, এবং খাঁটি লৌহের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ ; ফস্‌ফরাসের অংশ শতকরা এক ভাগেরও কম এবং অন্যান্য বিজাতীয় পদার্থের পরিমাণও সামান্য। এখান হইতে বিশেষ ধরনের নির্মিত বজরায় করিয়া লক্ষ লক্ষ টন লৌহ আকরিক হ্রদের উপর দিয়া মিচিগান ও ইরি হ্রদের তীরে অবস্থিত এবং অভ্যন্তরভাগের লৌহ ও ইস্পাত কারখানাগুলিতে পাঠানো হয়। মেসাবি অঞ্চলের সবচেয়ে বড় অসুবিধা এখানে শীতের সময় চার-পাঁচ মাস খনির কাজ বন্ধ থাকে। শীতের সময় তীব্র শীত পড়ে এবং খনির মধ্যে তুষারপাত হয়। ইহা ছাড়া হ্রদের জল জমিয়া বরফ হইয়া যায় বলিয়া জলপথে যাতায়াতও অসম্ভব। ফলে মেসাবি অঞ্চলের লৌহ-ব্যবহারকারী কারখানাগুলিকে শীতের কয়েক মাস কাজ অব্যাহত রাখিবার জন্য লৌহ আকরিক মজুত করিয়া রাখিতে হয়। মেসাবি ব্যতীত সুপিরিয়র হ্রদের তীরবর্তী অন্য পাঁচটি অঞ্চলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্তমানে সুড়ঙ্গ করিয়া মাটির গভীর তলদেশ হইতে লৌহ উত্তোলন করিতে হয়। ফলে উত্তোলন-খরচ অপেক্ষাকৃত বেশী। শীতের সময় খনির কাজ চালানো সম্ভব হইলেও হ্রদের জল জমিয়া থাকার ফলে খুব সামান্য পরিমাণ লৌহ আকরিক শিল্পাঞ্চলে পাঠানো সম্ভব। এই পাঁচটি অঞ্চলের লৌহ আকরিক কঠিন কিংবা নরম হেমাটাইট- এবং ম্যাগ্‌নেটাইট-জাতীয়।

(খ) **আলাবামা অঞ্চল (The Alabama Region)**—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ১০ ভাগ লৌহ আকরিক এখান হইতে পাওয়া যায়। এখানে দুইটি অঞ্চলে লৌহ উত্তোলন করা হয় : (১) **রেড মাউণ্টেন** ও (২) **বার্মিংহাম উপত্যকা**। আলাবামার শতকরা ৮৫ ভাগ লৌহ আকরিক রেড মাউণ্টেন হইতে পাওয়া যায়। এখানে ৫ হইতে ৭ মিটার পুরু প্রায় ৪০০ কিলোমিটার লম্বা লৌহস্তর রহিয়াছে। এখানকার লৌহ আকরিক হেমাটাইট-জাতীয় ; ধাতব লৌহের পরিমাণ শতকরা ৩০ হইতে

৪০ ভাগ এবং বিজাতীয় পদার্থ (Impurities) প্রায় নাই বলিলেই চলে। এখানকার এক-চতুর্থাংশেরও বেশী লৌহ আকরিকে যথেষ্ট চুন থাকায় লৌহ নিষ্কাশনের জন্য চুনাপাথরের খরচ কম। বার্মিংহাম উপত্যকায় কাদা, বালি ও নুড়ির সহিত মিশ্রিত অবস্থায় নিম্নশ্রেণীর লিমোনাইট-জাতীয় লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। এখানকার লৌহ আকরিক ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া, বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে ইহাতে ধাতব লৌহের পরিমাণ বাড়াইয়া রেড মাউণ্টেন অঞ্চলের আকরিকের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করা হয়।

হ্রদ অঞ্চল ও আলাবামা অঞ্চল ব্যতীত নিউ ইয়র্ক রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অ্যাডিরনড্যাক্ জেলায়, পেন্‌সিলভ্যানিয়া রাজ্যের পূর্বাংশে অবস্থিত কর্ণওয়াল জেলায়, নিউজার্সি রাজ্যের উত্তরাংশে এবং রকি পর্বত্য অঞ্চলের কোন কোন স্থানে কিছু পরিমাণ লৌহ আকরিক উৎপাদিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অন্যতম প্রধান লৌহ আকরিক-উৎপাদনকারী দেশ হইলেও এখানে প্রতিবৎসর চিলি, ব্রেজিল, ভেনেজুয়েলা, সুইডেন, কানাডা, উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ আকরিক আমদানি করা হইয়া থাকে।

ফ্রান্স (France)—ইউরোপে রাশিয়ার পরেই **ফ্রান্স** প্রধান লৌহ আকরিক-উৎপাদনকারী দেশ। এই দেশের **লোরেন** অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা অধিক লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। এই লৌহ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর, ধাতব লৌহের পরিমাণ শতকরা ৩৫ হইতে ৪০ ভাগ। ইহাতে স্বাভাবিকভাবে প্রচুর চুন মিশানো থাকে বলিয়া লৌহ নিষ্কাশনের জন্য চুনাপাথরের খরচ কম। তবে ফস্‌ফরাসের ভাগ বেশী থাকে বলিয়া কারখানায় এই লৌহ আকরিকের সহিত আমদানিকৃত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। বহু রেলপথ এই অঞ্চলের উপর দিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া খাল ও নদীপথে সুলভে পরিবহণের সুবিধা রহিয়াছে। ফ্রান্সের নর্মাণ্ডি এবং পীরেনীজ পর্বতেও লৌহ আকরিক পাওয়া যায়।

চীন (China)—বর্তমানে এই দেশ লৌহ আকরিক উৎপাদনে পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। চীনের অনেক স্থানে লৌহ আকরিক পাওয়া গেলেও দুইটি অঞ্চলই প্রধান : (ক) ইয়াংসি নদীর নিম্ন-অববাহিকায় তায়ে (Tayeh) হইতে নানকিং এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অনেকগুলি হেমাটাইট ও ম্যাগ্‌নেটাইট জাতীয় লৌহখনি রহিয়াছে। ধাতব লৌহের পরিমাণ

শতকরা ৪০ হইতে ৫২ ভাগ। ১৫০ কিলোমিটারের মধ্যে কয়লাখনি থাকায় লৌহ-উত্তোলনে সুবিধা হইয়াছে। (খ) শানটুং উপদ্বীপের লৌহ আকরিক উৎকৃষ্ট শ্রেণীর, ধাতব লৌহের পরিমাণ শতকরা ৬০ ভাগ। নিকটেই পোশনের কয়লাখনি অঞ্চল। মাঞ্চুরিয়ায় মুকদেনের দক্ষিণে লৌহখনি রহিয়াছে। এই খনি হইতে আনশানের ইস্পাতশিল্পে লৌহ প্রেরিত হয়।

সুইডেন (Sweden)—সুইডেনের লৌহখনিগুলি দেশের উত্তর ও মধ্য অংশে অবস্থিত। উত্তর সুইডেনের **কিরুণা** খনি অঞ্চলে প্রভূত পরিমাণে লৌহ আকরিক সঞ্চিত রহিয়াছে। এখানকার লৌহ আকরিক উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হেমাটাইট ও ম্যাগ্‌নেটাইট জাতীয়; ধাতব লৌহের পরিমাণ গড়ে শতকরা ৬০ ভাগ; তবে ফস্‌ফরাসের ভাগ কিছু বেশী। লৌহস্তর ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি অবস্থিত। এখান হইতে লৌহ আকরিক রেলযোগে সামান্য পথ অতিক্রম করিয়া আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে নার্ভিক বন্দরে অথবা বোথ্‌নিয়া উপসাগরের তীরে লুলিয়া বন্দরে লইয়া আসা হয় এবং সেখান হইতে জলপথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের দেশগুলিতে পাঠানো হয়। মধ্য সুইডেনে কোপারবার্গ অঞ্চলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হেমাটাইট-জাতীয় লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। সুইডেনের ইস্পাতশিল্পে প্রয়োজনীয় অধিকাংশ লৌহ আকরিক এখান হইতে সংগ্রহ করা হয়। ইহা ছাড়া এখানকার লৌহ আকরিক প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা হয়।

ভেনেজুয়েলা (Venezuela)—লৌহ আকরিক উৎপাদনে এই দেশ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এখানকার অধিকাংশ লৌহখনি গায়না উচ্চভূমিতে অবস্থিত। কোক প্রস্তুতের উপযোগী কয়লা না থাকায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এই দেশে গড়িয়া উঠে নাই; ফলে আভ্যন্তরীণ চাহিদার অভাব থাকায় এই দেশের অধিকাংশ লৌহ আকরিক বিদেশে, প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হইয়া থাকে।

কানাডা (Canada)—কানাডায় নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, নোভাস্কোশিয়া, বৃটিশ কলম্বিয়া এবং সুপিরিয়র হ্রদের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল হইতে লৌহ আকরিক সংগ্রহ করা হয়। অবশ্য কানাডার সর্ববৃহৎ লৌহভাণ্ডার কুইবেক-লাব্রাডার অঞ্চলে অবস্থিত। ইদানীং বহু অর্থব্যয়ে যাতায়াতের উত্তম ব্যবস্থা করিয়া এখান হইতে লৌহ আকরিক সংগ্রহ করা হইতেছে।

বৃটেন (U. K.)—যদিও বৃটেনে বহুদিন হইতে লৌহ আকরিক

উত্তোলন করা হইতেছে এবং অনেক খনি ইতিমধ্যে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, তবুও এখন পর্যন্ত বৃটেন পৃথিবীর মোট লৌহ আকরিক উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৪ ভাগ উৎপাদন করিয়া থাকে। খনিগুলি ছোট হইলেও লৌহস্তর ভূপৃষ্ঠের সহিত সমান্তরালভাবে অবস্থিত। কোন কোন ক্ষেত্রে লৌহখনি ও কয়লাখনি পাশাপাশি অবস্থিত ; অনেক ক্ষেত্রে খনিগুলি সমুদ্রতীরে অবস্থিত। ফলে সহজে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিবার এবং লৌহ আকরিক ও অন্যান্য কাঁচামাল আমদানি এবং লৌহ ও ইস্পাত এবং ইস্পাতজাত দ্রব্যাদি রপ্তানির খুব সুবিধা হইয়াছে। এখানকার লৌহ আকরিকে ধাতব লৌহের পরিমাণ গড়ে শতকরা ৩০ ভাগের কম এবং ইহাতে গন্ধক ও ফস্‌ফরাসের পরিমাণ বেশী। ফলে বিদেশ হইতে ফস্‌ফরাসের ভাগ খুব কম এমন লৌহ আকরিক আমদানি করিয়া ইহার সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। বৃটেনে উৎপাদিত লৌহ আকরিকের শতকরা ৮৫ ভাগ **মিড্‌ল্যাণ্ড** ও **ক্লিভল্যাণ্ড** অঞ্চল হইতে উত্তোলন করা হয়। এই দেশে ব্যবহৃত লৌহ আকরিকের এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়।

পশ্চিম জার্মানীর সিজারল্যাণ্ড ভোজেলস্‌বার্গ ও পীন অঞ্চলে প্রচুর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। **স্পেনের** অনেক জায়গায় লৌহ আকরিক পাওয়া গেলেও অধিকাংশ লৌহ আকরিক উত্তর স্পেনে বিস্কে উপসাগরের তীরবর্তী সানটানডার ও বিলবাও-এ উৎপাদিত হয়। এখানকার লৌহ আকরিকে ধাতব লৌহের পরিমাণ গড়ে শতকরা ৪১ হইতে ৫৭ ভাগ এবং ফস্‌ফরাস, গন্ধক ও অন্যান্য বিজাতীয় পদার্থের (Impurities) পরিমাণ সামান্য। এখান হইতে খুব সস্তায় লৌহ আকরিক বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এদেশের উৎপাদিত লৌহ আকরিকের শতকরা ৯০ ভাগ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। লৌহখনিগুলিতে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মূলধন, বিশেষ করিয়া বৃটিশ ও জার্মান মূলধন নিয়োজিত আছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের মধ্যে লুক্সেমবার্গ, পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় লৌহ আকরিক উৎপাদন করা হয়।

এশিয়া মহাদেশে প্রধানতঃ ভারত, জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, চীন ও তুরস্কে লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। **ভারতে** উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ আকরিক পাওয়া যায় ; ধাতব লৌহের পরিমাণ গড়ে শতকরা ৬০ হইতে ৬২ ভাগ। ফস্‌ফরাসের পরিমাণও খুব সামান্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লৌহ-

খনির কাছাকাছি কয়লাখনি রহিয়াছে। ফলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিবার সুবিধা হইয়াছে। এখানে ইস্পাত উৎপাদনের খরচও অনেক দেশের তুলনায় কম। ভারতে অধিকাংশ লৌহ আকরিক বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের খনিগুলি হইতে উৎপাদিত হয়। অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহীশূর, গোয়া ও মহারাষ্ট্রেও প্রচুর পরিমাণে লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। **জাপানে** হন্‌সু দ্বীপের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত সেনিন (Senin) এবং হোকাইডো দ্বীপের মুরোরানে (Muroran) লৌহ আকরিক উত্তোলিত হয়। জাপান, ভারত ও অস্ট্রেলিয়া হইতে লৌহ আকরিক ও অন্যান্য দেশ হইতে ভাঙাচুরা টুকরা লৌহ (Scrap iron) আমদানি করিয়া থাকে। মালয়ে এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মিনডানাও-এ প্রচুর পরিমাণে লৌহ আকরিক পাওয়া যায়।

উত্তর **আফ্রিকার** মরক্কো, টিউনিসিয়া ও আলজেরিয়ায় অনেকগুলি লৌহখনি রহিয়াছে। এখানকার লৌহ আকরিকে ধাতব লৌহের পরিমাণ গড়ে শতকরা ৫০ হইতে ৬০ ভাগ এবং ফস্‌ফরাসের পরিমাণ অতি সামান্য। লৌহস্তর সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠের নিকটে অবস্থিত। এখানকার লৌহখনিগুলি ইউরোপীয় মূলধনে ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয় এবং উৎপাদিত লৌহ আকরিক বৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়। **দক্ষিণ আফ্রিকার** ট্রান্সভালে এবং **পশ্চিম আফ্রিকার** লাইবেরিয়া ও সিয়েরা লিওনে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়।

লৌহ আকরিক-উৎপাদনে **দক্ষিণ আমেরিকার** ব্রেজিল, ভেনেজুয়েলা, পেরু ও চিলি উল্লেখযোগ্য। **ব্রেজিলে** মিনাস্ গেরায়েস্ (Minas Geraes) প্রদেশের মধ্যভাগে (ইটাবিরা, বেলো হরিজোনটি এবং আউরো প্রেটো) এবং ম্যাটো গ্রোসো (Mato Grosso) প্রদেশের কোরাম্বার নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে লৌহ আকরিক সঞ্চিত রহিয়াছে। মিনাস্ গেরায়েস্ প্রদেশের লৌহখনিগুলি হইতে স্থানীয় কারখানাগুলিতে এবং ভোল্টা রিডনডায় অবস্থিত আধুনিক বৃহদাকার ইস্পাত-কারখানায় লৌহ আকরিক সরবরাহ করা হয়। ইহা ছাড়া লক্ষ লক্ষ টন লৌহ আকরিক ভিটোরিয়া বন্দর দিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়। **চিলির** লা সেরেনার নিকটে তিনটি বৃহৎ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহভাণ্ডার (Deposits) রহিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে দুইটি ভাণ্ডার হইতে বৎসরে গড়ে ১০ হইতে ২৫ লক্ষ টন লৌহ আকরিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্প্যারোস্ পয়েন্টে অবস্থিত ইস্পাত-কারখানায় রপ্তানি করা হয়। তৃতীয় ভাণ্ডার হইতে লৌহ আকরিক মধ্য চিলির হুয়াচিপাটোয় (Huachipato) অবস্থিত আধুনিক বৃহৎ ইস্পাত-কারখানায় সরবরাহ করা হয়।

অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণাংশে আয়রণ নব ও আয়রণ মনার্কে লৌহআকরিক উত্তোলিত হয়। নিউ সাউথ ওয়েল্স হইতেও সামান্য পরিমাণ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়।

আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য (Trade)—লৌহ আকরিক-উৎপাদনকারী অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশগুলিতে লৌহের চাহিদা অল্প থাকায় এই সকল দেশ লৌহ আকরিক রপ্তানি করিয়া থাকে এবং আমদানি করে শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলি। ভেনেজুয়েলা, চিলি, ব্রেজিল, পেরু, কানাডা, সুইডেন, স্পেন, লুক্সেমবার্গ, মরক্কো, আলজেরিয়া, টিউনিসিয়া, সিয়েরা লিওন, লাইবেরিয়া, ভারত, ফিলিপাইন, মালয় ও কোরিয়া প্রচুর পরিমাণে লৌহ আকরিক রপ্তানি করিয়া থাকে। আমদানিকারক দেশের মধ্যে বৃটেন, জাপান, জার্মানী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লৌহ-সঙ্কর ধাতুসমূহ
(Ferro-alloy metals)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যে লৌহ ও ইস্পাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে লৌহ ও ইস্পাতের এই গুরুত্ব অন্য কতকগুলি ধাতু ব্যতীত কখনই সম্ভব হইত না। লৌহ ও ইস্পাতের সহিত এই সকল ধাতু মিশাইয়া বিভিন্ন গুণের ইস্পাত তৈয়ারী করা হয় এবং এই সকল ইস্পাতের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ কার্যে প্রয়োজনীয় অসংখ্য সামগ্রী উৎপাদন করা হয়।

ম্যাঙ্গানিজ-ইস্পাতে শতকরা ১২ হইতে ১৪ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ থাকে। এই পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ মিশ্রণের ফলে ইস্পাত অত্যন্ত কঠিন এবং ঘর্ষণজনিত ক্ষয়রোধ করিতে সক্ষম হয়। যে সকল ক্ষেত্রে আঘাত ও ঘর্ষণ বেশী সেখানে ম্যাঙ্গানিজ-ইস্পাত ব্যবহার করা হয়। রেলগাড়ী ও মোটর-গাড়ীর অংশবিশেষ ইহার দ্বারা প্রস্তুত হয়। যে নিকেল-ইস্পাতে নিকেলের অংশ শতকরা ২ হইতে

৪ ভাগ থাকে, তাহার প্রসারণ-ক্ষমতা খুব বেশী এবং ইহা ঘর্ষণজনিত ক্ষয়-রোধ করিতে সক্ষম। নিকেল-ইস্পাতে মরিচা ধরে না। যে নিকেল-ইস্পাতে নিকেলের অংশ শতকরা ৩৬ ভাগ তাহা উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংকুচিত বা প্রসারিত হয় না। নিকেল-ইস্পাতে নিকেলের পরিমাণ শতকরা ৭৮ ভাগ হইলে তাহার চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হইবার ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী হয়। ইহা সামুদ্রিক কেব্‌ল্‌ তৈয়ারীর জন্য ব্যবহৃত হয়। ক্রোমিয়াম মিশাইলে ইস্পাত খুব শক্ত হয়। যে ক্রোমিয়াম-ইস্পাতে শতকরা ১ ভাগ ক্রোমিয়াম থাকে তাহা হাতুড়ি, ফাইল, কর্তন-যন্ত্র প্রভৃতি নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইস্পাতে শতকরা ১২ হইতে ১৮ ভাগ ক্রোমিয়াম থাকিলে তাহার উত্তাপ সহ্য করিবার বা ক্ষয়রোধ করিবার ক্ষমতা খুব বেশী হয়। বাসনপত্র, ছুরি-কাঁচি, বিয়ারিং প্রভৃতি নির্মাণে ইহা ব্যবহৃত হয়। ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী প্রভৃতি ক্রোমিয়াম-ইস্পাতে নির্মিত। অনেকসময় ইস্পাতের সহিত একের অধিক ধাতু মিশাইয়া বিভিন্ন প্রকার সঙ্কর-ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। নিকেল-ক্রোমিয়াম-ইস্পাত ব্যাপকভাবে মোটর-গাড়ী শিল্প, দুগ্ধশিল্প, ধৌতাগারের যন্ত্রপাতি, কৌটা ভর্তি করিবার যন্ত্রপতি, বিমানপোত, স্টীম টার্বাইন প্রভৃতিতে ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের ইস্পাত জল, বাষ্প, আর্দ্র বায়ু ও অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসিলেও ক্ষয় হয় না। ভ্যানাডিয়াম-ইস্পাত দৃঢ় ও নমনীয় হয়। ভ্যানা-ডিয়াম-ক্রোমিয়াম-ইস্পাত রেলের ইঞ্জিনের অংশবিশেষ, মোটর-গাড়ী, ভারী যন্ত্রপাতি ও কামান-বন্দুক নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। টাংস্টেন-ক্রোমিয়াম-ভ্যানাডিয়াম-ইস্পাত প্রচণ্ড উত্তাপেও শক্ত থাকে। ইহা দ্রুতগতি ইস্পাত হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অবশ্য একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সঙ্কর-ইস্পাত বিভিন্ন কার্যে গুরুত্বপূর্ণ হইলেও, সাধারণ ইস্পাত সঙ্কর-ইস্পাত অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্কর-ইস্পাত উৎপাদনের জন্য যে সকল ধাতু ব্যবহৃত হয় নিম্নে সেগুলি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল :

ম্যাঙ্গানিজ (Manganese)—সাধারণ ও উচ্চশ্রেণীর ইস্পাত-উৎপাদনে ম্যাঙ্গানিজ অবশ্য প্রয়োজনীয়। পৃথিবীর মোট ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগই ইস্পাতশিল্পে ব্যবহৃত হইলেও অন্যান্য কার্যে বিশেষ করিয়া বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে, এনামেল-প্রস্তুতে, বৈদ্যুতিক ও কাচশিল্পে ম্যাঙ্গানিজ ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানে রাশিয়া, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রেজিল ও ঘানা এই পাঁচটি দেশ হইতে গড়ে পৃথিবীর শতকরা ৭৫ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদিত হয়। এই দেশগুলিতে প্রভূত পরিমাণে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ম্যাঙ্গানিজ সঞ্চিত রহিয়াছে। **রাশিয়া** সর্বপ্রধান ম্যাঙ্গানিজ-উৎপাদনকারী দেশ। জর্জিয়ায় ককেশাস্ পর্বতের দক্ষিণে ২৬০ বর্গ-কিলোমিটারেরও অধিক অঞ্চল জুড়িয়া ম্যাঙ্গানিজ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া ইউক্রেনে ক্রিভয় রগের লৌহখনির নিকটে নিকোপোলে ২২০ বর্গ-কিলোমিটারব্যাপী অঞ্চলে ম্যাঙ্গানিজ সঞ্চিত রহিয়াছে। **ভারত** দ্বিতীয় বৃহৎ ম্যাঙ্গানিজ-উৎপাদনকারী দেশ। ভারতের মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্র ও রাজস্থানে ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদিত হয়। **ব্রেজিলে** প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ সঞ্চিত রহিয়াছে (১ কোটি মেট্রিক টনের উপর)। মিনাস্ গেরায়েস্স্থ (Minas Geraes) রাজ্যের আউরো প্রেটো (Ouro Preto) প্রধান উৎপাদনকেন্দ্র। পশ্চিম দিকে ম্যাটো গ্রোসো (Mato Grosso) রাজ্যেও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ম্যাঙ্গানিজের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। **দক্ষিণ আফ্রিকায়** কিম্বার্লির উত্তর-পশ্চিমে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। ব্রেজিল, ঘানা বর্তমানে ম্যাঙ্গানিজ-উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। উল্লিখিত প্রধান পাঁচটি দেশ ব্যতীত কঙ্গো, মরক্কো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়।

পৃথিবীর ম্যাঙ্গানিজ আকরিক-উৎপাদন—৫১ লক্ষ মেঃ টন

রাশিয়া	২৫ লক্ষ মেঃ টন	দক্ষিণ আফ্রিকা	৩'৬০ লক্ষ মেঃ টন
ভারত	৫'১৬ "	ঘানা	২'৫৭ "
ব্রেজিল	৪'২১ "		

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, জার্মানী, জাপান, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ইস্পাত-উৎপাদনকারী দেশসমূহ, ভারত, ঘানা, দক্ষিণ আফ্রিকা, মরক্কো, মিশর, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশ হইতে ম্যাঙ্গানিজ আমদানি করে।

ক্রোমিয়াম (Chromium)—বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রোমাইট আকরিক হইতে ক্রোমিয়াম উৎপাদন করা সম্ভব হইলেও বাণিজ্যিক গুরুত্বের দিক দিয়া একমাত্র ফেরাস ক্রোমাইট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্রোমিয়াম উজ্জ্বল ও কঠিন। কাঠিন্যের দিক দিয়া ইহার স্থান হীরকের পরেই। ইস্পাতশিল্প

ছাড়া ইহা বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে ও প্রচণ্ড উত্তাপ-সৃষ্টিকারী চুল্লীতে ব্যবহার করা হয়।

পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ ক্রোমাইট তুরস্ক, দক্ষিণ রোডেশিয়া, রাশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে পাওয়া যায়। রাশিয়ার ইউরাল পর্বতের মধ্য অঞ্চলে এবং ইহার কিছুটা উত্তর-পশ্চিমে সারানভ্ অঞ্চলে প্রভূত পরিমাণে ক্রোমাইট সঞ্চিত রহিয়াছে। উল্লিখিত চারিটি দেশ ব্যতীত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কিউবা, পারস্য, যুগোশ্লাভিয়া, ভারত, নিউ ক্যালিডোনিয়া (প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত একটি দ্বীপ) প্রভৃতি দেশেও ক্রোমাইট উৎপাদিত হয়। রাশিয়া ব্যতীত অন্যান্য ইস্পাত-উৎপাদনকারা দেশসমূহ প্রয়োজনীয় ক্রোমিয়ামের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল।

নিকেল (Nickel)—নিকেল ইস্পাতের সহিত মিশাইয়া মরিচাবিহীন ও অন্যান্য গুণের সঙ্কর-ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। তাম্র, অ্যালুমিনিয়াম ও অন্যান্য ধাতুর সহিত নিকেল মিশাইয়া বিভিন্ন সঙ্কর-ধাতু উৎপাদন করা হয়। ইহা ছাড়া ইলেকট্রোপ্লেটিং-এর জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। জেট ইঞ্জিন-নির্মাণে নিকেলের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। নিকেলের সামরিক গুরুত্ব অসাধারণ।

গড়ে পৃথিবীর শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী নিকেল **কানাডা** ও রাশিয়ায় উৎপাদিত হয়। কানাডাই সর্বপ্রধান নিকেল-উৎপাদনকারী দেশ। কানাডার অণ্টারিও প্রদেশের স্যাডবেরি জেলায় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ নিকেলের ভাণ্ডার রহিয়াছে। **রাশিয়ার** পেটসামো (পূর্বে ফিন্‌ল্যাণ্ডের অন্তর্গত ছিল), কোলা উপদ্বীপ ও ইউরাল পর্বতে নিকেল পাওয়া যায়। এই দুইটি দেশ ছাড়া নিউ ক্যালিডোনিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে ও কিউবায় সামান্য পরিমাণে নিকেল পাওয়া যায়। পৃথিবীতে প্রধান প্রধান নিকেল-আমদানিকারক দেশ হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, বৃটেন প্রভৃতি। ইহা সর্বাধিক পরিমাণে রপ্তানি হয় কানাডা ও নিউ ক্যালিডোনিয়া হইতে।

মলিব্‌ডেনাম (Molybdenum)—পৃথিবীর শতকরা ৭০ ভাগ মলিবৃডেনাম ইস্পাতশিল্পে ২০ ভাগ ঢালাই-লৌহে (Cast iron) ব্যবহৃত হয়। মলিবৃডেনাম-ইস্পাত প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করিতে সক্ষম। ইহার যথেষ্ট সামরিক গুরুত্ব রহিয়াছে। সামরিক অস্ত্রাদি, ট্যাঙ্ক, জেট ইঞ্জিন, গ্যাস টার্বাইন প্রভৃতি নির্মাণে মলিবৃডেনাম-ইস্পাত ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া

মলিব্‌ডেনাম বিভিন্নরূপে ইলেক্‌ট্রনিক শিল্পে, রং ও মৃৎশিল্পে ব্যবহার করা হয়।

পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী মলিব্‌ডেনাম একমাত্র **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে** উৎপাদিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো, উটা, আরিজোনা, নেভাডা, নিউ মেক্সিকো এবং ক্যালিফোর্ণিয়া এই ছয়টি রাজ্যে মলিব্‌ডেনাম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কলোরাডো প্রধান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত চিলি, যুগোশ্লাভিয়া, কানাডা, নরওয়ে ও জাপানে সামান্য পরিমাণ মলিব্‌ডেনাম পাওয়া যায়।

টাংস্টেন (Tungsten)—টাংস্টেন প্রধানতঃ উল্‌ফ্রাম (Wolfram) এবং শীলাইট (Scheelite) হইতে নিষ্কাশন করা হয়। টাংস্টেন-ইস্পাত বিশেষ করিয়া ধাতু-কর্তন যন্ত্র-নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া টাংস্টেন বৈদ্যুতিক বাতির সূক্ষ্ম তার (Filament)-নির্মাণে ও মৃৎশিল্পে এবং অন্যান্য কার্যে ব্যবহৃত হয়।

চীন পৃথিবীর সর্বপ্রধান আকরিক টাংস্টেন-উৎপাদনকারী দেশ। তাহার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া। এই দেশগুলি ছাড়া বলিভিয়া, পর্তুগাল, কোরিয়া, কঙ্গো ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে আকরিক টাংস্টেন উৎপাদিত হয়।

ভ্যানাডিয়াম (Vanadium)—ভ্যানাডিয়াম প্রধানতঃ ইস্পাতশিল্পে ব্যবহৃত হয়। ইহা ইস্পাতের বিজাতীয় পদার্থ দূরীকরণে ব্যবহৃত হয় এবং ইস্পাতের সহিত মিশাইয়া সঙ্কর-ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। ভ্যানাডিয়াম-ইস্পাত দ্রুতগতি-ইস্পাত (High speed steel) হিসাবে আদৃত হয়। সামরিক ব্যবস্থায় ইহার গুরুত্ব রহিয়াছে। ভ্যানাডিয়াম তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের সহিত মিশাইয়া সঙ্কর-তাম্র ও সঙ্কর-অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত করা হয়। ইহা ছাড়া রাসায়নিক শিল্পে ও অন্যান্য কার্যে ভ্যানাডিয়াম ব্যবহৃত হয়।

সর্বপ্রধান ভ্যানাডিয়াম-উৎপাদক দেশ **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র**। ১৯৫৯ সালে পৃথিবীর মোট ভ্যানাডিয়াম উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪,৯০০ মেট্রিক টন। উহার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ ছিল ৩,৩৭৪ মেঃ টন। ইহা ছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, পেরু ও উত্তর রোডেশিয়ায় ভ্যানাডিয়াম পাওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা, বৃটেন, স্পেন, জার্মানী, রাশিয়া,

এবং ভারতে সামান্য পরিমাণ ভ্যানাডিয়াম রহিয়াছে। আকরিক ভ্যানাডিয়াম হইতে ধাতব ভ্যানাডিয়াম নিষ্কাশন অত্যন্ত কঠিন। ফলে ইহার মূল্য অধিক। তৎসত্ত্বেও ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া ইদানীং ইহার চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে।

লৌহেতর ধাতুসমূহ (Non-ferrous Metals)

লৌহেতর ধাতুসমূহের মধ্যে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ হইল তাম্র, অ্যালুমিনিয়াম, সীসা, রাং, অভ্র ও দস্তা। নিম্নে ইহাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও বণ্টন সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইল।

তাম্র (Copper)

বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে তাম্রই মানুষ সর্বপ্রথম ব্যবহার করিতে শিখে। প্রাচীনকালে কোথাও কোথাও তাম্র বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যাইত। তাম্র ঘাতসহ ও নমনীয় বলিয়া ইহাকে ইচ্ছামতো যে-কোন আকারে পরিবর্তিত করা যাইতে পারে। এই কারণে সাত আট হাজার বৎসর পূর্বে নব্য প্রস্তরযুগের মানুষ যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র ও অলঙ্কারাদি নির্মাণের জন্য কাষ্ঠ, হাড় ও পাথর ত্যাগ করিয়া তাম্র ব্যবহার করিতে শুরু করে এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে মানবসভ্যতায় নূতন যুগের সূচনা হয় যাহা সাধারণভাবে **তাম্রযুগ** নামে পরিচিত।

শিল্পগত গুরুত্ব (Industrial importance)—আধুনিক যুগে তাম্রের একাধিপত্য না থাকিলেও বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে গুরুত্বের দিক দিয়া লৌহের পরেই তাম্রের স্থান। তাম্র ঘাতসহ ও নমনীয় একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহা টানিয়া সূক্ষ্ম সূতায় পরিণত করা যায়। ইহা সহজে ক্ষয় হয় না এবং ইহাতে মরিচাও ধরে না। ইহাকে সহজে অন্য অনেক ধাতুর সহিত মিশাইয়া সঙ্কর-ধাতু প্রস্তুত করা যায়। যেমন তাম্রের সহিত রাং মিশাইয়া ব্রোঞ্জ এবং দস্তা মিশাইয়া পিতল প্রস্তুত করা হয়। তাম্র, দস্তা ও রাং নির্দিষ্টমাত্রায় একত্রে মিশাইয়া কাঁসা প্রস্তুত করা হয়। তাম্রের সহিত নিকেল মিশাইয়া মনেল মেটাল, রাং ও অ্যান্টিমনি মিশাইয়া ব্যাবিট মেটাল (Babbit metal) এবং অ্যালুমিনিয়াম মিশাইয়া ডুরালুমিন (Duralumin) প্রস্তুত করা হয়। সোনার সহিত তাম্রের খাদ মিশাইয়া গিনি সোনা তৈয়ারি করা হয়। কিন্তু বর্তমান কালে তাম্রের সর্বাধিক ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার বিদ্যুৎশিল্পে।

কারণ রৌপ্য ব্যতীত তাম্রই সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্যুৎ-পরিবাহী। প্রকৃতপক্ষে তাম্রের বর্তমান চাহিদা বিদ্যুৎ-আবিষ্কারের ফল। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে সমগ্র পৃথিবীতে যেখানে মাত্র ৫২,০০০ টন তাম্র উৎপাদিত হইয়াছিল ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ১১ লক্ষ টন এবং ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে ৩৬ লক্ষ ৭০ হাজার টন। বিদ্যুৎ-উৎপাদন, পরিবহণ ও ব্যবহারে পৃথিবীর মোট তাম্র উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ ব্যবহার করা হয়। বিদ্যুৎশিল্প ছাড়া মোটর-গাড়ী, জাহাজ ও রেলের ইঞ্জিন-নির্মাণে তাম্র ব্যবহার করা হয়। একটি মাঝারি আকারের ট্যাঙ্ক নির্মাণ করিতে ½ টন এবং একটি দূরপাল্লার বোমারু বিমান-নির্মাণে অন্ততঃ ৩ টন তাম্রের প্রয়োজন হয়। ডাক্তারী ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং মুদ্রা-নির্মাণে, গুলিগোলা, শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ ও হিমায়ন যন্ত্র-নির্মাণে, গুড়, সাবান প্রভৃতি তৈয়ারি করিবার উপযোগী বড় বড় পাত্র এবং পাইপ-নির্মাণে, রং, পতঙ্গবিধ্বংসী ঔষধ প্রভৃতি উৎপাদনে তাম্র ব্যবহার করা হয়।

বর্তমানে খনি হইতে বিশুদ্ধ তাম্র অল্পই পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে **খনিজ তাম্র** অন্যান্য পদার্থের সহিত যৌগিক অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রায়ঃশই স্বর্ণ, রৌপ্য, নিকেল, রাং এবং সীসা খনিজ তাম্রের সহিত দেখিতে পাওয়া যায়। খনিজ তাম্রে গড়ে শতকরা ৩ ভাগেরও কম খাঁটি তাম্র পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে আকরিক তাম্র উত্তোলিত হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাতে বিশুদ্ধ তাম্রের পরিমাণ শতকরা ১·৫ ভাগের কম। আকরিক তাম্রে খাঁটি তাম্রের পরিমাণ এত কম থাকায় খনি অঞ্চলেই আকরিক তাম্র হইতে খাঁটি তাম্র নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিতে হয়। লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে ব্যবহৃত লৌহ আকরিকে ধাতব লৌহের পরিমাণ শতকরা ৪০, ৫০, এমনকি ৬০ ভাগ থাকে বলিয়া লৌহ আকরিক খনি অঞ্চল হইতে অনেক দূরে লইয়া গিয়া ধাতব লৌহ-নিষ্কাশন সম্ভব। কিন্তু তাম্রের ক্ষেত্রে ঐরূপ করিলে উৎপাদন-খরচ অনেক বেশী পড়িয়া যায়।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing areas)—পৃথিবীতে তাম্র-উৎপাদনে **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র** প্রথম স্থান অধিকার করে। বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের মোট উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ তাম্র আরিজোনা, উটা, নেভাডা, নিউ মেক্সিকো ও মন্টানা পশ্চিমদিকের এই পাঁচটি রাজ্য হইতে পাওয়া যায়। দেশের পশ্চিমাংশে রেলপথের বিস্তার এবং খনি হইতে আকরিক তাম্র-উৎপাদন ও

খাঁটি তাম্র-নিষ্কাশন পদ্ধতির উন্নতি ঘটায় এই রাজ্যগুলিতে তাম্র-উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। উটা রাজ্যের বিংহ্যামে, আরিজোনা রাজ্যের বিসূবী, জেরোম মরেন্‌সি, মেট্‌কাফ ও গ্লোবমিয়ামি জিলায় এবং মন্টানা রাজ্যের বুট্টীর নিকট আকরিক তাম্র উত্তোলিত হয়। উল্লিখিত পাঁচটি রাজ্য ব্যতীত মিচিগান, টেনেসি, ওয়াশিংটন ও ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যেও তাম্র পাওয়া যায়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সমস্ত তাম্র পশ্চিমদিকে সংগৃহীত হইলেও উহা ব্যবহার করা হয় প্রধানতঃ দেশের পূর্বাংশে, আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী শিল্পোন্নত অঞ্চলগুলিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবলমাত্র সর্বপ্রধান তাম্র-উৎপাদনকারী দেশ নহে, ইহা সর্বপ্রধান তাম্র-ব্যবহারকারী দেশও বটে। মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ তাম্রখনি মার্কিন মূলধনের সাহায্যে পরিচালিত হয় এবং ঐ সকল দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে তাম্র এই দেশে আমদানি করা হইয়া থাকে।

চিলি তাম্র-উৎপাদনে বর্তমানে তৃতীয়স্থান অধিকার করে। চুকিকামাটা, পোট্রেরিলোস এবং স্যান্টিয়াগোর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ব্রাডেন বা সিওয়েল —এই তিনটি প্রধান আকরিক তাম্র-উৎপাদন-কেন্দ্র। এই কেন্দ্রগুলির সহিত সমুদ্রোপকূলের উত্তম যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকায় তাম্রখনি গড়িয়া উঠিবার সুবিধা হইয়াছে। তাম্র-রপ্তানিতে চিলি প্রথম স্থান অধিকার করে।

আফ্রিকা মহাদেশের **জাম্বিয়া** রাজ্যে প্রচুর তাম্র পাওয়া যায়। এই দেশ বর্তমানে খনিজ তাম্র-উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ইহা ছাড়া এই মহাদেশের **কঙ্গোর** কাটাঙ্গা প্রদেশে ইদানীং তাম্র-উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। চিলির তাম্র-খনিগুলি সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত; কিন্তু আফ্রিকার তাম্রখনিগুলি সমুদ্রতীর হইতে বহুদূরে অবস্থিত; সেইজন্য ১৯৩১ সালে পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত বেঙ্গুয়েলার সহিত রেলপথে সংযোগসাধনের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আফ্রিকা তাম্র-উৎপাদনে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। চিলি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাংশের তাম্রখনিগুলি মরুভূমি বা মরুপ্রায় অঞ্চলে অবস্থিত। ফলে জল ও খাদ্য সরবরাহ ঐ সকল অঞ্চলে একটি সমস্যা। কিন্তু জাম্বিয়া, কাটাঙ্গা ও উত্তর রোডেশিয়ায় যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হওয়ায়, খাদ্য ও জলের কোন অভাব নাই। উপরন্তু এই দেশগুলির আকরিক তাম্রে ধাতব তাম্রের পরিমাণ গড়ে শতকরা প্রায় ৬ ভাগ অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

উৎপাদিত আকরিক তাম্রের তুলনায় ৫ গুণেরও বেশী। আফ্রিকার তাম্র-খনিগুলি বৃটিশ, মার্কিন ও বেলজিয়ান মূলধনে পরিচালিত হয়। উৎপাদিত তাম্র প্রায় সমস্তই বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

কানাডা অন্যতম প্রধান তাম্র-উৎপাদনকারী দেশ। এখানে উৎপাদিত তাম্রের একটি বড় অংশ অপেক্ষাকৃত মূল্যবান্ ধাতুর উপজাত-দ্রব্য হিসাবে পাওয়া যায়। কানাডার অন্টারিও প্রদেশের স্যাডবেরি অঞ্চলে অধিকাংশ তাম্র পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া কুইবেক, ম্যানিটোবা, বৃটিশ কলম্বিয়া ও ভ্যাঙ্কুভারেও তাম্র পাওয়া যায়। আভ্যন্তরীণ চাহিদা কম বলিয়া অধিকাংশ তাম্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়। **জাপানে** হনসু দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে এবং শিকোকু ও হোক্কাইডো দ্বীপে তাম্র উৎপাদিত হয়। রাশিয়ার ইউরাল পর্বত, ককেশাস্ পর্বত এবং মধ্য এশিয়া অঞ্চলে তাম্রখনি রহিয়াছে। উপরোক্ত দেশগুলি ব্যতীত অস্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো, পেরু, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও সাইপ্রাস্ তাম্র-উত্তোলনে গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে। **ভারতের** তাম্র-উৎপাদন অতি সামান্য।

পৃথিবীর খনিজ তাম্র-উৎপাদন—৪০'৫ লক্ষ মেঃ টন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১১ লক্ষ ৩৫ হাঃ মেঃটন	কানাডা	৪ লক্ষ ৪৯ হাঃ মেঃটন
জাম্বিয়া	৬ ,, ৩৫ ,,	কঙ্গো	২ ,, ৯৫ ,,
চিলি	৬ ,, ২২ ,,	পেরু	১ ,, ১৮ ,,

Source—U.N.O. Monthly Bulletin of Statistics, April, 1965

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য (Trade)—পৃথিবীর অধিকাংশ তাম্র-খনিতে মার্কিন পুঁজি নিয়োজিত থাকায় রপ্তানি-বাণিজ্যে এই দেশ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। চিলি, কানাডা, রোডেশিয়া, কঙ্গো ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ তাম্র রপ্তানি করে। বৃটেন, জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইটালি, ভারত ও জাপান অধিকাংশ তাম্র আমদানি করে।

অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium)

তাম্র আবিষ্কার করিয়াছিল প্রাগৈতিহাসিক মানুষ এবং তাম্রের ব্যবহার শুরু হইয়াছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগে। কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের আবিষ্কার ও

ব্যবহার আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে প্রথম আকরিক অ্যালুমিনিয়াম হইতে ধাতব অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়। তাহার পর হইতে নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে একদিকে যেমন অ্যালুমিনিয়াম-নিষ্কাশন অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে ও অ্যালুমিনিয়ামের দাম হ্রাস পাইয়াছে অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন কার্যে অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে যেখানে ১ কিলোগ্রাম অ্যালুমিনিয়ামের দাম ছিল ২৪৮ ডলার, বর্তমানে সেখানে ইহা গড়ে মাত্র ৯ সেণ্টে পাওয়া যায়।

শিল্পগত গুরুত্ব (Industrial importance)—অ্যালুমিনিয়ামের সর্বপ্রধান গুণ হইল ইহা ওজনে হালকা। এক কিউবিক ফুট অ্যালুমিনিয়ামের ওজন মাত্র ৭৫ কিলোগ্রাম; অথচ সম-পরিমাণ তাম্রের ওজন ২৫২ কিলোগ্রাম এবং সাধারণ ইস্পাতের ওজন ২২১ কিলোগ্রাম। অ্যালুমিনিয়াম নমনীয় বলিয়া ইহাকে ইচ্ছামতো যে-কোন আকৃতি দেওয়া চলে এবং ইহা স্বচ্ছন্দে ঢালাই ও ঝালাই করা যায়। ইহা উত্তম তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী এবং সহজে তাম্র, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা ও লোহার সহিত মিশাইয়া বিভিন্ন প্রকারের সঙ্কর-অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত করা যায়। অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষয়রোধ করিবার ক্ষমতা বেশী এবং ইহা দেখিতেও সুন্দর। অ্যালুমিনিয়াম হালকা বলিয়া বিমানপোত-নির্মাণে ইহা অবশ্য প্রয়োজনীয়। আজকাল মোটর-গাড়ী, মোটর-বাস্, মোটর-ট্রাক, রেলের কামরা এবং জাহাজ-নির্মাণেও ক্রমেই অধিক পরিমাণে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হইতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে গৃহাদি-নির্মাণেও অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে। গৃহের ছাদ, জানালা, দরজা, পর্দা, স্কাইলাইট প্রভৃতি নির্মাণে ইহা ব্যবহার করা হইতেছে। এমনকি আকাশচুম্বী অট্টালিকা নির্মাণের জন্য ইস্পাতের কাঠামো ব্যবহার না করিয়া তৎপরিবর্তে অন্য ধাতু-মিশানো সঙ্কর-অ্যালুমিনিয়ামের হালকা অথচ শক্ত কাঠামো ব্যবহার করা হইতেছে। সেতু-নির্মাণেও ইহার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। বৈদ্যুতিক তার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি-নির্মাণে অ্যালুমিনিয়াম তাম্রের ঘনিষ্ঠ প্রতিযোগী। ইহা ছাড়া গৃহস্থালির বাসনপত্র, আসবাবপত্র, রং, বাষ্পায় কোদাল (Steam shovel), মদের পিপা (Beer barrel) প্রভৃতি নির্মাণে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন যুদ্ধসামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য অ্যালুমিনিয়াম প্রয়োজন হয় বলিয়া ইহার সামরিক গুরুত্ব খুব বেশী।

আকরিক অ্যালুমিনিয়াম (বক্সাইট)—পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র মৃত্তিকায় অ্যালুমিনিয়াম থাকিলেও এখন পর্যন্ত একমাত্র বক্সাইট হইতে বাণিজ্যিক হারে, সঙ্গতমূল্যে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করা সম্ভব। খনি হইতে যে বক্সাইট উত্তোলন করা হয় তাহার শতকরা ১৫ ভাগ রাসায়নিক ও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহার করা হয়। অবশিষ্ট ৮৫ ভাগ অ্যালুমিনিয়াম-উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। বিশুদ্ধ বক্সাইটে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়। খনি হইতে বক্সাইট উত্তোলন করিয়া প্রথমে তাহা ভাঙ্গিয়া ধুইয়া শুকানো হয়। তারপর উহা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড বা অ্যালুমিনা নিষ্কাশন করা হয়। ইহার জন্য খুব বেশী শক্তির প্রয়োজন হয় না। সেইজন্য বক্সাইট হইতে অ্যালুমিনা নিষ্কাশনের কারখানা সাধারণতঃ বক্সাইট খনির নিকটেই স্থাপন করা হয়; অবশ্য যেখানে যাতায়াত-ব্যবস্থা সুন্দর, সহজ ও সুলভে বক্সাইট-পরিবহণের সুবিধা আছে, সেখানে খনি হইতে দূরে নিষ্কাশন যন্ত্র স্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু অ্যালুমিনা হইতে ধাতব অ্যালুমিনিয়াম-উৎপাদন অত্যন্ত ব্যয়বহুল পদ্ধতি এবং ইহার জন্য অত্যধিক পরিমাণে শক্তির প্রয়োজন। সাধারণতঃ অ্যালুমিনা হইতে ধাতব অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের জন্য সুলভ জলবিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহার করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, নরওয়ে, ইটালি, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি যে সকল দেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুব্যবস্থা হইয়াছে, সেখানেই কেবল অ্যালুমিনিয়াম-শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে

বক্সাইট-উৎপাদক অঞ্চল (Bauxite-producing areas)—পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ২৩% বক্সাইট **সুরিনামে** (ডাচ গায়না), ২১% **জ্যামাইকায়**, ১৫% **বৃটিশ গায়নায়**, ১০% মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ৯% ফ্রান্সে, ৫% হাঙ্গেরীতে ও ৫% যুগোশ্লোভিয়ায় পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া গ্রীস, পশ্চিম আফ্রিকা, রাশিয়া এবং ভারতেও বক্সাইট পাওয়া যায়। এই সকল দেশের মধ্যে যেখানে জলবিদ্যুতের অভাব আছে, সেখানকার অধিকাংশ বক্সাইট বিদেশে রপ্তানি হয়। অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের জন্য কিছু পরিমাণ ক্র্যায়োলাইটের প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ ক্র্যায়োলাইট একমাত্র গ্রীনল্যাণ্ডে পাওয়া যায়। এখান হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্র্যায়োলাইট রপ্তানি করা হয়।

আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য (Trade)—বক্সাইট-রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে জ্যামাইকা, সুরিনাম, বৃটিশ গায়না ও ফ্রান্স উল্লেখযোগ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, কানাডা, নরওয়ে, পশ্চিম জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশ বক্সাইট আমদানি করে।

অ্যালুমিনিয়াম-উৎপাদক অঞ্চল (Aluminium-producing areas)—পূর্বেই বলা হইয়াছে অ্যালুমিনিয়াম-উৎপাদন সুলভ জলবিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল বলিয়া জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনকারী দেশগুলিতে অ্যালুমিনিয়াম-শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। আজকাল অবশ্য কোথাও কোথাও প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া অ্যালুমিনিয়াম-শিল্পে ব্যবহার করা হইতেছে।

পৃথিবীর মোট অ্যালুমিনিয়াম-উৎপাদন—৪৮ লক্ষ মেঃ টন

মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	২৮ লক্ষ	২ হাজার	মেঃ টন		জাপান	৩ লক্ষ	৬৯ হাজার	মেঃ টন
কানাডা	৫ "	৫০ "	"		নরওয়ে	২ "	৪৮ "	"
ফ্রান্স	৩ "	৬৬ "	"		বৃটেন	২ "	৪ "	"
পঃ জার্মানী	৪ "	৩২ "	"		ইটালি		৯১ "	"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে সর্বপ্রধান অ্যালুমিনিয়াম-উৎপাদনকারী দেশ। এখানে পৃথিবীর শতকরা মাত্র ১০ ভাগ বক্সাইট উত্তোলিত হইলেও বিদেশ হইতে বক্সাইট আমদানি করিয়া অ্যালুমিনিয়াম-শিল্পের উন্নতি করা হইয়াছে। সুরিনাম, বৃটিশ গায়না ও জ্যামাইকা হইতে এখানে বক্সাইট আমদানি করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন, অরিগান, টেক্সাস্, লুইসিয়ানা, আরকানসাস্, টেনেসি, আলাবামা ও নিউ ইয়র্ক রাজ্যে অ্যালুমিনিয়াম-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। টেক্সাস্, লুইসিয়ানা ও আরাকানসাস্ রাজ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস ও লিগনাইটের সাহায্যে অ্যালুমিনিয়াম-উৎপাদন করা হয়। **কানাডার** কুইবেক প্রদেশের সেগুয়েনে এবং সেণ্ট মরিস্ নদীদ্বয়ের তীরবর্তী অঞ্চল অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। পশ্চিমদিকে বৃটিশ কলম্বিয়া প্রদেশেও অ্যালুমিনিয়াম-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

রাশিয়া পৃথিবীর অন্যতম প্রধান অ্যালুমিনিয়াম-উৎপাদনকারী দেশ।

রাশিয়ায় ইউরাল পার্বত্য অঞ্চলে, লেনিনগ্রাডের পূর্বে অবস্থিত ভলখোভে, নীপার নদীর তীরে অবস্থিত জাপোরোঝে, শ্বেতসাগরের তীরে অবস্থিত কাণ্ডালাকৃশায় এবং আর্মেনিয়া রাজ্যের যেরেভানে অ্যালুমিনিয়াম-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম ইউরোপে **ফ্রান্স** অ্যালুমিনিয়াম-উৎপাদনে প্রধান স্থান অধিকার করে। আল্পস্ ও পীরেনীজ পর্বতের সানুদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রগুলির নিকটে অ্যালুমিনিয়াম-শিল্প স্থাপিত হইয়াছে।

উল্লিখিত দেশগুলি ব্যতীত পশ্চিম জার্মানী, নরওয়ে, ইটালি, বৃটেন, জাপান, ভারত, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদিত হয়।

দস্তা (Zinc)

বিভিন্ন লৌহেতর ধাতুর মধ্যে দস্তা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। লৌহ ও অন্যান্য ধাতুর উপর অক্সিজেনের ক্রিয়াজনিত ক্ষয়রোধ করিতে পারে বলিয়া দস্তার সমাদর এত অধিক। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দস্তা আকরিক হইল স্ফ্যালেরাইট্ (Sphalerite)। খনি হইতে যে স্ফ্যালেরাইট্ উত্তোলন করা হয় তাহাতে খাঁটি দস্তার পরিমাণ সাধারণতঃ শতকরা ২ হইতে ১২ ভাগ। প্রায়শঃই দস্তা আকরিক সাসা ও রৌপ্য আকরিকের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। সেইজন্য অনেক দেশে একই সঙ্গে দস্তা ও সীসা উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic importance)—মরিচা-ধরা বন্ধ করার জন্য লৌহ ও ইস্পাতের উপর দস্তার পাতলা প্রলেপ লাগানো হয়। এই প্রক্রিয়া গ্যাল্ভানাইজিং (Galvanizing) নামে পরিচিত। দস্তা নমনীয় ও ঘাতসহ। ইহা সহজে অন্য ধাতুর সহিত মিশাইয়া সঙ্কর-ধাতু প্রস্তুত করা যায়। এইভাবে পিতল, কাঁসা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া নকল সোনা, জার্মান সিল্ভার, শুষ্ক তড়িৎকোষ (Dry electric battery), রং, ঔষধ ও রবারের টায়ার নির্মাণেও দস্তা ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing areas)—পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে দস্তা উত্তোলিত হইলেও মোট উৎপাদনের শতকরা ৭৫ ভাগ দস্তা আকরিক উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে পাওয়া যায়। **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র** পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ দস্তা-উৎপাদনকারী দেশ; অবশ্য খনিজ দস্তা-উৎপাদনে এই দেশ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই দেশের ওক্লাহামা, কানসাস্, মিসৌরী, নিউ

জার্সি, ইডাহো, উটা, মনটানা ও আরিজোনা রাজ্যে দস্তা আকরিক উৎপাদিত হয়। **কানাডা** দস্তা আকরিক-উৎপাদনে বর্তমানে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে; বৃটিশ কলম্বিয়া এবং উইনিপেগ হ্রদের উত্তরে অবস্থিত ফ্লিন্ ফ্লন্ প্রধান উৎপাদনকারী অঞ্চল। **মেক্সিকোয়** প্রধানতঃ সীসা ও রৌপ্য আকরিকের উপজাত-দ্রব্য হিসাবে দস্তা উৎপাদিত হয়।

ইউরোপে জার্মানী, পোল্যাণ্ড, ইটালি ও যুগোশ্লাভিয়ায় প্রচুর পরিমাণে দস্তা আকরিক উত্তোলিত হয়। জার্মানীর হার্জ পর্বত (Harz mountain) ও পোল্যাণ্ডের সাইলেশিয়া অঞ্চলে দস্তা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া রাশিয়া, স্পেন ও সুইডেনেও দস্তা পাওয়া যায়। **অস্ট্রেলিয়ার** নিউ সাউথ ওয়েল্‌সে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান সীসা ও দস্তা আকরিকের ভাণ্ডার রহিয়াছে। জাপান এবং পেরুও দস্তা উৎপাদন করিয়া থাকে। **ভারতে** রাজস্থান ও কাশ্মীরে সামান্য পরিমাণ দস্তা আকরিক পাওয়া যায়।

পৃথিবীর মোট খনিজ দস্তা-উৎপাদন—৩০ লক্ষ মেঃ টন (১৯৬৪)

দেশ	উৎপাদন	দেশ	উৎপাদন
কানাডা	৬ লক্ষ ৭৬ হাঃ মেঃটন	জাপান	২ লক্ষ ১৬ হাঃ মেঃটন
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র	৫ ,, ১৯ ,,	পঃ জার্মানী	২ ,, ৩ ,,
অস্ট্রেলিয়া	৩ ,, ৬৪ ,,	ফ্রান্স	১ ,, ৯৪ ,,
মেক্সিকো	২ ,, ৪৩ ,,	পোল্যাণ্ড	১ ,, ৫১ ,,

Source—U. N. O.-Monthly Bulletin of Statistics, April, 1965.

দস্তা আকরিক হইতে খাঁটি দস্তা নিষ্কাশনের জন্য প্রচুর শক্তি ও উচ্চ শ্রেণীর কারিগরী দক্ষতার প্রয়োজন হয়। সেইজন্য অনেক ক্ষেত্রে দস্তাখনির নিকট নিষ্কাশন-যন্ত্র স্থাপন না করিয়া ভোগকেন্দ্রের নিকট করা হইয়াছে। বৃটেনে দস্তাখনি নাই। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর কারিগর ও শক্তির কোন অভাব না থাকায় অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে দস্তা আকরিক **আমদানি** করিয়া এখানে খাঁটি দস্তা উৎপাদন করা হয়। বেলজিয়ামে খুব সামান্য পরিমাণে দস্তা আকরিক উৎপাদিত হয়। কিন্তু মেক্সিকো, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে দস্তা আকরিক আমদানি করিয়া এই দেশ প্রচুর ধাতব দস্তা উৎপাদন করে। অন্যান্য প্রধান ধাতব দস্তা-উৎপাদনকারী দেশ হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, পশ্চিম জার্মানী, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি।